সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যা ১৯৯২

সম্পাদক : বিনয় ঘোষ
শিল্প নির্দেশক : দেবাশিস দত্ত
প্রচার : গোপাল বসু, মানস বসু
বিজ্ঞাপন : পারমিতা সিন্‌হা
ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সেন
প্রচ্ছদ : মীরা মুখোপাধ্যায়
যোগাযোগ : টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০০৫৯
ফোন : ৫৯ ৪০৪৮
৯১/১এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

হিতেশরঞ্জন সান্যাল / ব্রিটিশপূর্ব ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থা ৯ □ পরমেশ আচার্য / সংযোজন ২৪ □ প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়া / লোককথা ৩১ □ প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য / পটুয়া এবং সময় ৩৬ □ মীরা মুখোপাধ্যায় / বাস্তারের দিনলিপি ৫১ □ বারীন সাহা / চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব ১—৬৮ □ চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব ২—৭১ □ বারীন সাহা / টুকরো কথা ৮২ □ দেবীপ্রসাদ ঘোষ / তিতাস খুঁড়ে ৯১ □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় / সম্মোহন ১০১ □ সোমেশলাল মুখোপাধ্যায় / সম্রাটের নতুন মন বনাম সম্রাটের পুরোনো মন ১৩৫

সম্পাদনার কাজটি আমাদের এখানে এখনও পর্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বীকৃতি পায়নি। লেখক-সম্পাদক সম্পর্কের মধ্যে মাধুর্যের থেকে তিক্ততাই বেশি দেখা যায়। স্বনামধন্য লেখকদের রচনাও যে কাটছাট করা যেতে পারে, বিন্যাসে বদল ঘটানো যেতে পারে একথা ক'জন লেখক মেনে নেবেন। অথচ এসব থেকে বেশি উপকৃত হবেন লেখকই।

প্রসঙ্গটির অবতারণা করা হল লেখকরা যদি অনুগ্রহ করে এদিকটা একটু ভেবে দেখেন সেই আশায়। বর্তমান সংখ্যায় প্রয়াত হিতেশরঞ্জন সান্যালের লেখাটি আমরা পেয়েছি মনস্বিতা সান্যালের সৌজন্যে। তাঁকে ধন্যবাদ। বারীন সাহা আমাদের জন্য অনেক সময় দিয়েছেন। মীরা মুখোপাধ্যায় এত দ্রুত লেখা দেবেন আমরা আশা করতেও পারিনি। প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়ার লেখাটি এল প্রায় উপহারের মতো। গুণীজনের কাছে লেখার জন্য আমরা আর্জি জানিয়ে আসছি। সকলে সমানভাবে সাড়া দিচ্ছেন না। হয়ত তাঁরা আরও কিছু সংখ্যা দেখতে চান, পত্রিকার মান হয়ত তাঁদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি এখনও। চেষ্টা ছাড়া আর কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এই সংখ্যাটি প্রকাশে প্রায় কুড়ি দিন দেরি হল। সেজন্য লেখক-পাঠক এবং বিজ্ঞাপনদাতা বন্ধুদের কাছে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

৩১ জানুয়ারি, ১৯৯২

With best compliments from :

MICROSERVICES

(A Microventure in Computer Services)

1 PARK SIDE ROAD
CALCUTTA 700 026

□

With best compliments of :

KAWALITY LEATHER GOODS CO.

1 KAMARDANGA ROAD
CALCUTTA 700 046

□

Space donated by :

RABINDRA PYNE
MRINMOY DASGUPTA

□

With best compliments from :

M/s. MUKHERJEE ENTERPRISE

14/E LOCK GATE ROAD
CALCUTTA 700 002
Phone No. 52 7260

Space donated by :

A WELL WISHER

□

SEARLE AGROCHEMICALS

WE ARE COMMITTED
WE ARE THE WINNERS

Products :

Fenval 20% EC	Fenval 0·4% DP
Trapp 50% EC	Trapp 5% GR
Patap SP	Patap GR
Warrant 1 OCG	Arrest 50 WP
Croton 36 SL	Champ 30 EC

□

With best wishes from :

M/s. New Medical (Agartala) Pvt. Ltd.

232A Santosh Avenue
Calcutta 700 075

□

With best compliments from :

PCS DATA PRODUCTS LTD.

113 Park Street
Poddar Point Block 2C
Calcutta 700 016
Phones : 29 5847 / 7328 / 7590 / 5816
Telex : 021 5476

□

হিতেশরঞ্জন সান্যাল

ব্রিটিশপূর্ব ঐতিহ্যগত শিক্ষাব্যবস্থা

আমাদের দেশে ইংরাজদের শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবার আগে চার ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রথমটি পাঠশালার শিক্ষা, দ্বিতীয়টি ফার্সী শিক্ষা, তৃতীয় মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা, চতুর্থ আখড়া চতুষ্পাঠীর শিক্ষা। ফার্সী শেখা হ'ত প্রধানতঃ ব্যবহারিক কারণে, দিল্লী-আগ্রায় বা নবাব সরকারে বা জমিদার সরকারে চাকরী পাবার উদ্দেশ্যে। সম্পন্ন ঘরে মুন্সী রেখে ছেলেদের ফার্সী শেখানো হ'ত। অনেক ক্ষেত্রে ফার্সী বিশারদরা বাড়িতে ছাত্র রেখে লেখাপড়া শেখাতেন। ফার্সী শিখতেন প্রধানতঃ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলেরা। সদ্গোপ প্রভৃতি নবশাখও কিছু কিছু ছিল। মক্তবে আরবী ফার্সী ও ইসলামী শাস্ত্রাদি কিছু পড়ানো হ'ত। উচ্চ শিক্ষার জন্য মক্তবের ছাত্ররা যেত মাদ্রাসায়। এখানে তারা ইসলামী শাস্ত্র, আচরণবিধি ও আইন বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। স্বভাবতই এতে মুসলমান ভিন্ন আর কেউ পড়তে যেত না। মাদ্রাসায় সাধারণত উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানরাই পড়তে যেত।

আখড়া চতুষ্পাঠীতে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের পড়বার অধিকার ছিল। চতুষ্পাঠী বা টোলে কাব্য, অলংকার, দর্শন, ন্যায় ও স্মৃতি পড়ান হত। আয়ুর্বেদ পড়াবার জন্য স্বতন্ত্র টোল থাকত। যে ছেলে টোলে পড়বে ঠিক হ'ত সে পাঠশালায় যেত না। তার বিদ্যারম্ভ হ'ত বাড়িতেই। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে পাঠান হ'ত আখড়ায়। এখানকার পাঠ্যক্রম প্রধানতঃ ব্যাকরণ ও কিছুটা কাব্য ও অলংকার। আখড়ার শিক্ষা শেষ করে তারপর টোলে গিয়ে পড়াশোনা।[১]

আখড়া চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা ও ফার্সী শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল বিশারদ তৈরী করা। সাধারণতঃ উচ্চবংশীয় ছাত্ররা, হিন্দুদের মধ্যে উচ্চজাত ও মুসলমানদের মধ্যে আশরফ শ্রেণীর ছেলেরা ছাড়া বিশারদ হবার সুযোগ বিশেষ কেউ পেত না। এর বাইরে সর্বসাধারণের ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেই পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে পারত। পাঠশালার শিক্ষক গুরুমশায় বা পণ্ডিত বলে পরিচিত ছিলেন। এঁরা মুসলমান বা হিন্দু অন্ত্যজ জাতির লোক হলেও কোন বাধা ছিল না। এই পাঠশালার শিক্ষা নিয়ে আজ কয়েকটা কথা বলব।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান শুরু করে। ১৮০২ থেকে ১৮৩৫ পর্যন্ত বিভিন্ন

পর্যায়ে অনুসন্ধান চলে। এর ফলে আমাদের দেশের চার প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রভূত তথ্য জানা যায়। ১৮২৩ সালে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের পরোক্ষ হিসাব অনুযায়ী বিহার ও বাংলায় এক লক্ষ পাঠশালা ছিল।[২] তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক সমীক্ষা করেছিলেন উইলিয়ম অ্যাডাম। সরকারের নির্দেশে সমীক্ষা করে অ্যাডাম তিনটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন। অ্যাডামের তিনটি রিপোর্টই বিখ্যাত। অ্যাডাম হিসেব করে দেখিয়েছেন যে এক লক্ষ পাঠশালা থাকলে প্রতি চারশজন লোক পিছু একটা করে পাঠশালা থাকে এবং ৩১ বা ৩২টি বালক পিছু একটা করে পাঠশালা হয়। সরেজমিন সমীক্ষা করে অ্যাডাম দেখেছিলেন অধিকাংশ গ্রামেই অন্তত একটা করে পাঠশালা আছে। একাধিক পাঠশালাও অনেক গ্রামে ছিল। বর্ধমান জেলায় অ্যাডাম দেখেছিলেন একটি গ্রামে ছিল সাতটি পাঠশালা। আর একটি গ্রামে ছয়টি এবং অপর একটি গ্রামে পাঁচটি। নয়টি গ্রামে পাঠশালা ছিল তিনটি করে।

তখন বাংলা ও বিহারে গ্রামের সংখ্যা ছিল ১,৫০,৭৪৮। অধিকাংশ গ্রামে এক বা একাধিক পাঠশালা থাকলে পাঠশালার মোট সংখ্যা এক লক্ষ না হলেও কাছাকাছি হবে। সংখ্যা নিয়ে এত কথা বললাম এই জন্য যে অ্যাডামের নামে সুনির্দিষ্ট ভাবে এক লক্ষ পাঠশালার কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে সংখ্যাটা এক লক্ষ কি আশি হাজার বা অন্য কিছু সেটা বড় কথা নয়। আসলে পাঠশালার বিস্তার সম্পর্কে অ্যাডাম অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছেন।[৩] অনুরূপ কথা বলেছেন উইলিয়ম ওয়ার্ড।[৪] ১৮৮৪ সালের রিপোর্ট অব দি এডুকেশন কমিশন অব ইণ্ডিয়াতেও একই কথা বলা হয়েছে।[৫] অ্যাডাম দীনতম লোকের মধ্যেও শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল বলেছেন।

দীনতম কথাটা জাত ও আর্থিক সঙ্গীত উভয় দিক থেকেই প্রযোজ্য। অ্যাডাম মুর্শিদাবাদ বর্ধমান ও বীরভূম এই তিনটি জেলায় পাঠশালার ছাত্রদের জাতি পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন। এই তিনটি জেলায় মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০,৬৫৩। এর মধ্যে মুসলমান ১,০৮৩, খ্রিষ্টান ছাত্র সংখ্যা নগণ্য, ৩৩। বাকী অর্থাৎ হিন্দু ছাত্র ১৯,৫৩৭। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ প্রমুখ উচ্চ জাতির ছাত্র ২৮ শতাংশ, নবশাখ জাতিসমূহের ছাত্রসংখ্যা ৪৭ শতাংশ এবং অজলচল ও অন্ত্যজ জাতির ছাত্র ২৫ শতাংশ। অজলচল ও অন্ত্যজ জাতের মধ্যে সুবর্ণবণিকদের কথা স্বতন্ত্র। কেননা, তাদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে লেখাপড়া জানা অপরিহার্য। কিন্তু বৃত্তির কারণে লেখাপড়ার প্রয়োজন থাকবার কথা নয়। এমন জাতের ছাত্র ঢের ছিল যথা, কৈবর্ত, জালিয়া, বাগদী, পাশি, মুচি, মালি, ডোম, কলু, শুঁড়ি, ধোপা, চণ্ডাল, হাড়ি, তিয়র, মাল, মেটে, লাহিরি। ১১৯৮ সালে লেখা একটি দলিলে একটি পাঠশালার ছাত্রদের নামের তালিকা আছে।

আখড়া, টোল বা মাদ্রাসায় পড়বার জন্য কোন খরচ লাগত না। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভূ-স্বামী, নবাব এমন কি বাদশারাও ভূমিদান করতেন।

এছাড়া সম্পন্ন লোকেরা টোল মাদ্রাসার শিক্ষকদের নগদ টাকা, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস বিভিন্ন উপলক্ষে দান করতেন। কিন্তু পাঠশালার গুরুমশায়দের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না, বুকানন বলছেন।[৬]

কথাটা সবক্ষেত্রে সমানভাবে খাটে না। অনেক জায়গায় গ্রামের ধনীলোকেরা গুরুমশায়কে বাঁধা বেতন দিয়ে পাঠশালা খুলতেন, সেখানে তাদের বাড়ির ছেলেরা পড়ত আবার গ্রামের অন্য ছেলেরাও পড়তে আসত। এরকম ক্ষেত্রে গুরুমশায় রুজি রোজগারের জন্য ছাত্রদের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বোধহয় এই সুযোগ ছিল না। সেক্ষেত্রে ছাত্ররাই গুরুমশায়ের ব্যয় নির্বাহ করত। এই বিষয়ে একটু পরেই বলছি। তবে গুরুমশায়কে যা দিতে হ'ত তার পরিমাণ সামান্যই। কিন্তু এটুকু দেবার সামর্থ্যও অনেক অভিভাবকের ছিল না, এদের ক্ষেত্রে গুরুমশায়রা সাধারণতঃ বেতন ও অন্যান্য দেয় মকুব করে দিতেন। অনেকে আবার ছাত্রদের কাছ থেকে কিছু না নিয়েই পাঠশালা চালাতেন। অ্যাডাম এরকম চিত্রই দেখেছিলেন।[৭]

কবি জসীমউদ্দীনের আত্মজীবনীতে তাঁর পাঠশালার কথা আছে। বর্তমান শতকের প্রথম দিকের ঘটনা। জসীমউদ্দীনের গুরুমশায় অভাবী ছাত্রদের বিনা বেতনেই পড়াতেন। পড়ুয়াদের মত গুরুমশায়দের মধ্যেও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী লোক ছিল। ফ্রানসিস বুকানন দিনাজপুরে এরকমই দেখেছিলেন।[৮]

তবে মুসলমান গুরুমশায়দের সংখ্যা বেশি ছিল না। হিন্দু গুরুমশায়দের মধ্যে কায়স্থদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তারপরেই ব্রাহ্মণ। বৈদ্য খুব কম। বাদবাকি নবশাখ থেকে অন্ত্যজ। এদের মধ্যে আছে কামার-কুমার, তিলি, কৈবর্ত, গোয়ালা, সদ্গোপ, তাঁতি, নাপিত, কলু, শুঁড়ি, ধোপা, বাগদি, চণ্ডাল, যুগী, বারুই, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক প্রভৃতি। প্রাচীন চিঠিপত্র ও দলিল দস্তাবেজ থেকেও অনেক নবশাখ অজলচল ও অন্ত্যজ গুরুমশায়ের নাম পাওয়া যায়। অ্যাডামের রিপোর্ট অনুসারে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূমের হিন্দু গুরুমশায়দের মধ্যে প্রায় ৭৫ ভাগ উচ্চ জাতির এবং ২৫ ভাগ নবশাখ, অজলচল ও অন্ত্যজ জাতিভুক্ত। নীচু জাতের গুরুমশায়ের কাছে উঁচুজাতের ছাত্ররাও পড়তে যেত। অ্যাডামের মুর্শিদাবাদের রিপোর্টে সেকথা আছে।[৯]

গুরুমশায়দের মধ্যে কেউ কেউ সম্পূর্ণ বিনা বেতনে পাঠশালা চালাতেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল অকাতরে বিদ্যা দান। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকতা ছিল গুরুমশায়দের জীবিকা। আয় বেশি হ'ত না। ধনীলোকে অনেক সময় গুরুমশায়দের বাঁধা মাইনে দিয়ে গ্রামে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করতেন। এরকম ব্যবস্থা না থাকলে ছাত্ররা হয়ত প্রতিমাসে দক্ষিণা দিত। দক্ষিণার পরিমাণ ছিল অবস্থা বিশেষে দু-আনা থেকে আট আনা। নিয়মিত বেতন দেবার সামর্থ্য না থাকলে মাঝে মাঝে খোরাকি বাবদ কিছু নগদ পয়সা। দু-আনা বা তিন আনা যাই হোক—কোথাও ছাত্ররা যে যেমন পারল চাঁদা দিয়ে কিছু টাকা তুলে দিত। এর পরিমাণ দু-তিন টাকার বেশি হ'ত না। এ ছাড়া গুরু-

মশায়কে সিধা দেবার প্রথা ছিল। শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি উপলক্ষে কিছু দক্ষিণা দেওয়া হত। দুর্গাপূজার সময় গুরুমশায়রা নগদ পয়সায় বা নতুন কাপড় পার্বণী পেতেন। অবস্থা বিশেষে পার্বণীর পরিমাণ ন্যূনপক্ষে আট আনা আর ঊর্ধ্বপক্ষে সাত আট টাকা পর্যন্ত উঠত। সবরকম মিলিয়ে গুরুমশায়েরা যা পেতেন তাতে মাসে তিন-চার থেকে সাত-আট টাকা আয় হ'ত।

ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য গুরুমশায়দের সঙ্গে অভিভাবকদের চুক্তি হ'ত এমন প্রমাণ আছে। নওয়াপাড়া গ্রামনিবাসী শ্রী শেখ কালাচাঁদের সঙ্গে কাচগড়্যা নিবাসী গুরুমশায় শ্রী সনাতন সরকারের এই রকম চুক্তির দলিল পাওয়া গেছে। ১২৬৬ সালের ১৩ শ্রাবণ তারিখে শেখ কালাচাঁদ একরারনামা লিখে গুরুমশায়কে বলছেন :

"আমার পুত্র শ্রী কোজলু হোসেন ও শ্রী তথুদ্দর্ক হোসেন আপনার নিকট লেখাপড়া করিবার কারণ পাট কেলট্ট কট হরফ খাতাসোহী ও হিসাব নিকাস বাংলা হিসাবে ও হরফে ও ইন্তিহামে পুরা কেরিআ দিবেন সন ১২৬৬ সাল নাং সন ১২৬৭ সাল মাহ আশ্বীন তক তৈয়ার করিয়া দিবেক আর আমার নিকট দরমাহা মাঘ মোট চুক্তি সর্ব্বসুদ্ধা কোং ২৫্ পেচিষ টাকা দিবো টাকার করাবে, কি মাহাতে ।। আট আনা দিবো …পরে ইন্তিহাম পুরা করিয়া ইন্তাম নিয়া আপনার মাহিনে হিসাব করিআ দিবো আর এই করারের ভিতর তৈয়ার করিআ না দিতে পার তবে আমার টাকা ফেরত আপনার ঠাই চাইবো ।।"

গুরুমশায় সনাতন সরকার এই চুক্তি মেনে নিয়ে শেখ কালাচাঁদকে লিখছেন যে এক বছরের মধ্যে ছেলে দু-টিকে তিনি যথোপযুক্ত শিক্ষা দেবেন। তবে,

"উক্ত ছাত্রদিগকে ত্বআর না করিআ দিতে পারি তবে আপনার টাকা ফিরৎ দিবো আপনার পুত্রদিগের সাভালি করিআ কামাঞী করে এবং অন্ন কোন উজর হয় তবে আমি মহাশয়কে চিটী লিখিয়া জানাইবো।"[১০]

উপার্জন কমের দিকে হ'লে পাঠশালায় পড়িয়ে সংসার প্রতিপালন করা যেত না। তাই গুরুমশায়দের অনেকেই বংশানুক্রমিক বৃত্তি বা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করতেন। গুরুমশায়দের অনেকেই চাষ করতেন বা তাঁত চালাতেন বা দোকানদারি বা পৌরোহিত্য করতেন। একজন তাঁতি গুরুমশায়ের কথা অ্যাডাম লিখেছেন। ইনি দিনে কাপড় বুনতেন এবং রাত্রে পাঠশালায় পড়াতেন। সাধারণতঃ গুরুমশায়দের আর্থিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। উপার্জন একটু বাড়ানোর আশায় গুরুমশায়রা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে ছাত্র সংগ্রহ করতেন। বোধ করি, গুরুমশায়দের দৈন্যও শিক্ষা বিস্তারের একটা উপলক্ষ হয়ে থাকবে। অন্তত অ্যাডাম সেইরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পল্লীচিত্র' গ্রন্থে পাঠশালার বিবরণ আছে। দীনেন্দ্রকুমারও গুরুমশায়ের ছাত্রসংগ্রহ অভিযানের উল্লেখ করেছেন।

অনেক গ্রামেই পাঠশালা বলে স্বতন্ত্র কোনো ঘর থাকত না। কারও বাড়ির

চণ্ডীমণ্ডপে বা বৈঠকখানায় বা দাওয়াতে অথবা দোকানের চালায় পাঠশালা বসত। এরকম কিছু না পাওয়া গেলে গ্রামের সদর জায়গায় বড় গাছের নীচে পাঠশালার কাজ চলত। কিছু কিছু গ্রামে আলাদা পাঠশালা ঘর ছিল। সে ঘর হয়ত কোনো ধনী-লোকের করে দেওয়া। অথবা কারও দেওয়া জমিতে গ্রামবাসীরা নিজেরাই উদ্যোগ আয়োজন করে ঘর তুলে নিয়েছে। গুরুমশায় ও ছাত্ররা মিলে ঘর তুলে নিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে।

পাঠশালা চালাবার জন্য ব্যয় হত সামান্যই। পাঠশালার উপকরণ বলতে কিছুই ছিল না। গুরুমশায় মাটিতেই বসতেন। আসনটিও তাঁর নিজের। ছাত্ররা বসবার আসন, লেখার সরঞ্জাম নিজেরাই নিয়ে আসত। বাড়িঘরের কথা তো এখনই বললাম। গুরু-মশায়ের ভরণ-পোষণ হ'ত ব্যক্তিবিশেষের দানে অথবা ছাত্রদের আয়োজনে। দেখা যাচ্ছে, যা কিছু প্রয়োজন তার সংস্থান গ্রামের লোকে নিজেরাই করে নিত। এর জন্য তারা কারও মুখাপেক্ষী হ'ত না। গ্রামসমাজের স্বয়ম্ভর স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাতেই লেখাপড়ার আয়োজন হ'ত। গ্রামের সহায়-সম্বল দিয়ে কামার কুমার ধোপা নাপিত প্রভৃতি প্রতি-পালিত হ'ত। ওইভাবেই পাঠশালা ও গুরুমশায়কে গ্রামসমাজ প্রতিপালন করত।[১১] লেখাপড়া শেখা গ্রামীণ জীবনযাত্রার অঙ্গ ছিল। গ্রামের চাষীবাসী কারিগর ভদ্রলোক সকলেই এই শিক্ষার গুরুত্ব বুঝত এবং ছেলেরা যাতে এই শিক্ষা পায় তার জন্য চেষ্টা করত।

পাঠশালায় কী শেখান হ'ত এখন তার আলোচনা করব। পাঠশালা সম্পর্কে দ্বিজ রামদুলাল রায়ের একটি পুঁথি আছে। পুঁথির একজায়গায় শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অংশটি পড়ছি :

অষ্টাদশ ছাওয়াল পড়িছে নিরন্তর
অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর ॥
বিবিধ প্রকার অঙ্ক শিখিয়াছে সভে।
অষ্টকোঠা অষ্টপর শিক্ষা করে ইবে ॥
সরকার বেড়িয়া সভে বস্যে ডানি বাঁ
অধ্যয়ন করাইছে সুখিরাম খাঁ ॥
তিলির নন্দন তার নাবাঙ্গিতে বাস
কঠিন কঠিন অঙ্ক করিছে প্রকাশ ॥
শ্রীরামদুলাল দ্বিজ কবি ছান্দে কয়
অংকে হল্যে অস্থির সুস্থির কর্যা লয় ॥[১২]

দেখা যাচ্ছে অংকের ওপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। পাঠশালার পাঠ্য বিষয় দেখলে বোঝা যায় যে গ্রামীণ সমাজের ব্যবহারিক জীবন সুষ্ঠুভাবে চালাবার মত উপযুক্ত শিক্ষা গুরুমশায়রা দিতেন। পড়া এবং লেখা শেখার সঙ্গে অংকশিক্ষার ওপর খুব

জোর দেওয়া হ'ত। হিসাব রাখা ও খাতা লেখা বেশ ভালভাবে শেখান হত। সাধারণতঃ অংক ও হিসাব শেখান হত শুভংকরের আর্যা ধরে। সব গুরুমশায়ের কাছেই শুভংকরের পুঁথি থাকত। তবে উগ্র বলরামের পাটীগণিতও চালু ছিল। এতে নানাপ্রকার সমস্যা পূরণের পাঠ দেওয়া আছে। কৃষি ও ব্যবসার হিসাব পৃথকভাবে শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। কিছু পাঠশালাতে দু-রকমই শেখান হত। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে গুরুমশায়রা হয় কৃষি নতুবা ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাব শেখাচ্ছেন। এ ছাড়া ব্যবহারিক বিদ্যা হিসেবে শেখান হত বিভিন্ন প্রকার সম্বোধনসহ চিঠি লেখার বয়ান, পাট্টা, কবুলীত, অর্পণনামা, একরারনামা, দরখাস্ত, হুণ্ডি, জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলের বয়ান। জমিজমা সংক্রান্ত নিয়মকানুন শেখানোর জন্য মহলকালি পুঁথি প্রচলিত ছিল। এতে সহজভাবে সরল ভাষায় নিয়মকানুন বোঝানো আছে।

বীরভূম জেলার খুজুটিপাড়া গ্রাম থেকে পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের ৯৮ প্রকার গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। এটি ১২৭২ সালে অর্থাৎ ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের তারিখ যুক্ত। গ্রন্থটি ব্যাপক। এর সব কিছু যে প্রত্যেক পাঠশালায় শেখান হ'ত তা মনে করবার কারণ নেই। তবে কী শেখান উচিত তার তালিকা হিসেবে গ্রন্থটি খুব মূল্যবান।[১৩]

গ্রন্থের প্রথম দিকে আছে অক্ষর শিক্ষা, যুক্তাক্ষর বানান শিক্ষা, এরপর কড়া গণ্ডা প্রভৃতি অংকের ধারাগুলো মুখস্থ করবার কথা। এর ফলে শস্য কেনাবেচা, মজুর মাহিন্দারের মাস মাইনে, বাৎসরিক মাইনের হিসাব নিকাশ শেখা হ'ত। তার পরে আছে সোনা রুপা পিতল কাঁসা কেনাবেচা সম্পর্কিত হিসাব।

মহাজনীর জন্য আছে সুদকষা, মুদিআনী প্রভৃতি ব্যবসার জন্য আছে পসরি জায়, মণকষা, বিশা খরিদবিক্রি ও ওজনের নিয়মাবলী।

মাপজোকের জন্য শেখাবার কথা ইট-কালি, নৌকা-কালি, পুষ্করিণী-কালি। কিছু কিছু জ্যোতিষ শেখাবার কথা আছে। কবিরাজী চিকিৎসার অনুপান বিষয়ে জ্ঞান দেবার জন্য চিকিচ্ছার তোলার পরিমাণ সম্পর্কে বলা আছে। ঠিকাদারী প্রভৃতি কাজের জন্য পাকা রাস্তার মাপ।

তারপরে রয়েছে 'চিঠিপত্র লিখিবার ধারা', 'গ্রাম লিখিবার ধারা', 'নাম লিখিবার ধারা', 'খত লিখিবার পদ্ধতি'। জমা গুজস্তার খাজনা, দাখিলা, খতপাট্টা, কবুলীত, খোস কবলা, কট কবলা, ইজারা বন্দক, হুকুমনামা, পাট্টা কবুলীত প্রভৃতি জমিদারী সংক্রান্ত বিষয় ছিল পাঠশালার পাঠ্য।

এর পরে আছে আইন ও বিচার সংক্রান্ত নিয়মাবলীর পাঠ।

গ্রন্থটি দেখলে মনে হয় গৃহস্থের ছেলেকে ব্যবহারিক জ্ঞানে পাকাপোক্ত করে তোলাই ছিল পাঠশালা শিক্ষার উদ্দেশ্য।

জ্ঞানকৌমুদী নামে একটা পুঁথি পাওয়া গেছে, এটা পাঠশালায় ব্যবহার করা

হ'ত। এই গ্রন্থ ধরে হিন্দু ছাত্রদের 'লিখনের পাটাপাট' অর্থাৎ বিভিন্ন সম্পর্কের ব্যক্তিকে উপযুক্ত সম্বোধনসহ চিঠি লেখবার পদ্ধতি শেখান হ'ত। মুসলমান ছাত্রদের চিঠিপত্র লেখা শেখাবার জন্য স্বতন্ত্র ধারা প্রচলিত ছিল। 'মোছলমানের প্রকরণ' অনুসারে পীর মুরিদ ও বিভিন্ন আত্মীয় সম্পর্কের লোককে 'খত' লেখার স্বতন্ত্র 'সেরেস্তা' শেখাবার পুঁথিও পাওয়া গেছে।

পাঠশালার পাঠ্যবস্তু ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান কড়চা বা সংকলন পাওয়া গেছে। এতে নারায়ণ দাস, শুভংকর দাস, গোপাল, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, রামনারায়ণ, দ্বিজ রামদুলাল রায়, শোভারাম, কিংকর, নন্দরাম ও কৃপারামের ভণিতায় পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষাপদ্ধতির কথা সংকলিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে শিক্ষিত লোকেরা যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতেন।

এর পরে বলতে হয় ভাষা, সাহিত্য ও নীতিশিক্ষার কথা। কিছুটা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়ান হত। শব্দরূপ ও ধাতুরূপ শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। অষ্টশব্দী ও অষ্টধাতুর পুঁথি গুরুমশায়রা রাখতেন, অমরকোষ অবলম্বন করে কিছুটা সংস্কৃত ব্যাকরণ আর শব্দসবন্ত ধরে শেখান হত শব্দের ব্যুৎপত্তি।[১৪]

পাঠশালায় সংস্কৃত বিদ্যা বেশি শেখান হ'ত না ঠিকই। কিন্তু গুরুমশায় এবং পড়ুয়াদের জাতি পরিচয়ের কথা মনে রাখলে পাঠশালায় এইটুকু সংস্কৃত পাঠও খুব বড় কথা। কারণ সাধারণভাবে আমরা জানি যে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন অন্য কারও সংস্কৃতে অধিকার ছিল না। সুকুমার সেন লিখেছেন যে রাঢ়ের কয়েকটি জায়গায় ডোমজাতের পণ্ডিত চতুষ্পাঠী স্থাপন করে সংস্কৃত পড়াতেন। ডোম পণ্ডিতদের চতুষ্পাঠী বর্তমান শতকের গোড়ার দিকেও ছিল।

বাংলা কবিতা বলতে সরস্বতী বন্দনা, গুরুবন্দনা এবং গুরুদক্ষিণা অবশ্য পাঠ্য ছিল। এ ছাড়া গঙ্গাবন্দনা, যোগাদ্যাবন্দনা, মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, বাংলা গীতগোবিন্দ, দাতাকর্ণ মহাভারতের আদিপর্ব এবং হাতেমতাই প্রভৃতি কাব্য পড়ানো হ'ত। এই আখ্যানগুলো থেকে নীতিশিক্ষা দেওয়া হত। তবে নীতিশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রচলিত ছিল। এইরকম একটা গ্রন্থের নাম শিশুজ্ঞানচরিত্র। গ্রন্থটি কবিতায় রচিত। রচয়িতার নাম দ্বিজ দুর্গারাম। এই গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

বিদ্যার কারণে পূর্বে শ্রীনন্দের নন্দন
ব্রাহ্মণের ভৃত্য হয়্যা সেবিল চরণ
বিদ্যার কারণ হেতু রাম দামোদর
পড়িবারে গিয়াছিল অবন্তি নগর
ব্রহ্মা আদি দেবগণ না পায় ধিয়ানে
হেন হরি পড়িল পাঠ গুরুর সদনে
যাহার শরীরে বিদ্যা সেই মহাজন

বিদ্বান হইলে সর্বত্র পূজিত সেইজন।
... ...
জন্ম দিয়া পিতামাতা কোন কর্ম করে।
মূর্খ পুত্র হইলে গালি দিয়া যায় পরে ॥
পিতা হইয়া পুত্রে যদি পাঠ না পড়ায়
কি কব তাহার কথা পুত্রবধ পায় ॥[১৫]

কোন কোন বিদ্যা শেখা উচিত দুর্গারাম তার আলোচনা করেছেন। অক্ষর পরিচয়ের পর শিখতে হবে সংখ্যা, তারপর বানান। গুরুদক্ষিণা পড়তে হবে, খত, পাট্টা পড়তে ও লিখতে শেখা দরকার। কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া প্রভৃতি অঙ্ক শিখতে হবে। তারপরে

শব্দস্যে খত শিখ জায় হবে জ্ঞান।
মুখের জড়তা যাবে পড় অভিধান ॥

অতঃপর দুর্গারাম পিতামাতা ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের সঙ্গে ভক্তিযুক্ত আচরণ করতে উপদেশ দিয়ে বলছেন :

"পিতামাতা জ্যেষ্ঠভাই করিয়া মার্জন।
বিষতুল্য দেখিবে পরের অমূল্য ধন ॥
পড়ুয়া পড়ুয়া দ্বন্দ্ব না করিহ কেহ।
মনে কর সকলে হইবে একাগ্রহ ॥"

অর্থাৎ পাঠশালায় সব ছাত্র এক গৃহের অধিবাসীর মত থাকবে। এটা মৌলিক মানবতাবোধের কথা।

দুর্গারাম শিশুদের জন্য আর্যা লিখেছিলেন। আর্যার মধ্যে উপদেশক্রমে দুর্গারাম বলছেন :

বিষদন্ত ভাঙ্গিলে ভুজঙ্গ হয় জরা।
চক্ষু থাকিতে অন্ধ বিদ্যাহীন যারা ॥
শিশুকালে না পড়িলে দ্বিজ দুর্গারাম কয়।
মনোদুখে মারা যাবে যৌবনসময় ॥

দলিলপত্র লেখার ও বোঝবার বিদ্যা শেখাবার জন্য শুভংকরের নামে আর্যা প্রচলিত ছিল। বিধি নিয়ম বুঝিয়ে বলবার পর শুভংকর বলছেন :

কাগজ লিখিবার যদি থাকে অভিলাষ।
কায়মন বাক্যে ইহা করিবে অভ্যাস ॥
ইহা না জানিয়া যেবা কাগজে অবেসে।
মিছা পরিশ্রম তার হয় দৈবদোষে ॥

জলেতে সাঁতার নাহি জানে যেইজন।
অগাধ নদীতে নামে করিয়া তর্জন ॥
পার নাহি হয় সে স্রোতে হয় ভাসা।
স্যাখত বিহিন জনার হয় সেই দসা ॥

পাঠশালা বসত দিনে দু-বার, প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে। বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্ররা একত্রে পড়ত। কিন্তু পাঠশালায় সাধারণতঃ মাত্র একজন গুরুমশায় থাকতেন। গুরুমশায় প্রত্যেককে পৃথকভাবে পাঠ দিতেন। ছাত্রকে পাঠশালায় বসে পাঠ অভ্যাস সেটা লিখে ফেলতে হ'ত। তারপর দিনান্তে গুরুমশায় বা একজন সর্দার পড়ুয়ার কাছে দাঁড়িয়ে সেটা পড়ে দেখাতে হ'ত যে তার কতদূর রপ্ত হয়েছে। অনেক সময় গুরুমশায়রা পুঁথিপত্র দেখে পড়া দিতেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুঁথিপত্র সামনে না রেখে যেমন যা মনে থাকত তেমন পড়া দিতেন। প্রত্যহ দিনান্তে ছাত্ররা একত্রে দাঁড়িয়ে সর্দার পোড়ো বা গুরুমশায়ের কাছে নামতা ও বানান অভ্যাস করত। এছাড়া নিয়মিত আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তবে ছাত্রদের যোগ্যতা ও উৎকর্ষ যাচাই করবার কতগুলো পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই রকম একটা পদ্ধতির কথা লালবিহারী দে লিখেছেন। এর নাম ঘোষা। বাড়ির কর্তা বা কর্তৃস্থানীয় কেউ বাড়ির ছেলেদের ও প্রতিবেশী ছেলেদের একত্রে দাঁড় করিয়ে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। এই পরীক্ষার সময় ছাত্রদের হাতে লেখার কোনো সরঞ্জাম দেওয়া হত না। মুখে মুখে অংক কষতে হ'ত ও বানান বলতে হত। লালবিহারী বলছেন, ঘোষা পদ্ধতি দেশের সর্বত্র প্রচলিত ছিল।[১৬]

আর এক রকম ছিল পুঁথি বন্ধক রাখা। পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের কাছে পুঁথি বন্ধক রেখে বসত। পরীক্ষক তাকে ছড়া কেটে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। ঠিকমত উত্তর দিতে পারলে পুঁথিটি পরীক্ষার্থী ফেরৎ পেত। না পারলে পরীক্ষক পুঁথিটি বাজেয়াপ্ত করে নিতেন। এবং অসফল পরীক্ষার্থীকে আবার গুরুর কাছে পাঠ নিতে হ'ত। এই রকম প্রশ্নোত্তরের পুঁথি প্রচলিত ছিল। খানিকটা আধুনিক কালের নোট বইয়ের মত। একটা পুঁথি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

বিনয় করে একটি কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
তুমি কেমন সুবোধ শান্ত বুদ্ধিমন্ত বুঝিব এবারে ॥
তোমার মুখে শুনিব সুখে অদ্ভূত কাহিনী।
ধর্মের জন্মের কথা কহ দেখি শুনি ॥
কহ দেখি আদ্যের শক্তির জন্ম বিবরণ।
কোথায় জন্মি ব্রহ্মা অগ্নি হুতাশন ॥
কোথায় জন্মিয়া মেঘ করায় গর্জন।
কোথায় জন্মিল মালা তিলক চন্দন ॥

কহ দেখি চন্দ্র সূর্য দুইজন কাহার নন্দন।
কহ দেখি পৃথিবীর মধ্যে অবষ্টব কোন জন ॥

এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে প্রশ্নকর্তা বলতেন,

সারদা দোহাই দিয়া ধরিলাম পুঁথি।
পুস্তক ছাড়াইয়া লহ যদি থাকেন শকতি ॥
যদ্যাসি পুস্তক তুমি ছাড়াইতে নার।
পুনর্বার গুরুর স্থানে অধ্যয়ন কর ॥

যাকে প্রশ্ন করা হল সে এক এক করে উত্তর দিয়ে শেষে বলত—

আমাদের শিক্ষাগুরু শ্রী অমুক মহাশয়।
তার ঠাঁই পড়ি পাঠ শুন মহাশয় ॥
সরস্বতি পদে মোর বিস্তর প্রণতি।
বিনয় করিয়া কহি ছাড়াইয়া পুঁথি ॥

ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা শুরু হয়। তখন এই ব্যবস্থার বহু ত্রুটি পর্যবেক্ষকদের চোখে পড়েছিল। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠশালায় কিছুই শেখান হ'ত না। অংক শিক্ষায় যোগ বিয়োগের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হ'ত। কুড়ির বেশী সংখ্যা দিয়ে গুণ শেখান হ'ত না। নামতা অভ্যাস করান হত মুখে মুখে। পড়ুয়ারা একত্রে চীৎকার করে সমস্বরে আবৃত্তি করত। এইভাবে শেখবার ফলে গুণন ভাগ ভালভাবে অধিগত হ'ত না। সাধারণভাবে শেখাবার পদ্ধতিতে ত্রুটি ছিল। যান্ত্রিকভাবে মোটামুটি ধরনে শেখান হ'ত। গুরুমশায়রাও অনেকে শিক্ষাদানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। পুঁথিপত্র খুব একটা ব্যবহার করা হ'ত না। ফলে গুরু-মশায় কী শেখাচ্ছেন, ঠিক কি ভুল তা বোঝা যেত না। ভুল হলে সংশোধনের উপায় ছিল না। বিশেষ করে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বানান সম্পর্কে এই সমস্যা খুবই প্রকট ছিল। গুরুমশায়রা অনেকেই এইসব বিষয়ে অবহিত ছিলেন না। শব্দের অর্থ লোকব্যবহারে নির্ধারিত হ'ত এবং বানান হ'ত উচ্চারণ অনুযায়ী। বাংলা দেখলেই বোঝা যাবে এই সমস্যা কতদূর জটিল হ'তে পারে। আড়ষ্ট বা অপরিশীলিত জিহ্বায় উচ্চারণের দরুণ বানান যদৃচ্ছ বিকৃত হত এবং তার ফলে অর্থের ক্ষেত্রেও বৈষম্য ঘটত।

আর একটা সমস্যা ছিল গুরুমশায়দের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুরুমশায়দের আর্থিক অবস্থা যে খুব খারাপ ছিল সে কথা আগেই বলেছি। অ্যাডামের মতে সমাজে তাঁদের মানও বিশেষ ছিল না।[১৭]

পরবর্তী সময়ে লালবিহারী দে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনেন্দ্রকুমার রায় পাঠশালার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে গুরুমশায়দের সামাজিক মর্যাদা

বিশেষ ছিল না। বলা যেতে পারে, তাঁদের অবস্থাটা গ্রামের পুরোহিত ব্রাহ্মণদের মত ছিল। আনুষ্ঠানিক সম্মান তাঁরা কিছুটা পেতেন। কিন্তু ভক্তিশ্রদ্ধা কেউ করত না। এমনকি ছাত্ররাও নয়। গুরুমশায়কে হয়ত তারা ভয় করত, কিন্তু আড়ালে অবজ্ঞা করত। অন্যদিক দিয়ে চিন্তা করলে পাঠশালা শিক্ষার ইতিবাচক গুণগুলো চোখে পড়বে। ব্যবহারিক শিক্ষা হিসেবে এর কার্যকারিতা এবং উপযোগিতা অনস্বীকার্য।[১৮]

অ্যাডামের উক্তি বিচার করার সময় মনে রাখতে হবে যে পাঠশালা শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কোন সংগঠন ছিল না। রাষ্ট্রের কোন অনুদানও থাকত না। সম্পূর্ণরূপে গ্রামের অভ্যন্তরিক সহায়-সম্বল নিয়েই পাঠশালা চলত। গ্রামের কোন ধনী-লোক যদি পাঠশালার ঘর করে দিতেন বা জমি দিতেন অথবা গুরুমশায়দের বেতন দিতেন তা হ'লে তাতেই চলত। এ সুযোগ না থাকলে গ্রামের লোকে নিজেরাই উদ্‌যোগী হয়ে পাঠশালা বসাবার ব্যবস্থা করত। বৃত্তি দিয়ে, সিধা দিয়ে, খোরাকি, পার্বণী দিয়ে গ্রামের লোকে নিজেরাই গুরুমশায়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দিত। এই স্বনির্ভরতাই পাঠশালার শিক্ষাব্যবস্থা বাঁচিয়ে রেখেছিল এবং এর ফলেই শিক্ষার প্রসার হয়েছিল। লেখাপড়া শেখার আগ্রহ সাধারণ লোকের মনে না থাকলে এটা সম্ভব হ'ত না। আর একটা বড় কথা এই যে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়াই সারা দেশে পাঠশালার পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষা পদ্ধতির একটা মান প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতকের সব পর্যবেক্ষকের চোখেই শিক্ষা দেবার এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের কতগুলো নির্দিষ্ট নীতি ও রীতি ধরা পড়েছে। সম্পূর্ণ বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার মধ্যে এইরকম নির্দিষ্ট মান কী করে গড়ে উঠল এবং সারা দেশে প্রচলিত থাকল সেকথা গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। সমাজে শিক্ষা লাভের আগ্রহ আছে, সেই সমাজ গ্রামীণ গণ্ডীর মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থার নিজস্ব সংগঠন চালু রেখেছে, মান বজায় রেখেছে, বাইরের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয়নি—এই ঘটনার সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য উপেক্ষা করা চলে না। গ্রামের মধ্যে ভেদাভেদ শাসন-শোষণ সবই ছিল, কিন্তু ভেদ সত্ত্বেও সবাই একত্র হয়ে এই কাজটা করত। সব জাতের ছেলে একজায়গায় এক গুরুমশায়ের কাছে লেখাপড়া করত। অ্যাডাম বলছেন গুরু-মশায় নীচুজাতের হলেও অসুবিধা হত না। আবার নানা জাতের ছেলে একত্রে পড়বে, এতেও লোকে আপত্তি করত না।[১৯]

১১৯৮ সালের একটা দলিলে একটি পাঠশালার ছাত্রদের নামের তালিকা আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ ছাত্রদের সাথে একত্রে পড়ছে ভুঞা, বণিক, নায়ক, ঘোষ, চং, গো পদবীধারী ছাত্রগণ।

উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সব জাতের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ ছিল বলেই এবং সমবায়মূলক গ্রামসমাজের সাংগঠনিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল বলেই পাঠশালার বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষাব্যবস্থা স্বচ্ছন্দে চালু ছিল।

বুকানন, অ্যাডামের সমীক্ষার সময়, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই পাঠশালা

শিক্ষাপদ্ধতির অবনতি শুরু হয়েছে। অ্যাডাম নিজেই দেখেছিলেন, যে আগে পাঠশালায় অনেক বেশী জিনিস আরও ভালভাবে শেখান হ'ত। তাঁর সমীক্ষার সময় সে সব জিনিস ক্রমশ উঠে যাচ্ছিল। আগে যেসব বিষয় পড়ান হ'ত, বিশেষ করে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে, তার একটা তালিকা দিয়েছেন অ্যাডাম।[২০]

পাঠশালায় পড়ান হত বাংলাভাষায়। কিছুটা সংস্কৃত পড়ান হ'ত বটে, কিন্তু পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করে টোলে পড়তে যাওয়া চলত না। দু-চারজন ব্রাহ্মণ সন্তান পাঠশালা থেকে আখড়া গিয়ে পড়াশোনা করে টোলে গিয়ে পড়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। পাঠশালা, আখড়া, টোল—পাঠক্রম এইভাবে সাজান যায় না। কিন্তু পাঠশালার বিদ্যা শুধুমাত্র বিষয়কর্মেই কাজে লাগত, তা নয়। সমাজে লেখাপড়ার নিয়ত চর্চা হ'ত। এই কথার স্বপক্ষে কিছু তথ্যপ্রমাণ দেওয়া সম্ভব।

দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা পুঁথি সংগ্রহের অন্যতম আদি পুরুষ। বহুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন যে বেশীরভাগ বাংলা পুঁথি তিনি পেয়েছেন নিম্নতর জাতিভুক্ত লোকের বাড়ি থেকে। দীনেশচন্দ্রের এই উক্তির তাৎপর্য অনুসন্ধান করে দেখা হয়নি। দেখলে মধ্যযুগীয় বাংলার সামাজিক জীবন সম্পর্কে নতুন ভাবে আলোচনার সূত্রপাত হ'ত।

ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যক বাংলা পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি সংগ্রহে মুখ্য প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ পুঁথিতেই পুষ্পিকা থাকে। পুষ্পিকা বহু তথ্যের আকর। এতে লিপিকাল, লিপিস্থান, লিপিকারের নাম, পুঁথির মালিক বা পাঠকের নাম, লিপিকার ও মালিকের বাসস্থানের উল্লেখ থাকে। এছাড়া গ্রন্থটি যদি বিক্রয়ার্থে লিপি করা হয় তবে মূল্যের পরিমাণ এবং লিপিকারের পারিশ্রমিকের পরিমাণও উল্লিখিত থাকে। সুতরাং বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায় পুষ্পিকার গুরুত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। পুষ্পিকা থেকে কিছু কিছু তথ্য সংকলন করে এখানে কয়েকটা কথা বলব।

পুষ্পিকায় নাম অধিকাংশই পদবীযুক্ত। পদবী দেখে জাতি বোঝা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব। কিছু কিছু পুষ্পিকায় নামের সঙ্গে জাতির পরিচয়ও দেওয়া আছে। লিপিকার ও গ্রন্থাধিকারীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রমুখ উচ্চজাতির সংখ্যা মন্দ নয়। তবে নবশাখ, অজলচল ও অন্ত্যজ জাতের সংখ্যাই বেশী। সব জাতির মধ্যে যদি লেখাপড়ার প্রচলন থাকে তবে এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক। কেন না উচ্চজাতি সংখ্যালঘু। পুঁথি নকল করা তখনকার দিনে কিছু লোকের পেশা ছিল। অক্ষরের ছাঁদ ভাল হলে অনেকে এই পেশা অবলম্বন করতেন। পুষ্পিকায় কিছু লিপিকারের আত্মপরিচয় আছে। তাতে দেখা যায় যে এরা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই কাজ করে গেছেন। লিপিকারদের মধ্যে যুগী, কৈবর্ত, ধোপা, গরাই ও ডোম জাতির লোক আছে। নিম্নতর জাতির লিপিকাররা উচ্চজাতির লোকের জন্য ধর্মগ্রন্থ নকল করে দিয়েছেন। পুঁথির মালিক পাঠক ও ক্রেতাদের

মধ্যে আছেন গন্ধবণিক, তাম্বুলি, বারুই, কুম্ভকার, সদ্‌গোপ, তাঁতি, ময়রা, তেলি, কৈবর্ত, ছুতার, যুগী, শুঁড়ি, ভূঁইমালি, ডোম, কোটাল, বাগদী, মাল ও পোদজাতীয় বিদ্যোৎসাহী লোক। এঁদের তালিকায় রামায়ণ-মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল ও বিভিন্ন দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক আখ্যান গ্রন্থাদি বহু আছে। এগুলো নিয়ে বেশী কিছু বলবার নেই। এঁদের পঠিত অন্য কতকগুলো গ্রন্থের কথা উল্লেখ করব। গ্রন্থগুলি বিষয়গুণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ ছোট একটা তালিকা দিচ্ছি : শ্রীকৃষ্ণভক্তিকল্পী, সনৎকুমার পটল, রসপুর কারিকা, ভক্তিচিন্তামণি, ক্রিয়াযোগদার, রসকদম্ব, ভাবাবেশগ্রন্থ, তত্ত্ববিলাস, স্বরূপবর্ণন নিগমগ্রন্থ, ভ্রমরগীতা। এ গ্রন্থগুলি তত্ত্বমূলক। শেষ দু-খানি বাদে বাকি সবগুলো গৌড়ীয় বৈষ্ণব গোস্বামী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামী, বিশেষ করে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব এবং গোপাল ভট্ট অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব, বিচার, বিশ্লেষণ ও প্রচারের জন্য অধিবিদ্যা, অধ্যাত্মতত্ত্ব, রসশাস্ত্র ও স্মৃতি সম্বন্ধে বিপুল গ্রন্থসম্ভার প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল নিয়ত তাত্ত্বিক বিচার দ্বারা ভারতে প্রচলিত অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও মতসমূহ থেকে নিজেদের বিশিষ্টতা প্রতিপন্ন করা। গোস্বামীদের সম্ভবতঃ আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার চৈতন্য পরিকর নিত্যানন্দ গদাধর দাস বা নরহরি সরকার অনুভব-নির্ভর গৌরপারম্যবাদ প্রচার করছিলেন। বাংলায় চৈতন্যদেবের নাম প্রচার এঁরাই করেছিলেন কিন্তু গোস্বামীদের অনভিপ্রেত। দ্বিমুখী সংগ্রামে গোস্বামীগণ বহুল তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করে ও যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করে নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সর্বসাধারণের জন্য গোস্বামী-মতাবলম্বী প্রচারকগণ গোস্বামী-গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। বাংলায় গোস্বামী মত প্রতিষ্ঠিত হলে গোস্বামী গ্রন্থসমূহের আদর বাড়তে থাকে। তেলি, মালি, যুগী, কৈবর্ত, ডোম, বাগ্দী, কোটাল, পোদ জাতির লোক এইসব গ্রন্থ পাঠ করছে এই ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কারণ এর সামাজিক ইঙ্গিত অতিশয় গভীর। প্রশ্নটা শুধুমাত্র ব্যবহারিক লেখাপড়া জানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বালোচনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।[২১]

ব্যবহারিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনে শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল এ কথা ঠিক। সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে জমিজমা, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিলি ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু সমাজে জ্ঞানচর্চা প্রসারের কারণ সম্ভবতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ। বৃন্দাবন গোস্বামীদের শিষ্যমণ্ডলী, নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ পাল এবং এঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে রাগানুগা মত এবং সহজিয়াপন্থীদের গ্রাস করে ক্ষেত্রবিশেষে অতিক্রম করে গোস্বামী মতই বাংলায় সমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঙালী হিন্দুদের আনুমানিক তিন-চতুর্থাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কথাটি শাস্ত্রীয় অভিধা।

চৈতন্যদেব নিজে দশনামী সন্ন্যাসী হলেও ধর্মাদর্শে মাধবাচার্যের পরিপোষক ছিলেন বলে তার সাম্প্রদায়িক পরিচয় মাধ্বী। এই সূত্রে চৈতন্যপন্থীরা মাধ্বী বলেই পরিচিত। এঁরা অনেক সময় যুগলমন্ত্রের উপাসক বলেও পরিচয় দিয়ে থাকেন। উপভাগ হিসেবে এঁরা নিত্যানন্দ শাখা, অদ্বৈতশাখা, গদাধরশাখা প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত। এঁদের মধ্যে ভেদাভেদ আছে। কিন্তু বৃহত্তর পরিচয়ের প্রশ্নে এঁদের অধিকাংশই গোস্বামী-মতের অনুগামী। তাই বাঙালী বৈষ্ণব সংস্কৃতি বলতে গোস্বামী মত ভিত্তিক সংস্কৃতিই বোঝায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে লেখাপড়ার প্রচলন খুব বেশী। চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তত্ত্ববিচার দ্বারা গোস্বামী মত প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। প্রাথমিক প্রতিষ্ঠার পর ক্রমাগত তত্ত্বমূলক বিচার করে অন্যমতের ওপর গোস্বামীমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে হ'ত। কারণ অন্য মতাবলম্বীগণ, যথা, অদ্বৈতপন্থী ও সহজিয়া ও গৌরনাগরী মতাবলম্বীগণ এবং কর্তাভজা, কিশোরীভজা প্রভৃতি সম্প্রদায় বিভিন্ন জায়গায় প্রবল ছিল। আবার গোস্বামীপন্থীদের মধ্যেও স্বকীয় ও পরকীয়া মতের বিরোধ ছিল। এই দুই দলের মধ্যে তত্ত্ববিচার চলত। তত্ত্ববিচার নানা পর্যায়ে হ'ত। ব্যক্তিগতভাবে, মঠ ও আখড়া ধরে। মহোৎসব ছিল তত্ত্ববিচারের সবচেয়ে বড় উপলক্ষ। কারণ মহোৎসবে নানা জায়গার গোস্বামী ও মহান্তগণ সমবেত হতেন। সভা করেও বিচার চলত। ১৭৩৭ সালে অম্বরের রাজা সওয়াই জয়সিংহের উদ্যোগে স্বকীয়া পরকীয়া সংক্রান্ত একটি বিচারসভা ছয়মাস ধরে চলেছিল। এতে পরকীয়াবাদীরা জয়লাভ করে শিরোপা পেয়েছিলেন। দেখা যাচ্ছে, তত্ত্ববিচারের ঐতিহ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রবল। বস্তুত তত্ত্ববিচার এঁদের ধর্মসাধনার অঙ্গ। রাগানুগাবাদীদের মতো নামে রুচি থাকলে আর স্মরণ, মনন ও কীর্তন করেই গোস্বামীপন্থীদের পরমার্থ লাভ হয় না। তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দীক্ষাগুরুর সঙ্গে তত্ত্বগুরুর আশ্রয় নিতে হয়। তত্ত্বগুরু তত্ত্বশিক্ষা দেন। কিন্তু টোলের মতো পাঠক্রম ধরে বয়ঃপ্রাপ্ত গৃহস্থ শিষ্যকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। বৈরাগী শিষ্যকেও ওই ভাবে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। কারণ তার নিজের আখড়া আছে অথবা সে আকাশবৃত্তি অবলম্বন করে ঘুরে বেড়ায়। তাই তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর লাভ করে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা গুরুর কাছে প্রশ্ন করে পাঠাত। প্রশ্ন পাঠাতে হ'ত কাগজে লিখে। গুরু প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে শিষ্যের কাছে পাঠাতেন। খ্যাতনামা তত্ত্বগুরুদের কাছে এত জিজ্ঞাসুর সমাবেশ হ'ত যে তাঁরা লোক পাঠিয়ে প্রশ্ন সংগ্রহ করে এনে আবার লোক মারফৎ তার উত্তর পাঠাতেন। সাধারণ বৈষ্ণবদের মধ্যেও তত্ত্বালোচনার অভ্যাস প্রচলিত ছিল। লীলাকীর্তনে গোস্বামী মতের বিস্তার করা হয়। কীর্তনগানের মধ্যে গোস্বামীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বাংলাপদ গেয়ে তার অর্থ বোঝান হয়। আখ্যানভাগের সঙ্গে তত্ত্বব্যাখ্যা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। লীলাকীর্তনের প্রসঙ্গে শোনা তাত্ত্বিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা বৈষ্ণবদের মধ্যে

বহুল প্রচলিত প্রথা। আবার সভাস্থলে বা দশজনের সম্মুখে পরস্পরকে ফাঁকি বা জটিল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও রীতিসিদ্ধ ব্যাপার। অর্থাৎ তত্ত্বালোচনা ও তর্ক ভিন্ন বৈষ্ণবদের ধর্মচর্চা সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। এই জন্য তত্ত্বকথা যেখানে যা জানা যেত সে সব লিখে রাখতে হ'ত। সহজভাবে তত্ত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে গদ্য সূত্রাকার প্রশ্নোত্তর দিয়ে গ্রন্থও প্রণীত হয়েছিল। এই ধরনের গ্রন্থগুলি আশ্রয়তত্ত্ব, আশ্রয় নির্ণয়, সিদ্ধিপটল প্রভৃতি নামে পরিচিত। এইসব গ্রন্থে কীভাবে তত্ত্বগত প্রসঙ্গ প্রকাশ করা হ'ত তার একটু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "উজ্জ্বল : কোন উজ্জ্বল—রস উজ্জ্বল ॥ কোন রস—প্রেমরস ॥ কোন প্রেম—নবপ্রেম ॥ কোন গণ—প্রহড়ার গণ ॥ কোন প্রহরা —নবরস প্রহড়া ॥ স্বভাব কি—প্রকৃতি ॥ কিশোরি জিউর কোন মুখ—মঞ্জুরী মুখ ॥ কোন আখ্যান—মঞ্জুরী আখ্যান ॥ কোন ভাব—গোপী ভাব ॥ কোন সখি—প্রিয় সখি ॥ কোন সম্প্রদায়—মধ্বাচার্য সম্প্রদায় কি ভাব—পরকীয়া ভাব ॥ তোমাতে কি সেবা ॥ এখানকার ভাব চরণ কমলে, সেখানকার ভাব হৃদয়কমলে।
ভক্তি কয়ে : ভক্ত দুই ॥ বৈরীভক্ত : রাগভক্ত এবং দুই ॥ বৈধীভক্তের প্রাপ্তি কোথা : বৈকুণ্ঠ ॥ রাগভক্তের প্রাপ্তি কোথা : শ্রীবৃন্দাবন। (সিদ্ধিপটল : নরোত্তম দাস)
উপযুক্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ের বৈধীভক্তিবাদীদের পরকীয়া মতাবলম্বী গোষ্ঠীর মূল উপপত্তিসমূহ সূত্রাকারে বিবৃত করা হয়েছে,
এইভাবে মূল উপপত্তিসমূহ জানবার পর ব্যাখ্যার প্রশ্ন ওঠে। তখন তত্ত্বগুরুর আশ্রয় নিতে হয় অথবা তর্কবিতর্ক করে জানতে হয়।

লেখাপড়া, বিশেষ করে জ্ঞানচর্চা ভিন্ন ধর্মচর্চা পূর্ণাঙ্গ হয় না বলে আখড়াধারী বৈষ্ণবদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল বেশী। আখড়াধারীদের মধ্যে নারীপুরুষ নির্বিশেষে শিক্ষা পেত। আগেকার দিনে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রালোচনা বৈষ্ণবীরা করতেন। গৃহস্থবাড়ির মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার দরকার হলে বৈষ্ণবীদের নিযুক্ত করা হ'ত।

পাঠশালা ব্যবস্থা ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির মিলিত প্রভাবে বাংলার গ্রামীণ সমাজে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। এই ধারা স্বয়ংক্রিয় স্বয়ংশাসিত গ্রামসমাজ দ্বারা পরিপোষিত হত। বাইরের কোন সহায়তা ব্যতিরেকে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ধারা অব্যাহত ছিল।

নীচুজাতি কায়িকশ্রম, দারিদ্র এবং অশিক্ষা সমার্থক, আমরা এইরকম একটা ধারণার বশবর্তী। ইংরাজ আমলের প্রশ্নে ধারণাটা হয়ত সত্যি। কিন্তু এখন যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় ইংরাজ-পূর্ব ভারতে অবস্থাটা সম্ভবতঃ অন্যরূপ ছিল। ইংরাজ আমলে ভদ্রলোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে সে শিক্ষিত। সাধারণ লোকে লেখাপড়া জানত না বলে ভদ্রলোক বিশেষ সম্ভ্রমের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। এই যুক্তিতে ছোটলোকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অশিক্ষা।

নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে ভদ্রলোকদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। বস্তুতঃ তারা বাধাও দিয়েছেন। আমাদের সমাজে উনবিংশ শতকে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এই মনোভাব বলতে পারি একটা নতুন ব্যাপার। স্পষ্টতই সমাজে বড় রকমের ছেদ ঘটে গেছে। কীভাবে এই ছেদ ঘটল তার একটা দিকের অর্থাৎ শিক্ষিত সমাজের মনোভাবের কথা আমরা কিছু জানি। কিন্তু যারা অশিক্ষিত বলে বিবেচিত হ'ত তাদের মধ্যে পূর্বাগত ঐতিহ্য কেমন করে কতখানি লোপ পেল এবং তার ফলে তাদের চিন্তা ও জীবনযাপনে কী পরিবর্তন হ'ল সেটা আমরা এখনও জানি না। এ বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

যে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য আমাদের সমাজে ছিল, সাধারণ মানুষের চিত্ত বিকাশে তার কার্যকারিতা অস্বীকার করা যাবে না। গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্য দিকগুলোও সেইজন্য আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন।[২২]

সংযোজন, টীকা ইত্যাদি □ পরমেশ আচার্য

হিতেশ সান্যাল আর আমাদের মধ্যে নেই। তার লেখা আছে। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক লেখা। গবেষক ঐতিহাসিক হিতেশ সান্যাল ছিলেন এক অমায়িক ব্যক্তিত্ব। বহু বিষয়ে ছিল তার অনুসন্ধিৎসা। ব্রিটিশপূর্ব ঐতিহ্যগত শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের একটি। কোন বিদ্বজ্জন-সভায় পাঠের জন্য লেখা এই প্রবন্ধটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। স্বচ্ছ চিন্তার এরকম সাবলীল প্রকাশ সত্যিই ঈর্ষণীয়।

প্রবন্ধটিতে হিতেশ কিছু উদ্ধৃতি এবং টীকা ও তথ্যসূত্রের অবকাশ রেখেছিলেন। আমার সাধ্যমত পাদপূরণের চেষ্টা করব।

১। হিতেশ সান্যাল টোলের প্রাথমিক স্তর হিসাবে আখড়ার কথা লিখেছেন। এ ধরনের আখড়ার অস্তিত্বের পক্ষে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আমি খুঁজে পাইনি। বাউল বৈষ্ণবদের আখড়া ছিল। তবে সেখানে পড়াশুনার চর্চা কতটা হত তার কোন প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এইসব আখড়ায় যে সংস্কৃত পড়ানো হত না সে বিষয়ে বুঝি সন্দেহ নেই। বৈষ্ণবীরা অনেকেই বাংলা জানতেন।* এরা যে বড় ঘরের মেয়েদের অনেক সময় কিছু লেখাপড়া শেখাতেন বা ধর্মীয় কাব্য পাঠ করে শোনাতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় উনিশ শতকের বড়বাড়ির ইতিহাসে। ঠাকুর বাড়িতেও এদের আনাগোনা ছিল।

* অ্যাডাম তার রিপোর্টেও লিখেছেন যে নাটোরে চৌদ্দ পনেরশ বৈষ্ণবী ছিল যারা মোটামুটি লিখতে পড়তে জানত এবং নিজেদের মেয়েদের লিখতে পড়তে শেখাত।

(Anathnath Basu edited Reports on the State of Education in Bengal by William Adam, Calcutta University, 1941, P. 189)

ব্রিটিশপূর্ব যুগে সংস্কৃত বাংলা হরফেও চর্চা হোত। তখনো 'নাগরী' সংস্কৃত চর্চার একমাত্র অক্ষর হয়ে ওঠেনি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাক্ষ্যে বলা যায় সংস্কৃত শিক্ষার্থীরাও বাংলা অক্ষর লেখার অভ্যাস করত। সম্ভবত বাড়িতে বা ব্রাহ্মণ গুরু-মশায়দের পাঠশালায় অক্ষর ও কিছু ব্যাকরণ শিখে পড়ুয়ারা টোলে পড়তে যেত।

২। উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর প্রথম রিপোর্টে লেখেন :

"A distinguised member of the General Committee of Public Instruction in a minute on the subject expressed the opinion, that if one rupee per mensem were expended on each existing village school in the Lower Provinces, the ammount would probably fall little short of 12 lakhs of rupees per annum. This supposes that there are 100,000 such schools in Bengal and Bihar and assuming the population of these two Provinces to be 40,000,000 there would be a village school for every 400 persons.... Taking, therefore, eleven-thirtieths of the above—mentioned 400 persons, and three—sevenths of the result, it will follow that in Bengal and Bihar there is on an average a village school for every sixty three children of the school going age."

সম্ভবত ১৮২৩ সালে এই minuteটি লেখা হয়। হিতেশ সান্যাল অ্যাডামের প্রথম রিপোর্টের ভিত্তিতেই একথা লিখেছেন। Anathnath Basu, ed, Reports on the State of Education in Bengal (1835 & 1836) by William Adam, Calcutta University, 1941 p. 6-7.

৩। আমার মনে হয়, হিতেশ সান্যাল অ্যাডামের যে দুটো কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন তা হচ্ছে :

(ক) "Their number (number of villages in Bengal and Bihar) has been officially estimated at 150,748 of which, not all, but most have each a school."

(খ) "...and it will still appear that the system of village schools is extensively prevalant; that the desire to give education to their male children must be deeply seated in the minds of parents even of the humblest classes...." Basu, ed, Adam's Report.

৪। ওয়ার্ড লেখেন :
"Almost all the larger villages in Bengal contain common schools."
W. Ward, A view of the History, Literature and Mythology of the Hindoos : Including a Minute Description of their Manner and Customs and Translation from their Principal works, Srerampore, 1818, vol. I, p. 160.
৫। ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশনের মতে :
"In Bengal, there had always existed a very large number of indigenous school."
"...every large Hindu village possessed a school of its own, and the foundation of a system of national education had, long previous to British rule been laid by the spontaneous efforts of Hindu and Muhammadan society."
উইলিয়াম অ্যাডাম, জেমস লঙ, হান্টার কমিশন এবং আরো অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ দেশজ শিক্ষাধারার এই গুরুত্ব বুঝতে পারলেও আমাদের উনিশ শতকের দেশীয় বিদ্বজ্জন এবং শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারকরা আদৌ বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন বলে মনে হয় না।
W. W. Hunter, Report of the Education Commission, 1884, Calcutta, p. 36, 56.
৬। বুকানন লেখেন :
"There is no public provision for these useful members of society, and they depend entirely on their scholars for subsistence."
Martin, History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, vol. II, p. 705.
৭। অ্যাডাম তার তৃতীয় রিপোর্টে বীরভূমের পাঠশালার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :
"There are not fewer than eleven teachers who instruct their scholars gratuitiously, and of these there are not less than four in one thana..." "...in each of the Bengal districts a greater or less number of the teachers bestow their instruction gratuitiously, and even teachers who are paid instruct many scholars who pay nothing." p. 250.

অবশ্য এ ধরনের গুরুমশায় খুব বেশী ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে গরীব ছেলেদের বিনাবেতনে পড়ানো হত তাতে সন্দেহ নেই। এইসব পড়ুয়ারা কখনো সখনো গাছের শব্জী বা ফলমূল উপহার দিত। Basu : Adam's Report. p. 235.

৮। বুকানন তার দিনাজপুর রিপোর্টে লিখছেন :

"The first rudiments of education are usually given, both by Hindus and Muhammadans, in small schools called Pathsala, under the tution of teachers called Gurus, who may be of any caste or religion, who are poorly rewarded..." Martin, ibid, p. 705.

সতীশচন্দ্র মিত্র তার যশোর-খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন যে বুরনির পরগণায় অনেক মুসলমান গুরুমশায় দক্ষ পাঠশালা শিক্ষক হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

৯। অ্যাডাম তার মুর্শিদাবাদ রিপোর্টে লিখছেন :

"Parents of good caste do not hesitate to send their children of schools conducted by teachers of an inferior caste and even of a different religion. For instance the Musalman teacher above mentioned has Hindus of good caste among his scholars, and this is equally true of the chandal and other low-caste teachers enumerated."

এই উক্তির স্বপক্ষে আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। Basu, Adam's Report p. 228.

১০। পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, বিশ্বভারতী, ১৯৬৮, পৃ. ২২৮-২২৯, দ্রষ্টব্য।

১১। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে নাপিত বা কামার-কুমোরের জন্য জমি বন্দোবস্তের নজির থাকলেও পাঠশালা গুরুর জন্য জমি বন্দোবস্তের উদাহরণ খুব একটা দেখা যায় না। আসলে নাপিত বা কামার-কুমোরের সঙ্গে গ্রাম সমাজের যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল পাঠশালা গুরুর সঙ্গে সম্পর্ক সেরকম ছিল না। বুকাননের মন্তব্য যে এদের জন্য কোন 'public provision' ছিল না, সেকথাই সাধারণভাবে ঠিক।

১২। পঞ্চানন মণ্ডল, পুঁথি-পরিচয়, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮, পৃ. ১০।

১৩। পঞ্চানন মণ্ডল, চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ ১০১-১০৩।

১৪। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সাক্ষ্যে এরকম ধারণা হয়ত করা যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। অন্তত বাংলা পাঠশালায় অমরকোষ অবলম্বনে সংস্কৃত ব্যাকরণ আর শব্দের ব্যুৎপত্তি শেখানো হত একথা বলার মত নিশ্চিত সাক্ষ্যের

অভাব আছে। কিছু ব্যাকরণ নিশ্চয়ই পড়ানো হত। অমরকোষের কোন বাংলা সংস্করণ প্রচলিত ছিল কিনা জানি না। সংস্কৃত সংস্করণ বোঝার মত সংস্কৃত বিদ্যা পাঠশালা গুরুমশায়দের যে ছিল না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অবশ্য অ্যাডাম এক জায়গায় লিখেছেন এগুলি একসময় পড়ানো হত। এখন আর পড়ানো হয় না। হিতেশ অ্যাডাম সাহেবের কথাই মেনে নিয়েছেন।

এ বিষয়ে আমি আমার 'বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা' নামক বইয়ে আলোচনা করেছি। এই প্রবন্ধের অনেক বিষয় সম্পর্কেই ঐ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫। পঞ্চানন মণ্ডল, পুঁথি-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ ৩৬৪।

শিশুজ্ঞান চরিত্রের লিপিকাল ১২৬৪ বাংলা সাল বা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ। কাজেই এই বইয়ের সাক্ষ্যে নিশ্চিত করে বলা যায় না যে ব্রিটিশপূর্ব যুগে নীতি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থও প্রচলিত ছিল। তবে বিভিন্ন পাঠে নীতি শিক্ষার বিষয় ছিল সন্দেহ নেই। তাছাড়া মুখে মুখে চাণক্যশ্লোক পড়ানো হত বলে মনে হয়।

১৬। লালবিহারী দে, Recollection of My School days, ed. Mahadev Prasad Saha, Edition Indian, Calcutta, 1969. p. 450-458.

১৭। "The Teachers depend entirely upon their scholars for subsistence, and being little respected and poorly rewarded, there is no encouragement for persons of character, talent or learning to engage in the occupation." Basu, ed. Adam's Report. p. 7.

অন্যত্র অ্যাডাম লিখছেন—

"The teachers, though qualified for what they undertake, are persons in no way respectable, their rank in life being low, their emolument scanty and sometimes their character publicly tainted without any injury to their interests."

কিছু সত্য থাকলেও এই কথা পুরো সত্য নয়। গ্রামের জমিদার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ব্রিটিশ যুগের ইংরেজি শিক্ষিতদের চোখে পাঠশালা গুরুমশায় নিতান্তই হেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু গ্রামের চাষী এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর চোখে পাঠশালা গুরু সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। আসলে ব্রিটিশপূর্ব যুগে বাংলা ভাষার প্রতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যে অবজ্ঞার ভাব ছিল সেই থেকে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পাঠশালা গুরুমশায়দের হেয় ভাবার প্রবণতা দেখা দেয়। এই প্রবণতা গভীর হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার দৌলতে। ব্রিটিশপূর্ব যুগে গ্রাম সমাজে পাঠশালা গুরুর যে একটি মর্যাদার আসন ছিল তাতে সন্দেহ করার কারণ দেখি না।

ব্রিটিশ শাসক ও পাদ্রীদের চোখ দিয়ে পাঠশালা শিক্ষার বিচার করা সব সময় ঠিক নয়।

১৮। অ্যাডাম তার দ্বিতীয় রিপোর্টে লিখছেন :

"In the matter of instruction there are some grounds for

commendation for the course I have described has a direct practical tendency; and if it were taught in all its parts, is well adapted to qualify the scholars for engaging in the actual business of native society. My recollection of the village schools of Scotland do not enable me to pronounce that the instruction given in them has a more direct bearing upon the daily interests of life than that which I find given, or professed to be given, in the umbler village schools of Bengal."

Basu, Adam's Report, p. 146.

পাঠশালার পাঠ্য বাংলা পুঁথির দিকে তাকালে এই উক্তি কত সঠিক তা বোঝা যায়। পাঠশালা শিক্ষার বিস্তারের একটা বড় কারণ তার ব্যবহারিক কার্যকারিতা। ব্রিটিশ আমলের প্রাথমিক স্কুলের সঙ্গে পাঠশালা শিক্ষার একটা মূল পার্থক্য এখানেই।

১৯। টীকা ৯ দ্রষ্টব্য।

২০। অ্যাডাম লেখেন—

"With regard to the nature of these works, the employment of the Amara Kosha, the Ashta Sabdi, Ashta Dhatu, Subda-Subanta and the verses of Chanakya as school-books in some of the vernacular schools of the Bengal districts indicates a higher grade of instruction than I had previously believed to exist in those schools. With the exception of the verses of Chanakya, the other works mentioned are gramatical and their use is said to have been at one time general, which would imply that they are the remains of a former superior system of popular instruction preparatory, in the case of those who could follow it up, to the more enlarged course of learned study. The remaining works used in the common schools rank low as compositions, and consist, for the most part, of the praises and exploits of the Gods recognised by the established religion of the country."

Basu, Adam, p. 253.

হিতেশ সান্যাল অ্যাডামের এই উক্তির উপর বড় বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়। এ বিষয়ে আমি আগে বলেছি। টীকা ১৪ দ্রষ্টব্য।

২১। আমি হিতেশ সান্যালের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত নই। গোস্বামী মতাবলম্বী

প্রচারকগণ গোস্বামী গ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু 'তেলি, মালি, যুগী, কৈবর্ত, ডোম, বাগদী, কোটাল, পোদ জাতির লোক এইসব গ্রন্থ পাঠ করেছে' এবং 'সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে তত্ত্বচিন্তা ও তত্ত্বালোচনার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে' —এতবড় সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই সব বইয়ের বাংলা অনুবাদ নিশ্চয়ই প্রমাণ করে বাংলায় তত্ত্বচিন্তা এবং তত্ত্বালোচনার পরিবেশ তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু 'সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে' এই প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার প্রমাণ নেই। মনে রাখতে হবে এমন কি কিছু স্মৃতি গ্রন্থেরও বাংলা অনুবাদ হয়েছিল। তাই বলে নীচুজাতের লোকেরা সেগুলি পাঠ করত এবং আলোচনা করত একথা বলা যায় না। সাধারণত সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞ ব্রাহ্মণ সন্তানদের বংশগত পেশা বজায় রাখার তাগিদেই এগুলির কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছিল। তেমনি বৈষ্ণব সমাজের মাথাদের গোস্বামী মতের তাৎপর্য অনুধাবনে সাহায্য করার জন্যই এই বইগুলির বাংলা অনুবাদ করা হয়েছিল। তাছাড়া সাধারণ্যে মুখে মুখে গোস্বামী মত প্রচারের জন্যও বাংলায় গোস্বামী মতের আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন গোস্বামীদের কৃপায় শেষ পর্যন্ত বাংলার লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ব্রাহ্মণ্য বাতাবরণে বরণ করার প্রথম ও প্রধান ভূমিকা নেয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদের ভিত্তি শ্রীমদ্‌ভাগবত। এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের শঙ্কর ভাষ্যই তারা মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন। বাংলায় বেদান্ত ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি কখনই সমাজের নিম্নতম পর্যায়ে দাগ কাটতে পারেনি।

২২। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভেদে ভদ্রলোক ও ছোটলোক অবশ্যই ব্রিটিশ যুগের চিত্র। কিন্তু ব্রিটিশপূর্ব গ্রাম সমাজেও যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভেদাভেদ প্রবল ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর এই ভেদাভেদ শিক্ষা ক্ষেত্রেও প্রকটছিল। ব্রাহ্মণদের জন্য ছিল সংস্কৃত শিক্ষা আর ব্রাহ্মণেতর সাধারণের জন্য ছিল বাংলা শিক্ষা। ব্রাহ্মণরা যে বাংলা ভাষার চর্চাকে অবজ্ঞা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই উক্তিতে—

কৃত্তিবেশে কাশীদেশে বামুন-ঘেঁষে।
এই তিন সর্বনেশে শাস্ত্র খেলে চুষে॥

আসলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদে ভদ্রলোক-ছোটলোক ভেদাভেদের বীজ খুঁজে পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতেই। ব্রিটিশ যুগে চরিত্র কিছুটা পাল্টেছিল মাত্র। বহু-জাতিক (multi caste) শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠায় ভদ্রলোক কথাটি ভিন্ন অভিধা পায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন জাত (caste) গড়ে উঠায় সমস্যাটি এক নতুন মাত্রা পায়।

গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্য দিকগুলির আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যাটির উপর নতুন আলোকপাতের যে প্রতিশ্রুতি হিতেশ সান্যাল দিয়েছিলেন তা পালন করার সময় তিনি পেলেন না। আমরাও আর একটি সুচিন্তিত-সুলিখিত প্রবন্ধ থেকে বঞ্চিত হলাম। □

প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়া

লোককথা

আসামের এককালীন গোয়ালপড়িয়া (বর্তমানে ধুবরি) জেলার গৌরীপুর রাজপরিবারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকে গানের সঙ্গে শিকার ছিল প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়ার দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। বেশ কিছু অসমীয়া ছবিতে প্লে-ব্যাক করা ছাড়াও বাংলা ছবিতেও গান গেয়েছেন। কাজ করেছেন ঋত্বিক কুমার ঘটকের 'বগলার বঙ্গদর্শনে'। সঙ্গীতনাটক অ্যাকাদেমি ছাড়াও পদ্মশ্রী ইত্যাদি পুরস্কারে ভূষিতা শ্রীমতী প্রতিমা পাণ্ডে বড়ুয়া ন'টা বাঘ মেরেছেন চিতাসহ। গোয়ালপড়িয়া লোকসংস্কৃতিকে সাধারণ্যে পরিচিত করার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য ভূমিকা আজ স্বীকৃত। গ্রামের মানুষজনকে সঙ্গে নিয়ে দেশি যন্ত্রেই তিনি এই গান পরিবেশন করেন।

গান গাইতাম মনের আনন্দে। পারিবারিক সূত্রেই গোয়ালপড়িয়া লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ। তখন বয়স কম ছিল। ভালও লাগত। কিন্তু সেই বয়সে সংস্কৃতি নিয়ে কিছু ভাবা বা বলা সম্ভব ছিল না। ক্রমে বয়স হল, নানান জায়গা থেকে ডাক পড়ল। আমাকেও প্রশ্ন করা হল সংস্কৃতির বহু জটিল বিষয়আশয় ও ইতিহাস প্রসঙ্গে। তখন সত্যই চিন্তায় পড়লাম।

লোকগান এসেছে শ্রুতির ঐতিহ্যশালী পথ ধরে। অর্থাৎ কিনা যে গান লোকমুখে প্রচারিত হয়। গান গাওয়ার মধ্যেই তার প্রচারের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থায় এসব ক্যাসেট-রেকর্ডের বালাই নেই। শুধু মুখে মুখে, কানে কানে শত শত বছর ধরে বেঁচে আছে এই লোকসঙ্গীত। আধুনিক সময়ে, পরবর্তী কালে, তাকে সংরক্ষণ করার কারণে রেকর্ড-ক্যাসেটে ধরে রাখা হচ্ছে। শহরেও এই গানের বাজার যথেষ্ট জমে উঠেছে। পয়সা উড়ছে যেমন তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঐতিহ্যশালী লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে উৎসাহ বেড়েছে। তাই এর গতিবিধিও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে কখনো লিখতে হবে ভাবিনি। আর সত্যিই কি লেখা যায়? যে গানের উৎস খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের শ্রম ও আনন্দ-প্রমোদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে হাজার হাজার বছর ধরে সেই গান তো নিজেই জীবন্ত। তার পদ-সুর ও তালের মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটেছে। শিল্পীরা তাতে গায়কির অনবদ্য ভাব এবং এক্সপ্রেশন দিয়ে সেই গানে এক অত্যন্ত আন্তরিক

পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তখন এই গানই প্রশ্ন, আবার এই গানই তার উত্তর।

এরপরও একটা প্রশ্ন থাকে। লোকসঙ্গীতের চর্চা ও শিক্ষা বিষয়ে। প্রাথমিকভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বনিবনা এবং যোগাযোগের সূত্র ধরেই আদিতে লোকচর্চার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। এটা ছিল একরকম আবিষ্কারের মতো। ধর্ম এই লোকচর্চাকে আরো গভীর ও সুসংহত করে তোলে। আরো পরে যখন সাধনভজনের কারণে মানুষ নাড়া বাঁধলো, আখড়াই জীবনযাপনের অনুশীলনে মন দিল তখন শিক্ষাকে পুরোদস্তুর গুনপণায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজন হল গুরুশিষ্যের। আমরা খোঁজ পেলাম নানা দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষা গুরুর। খবর পেলাম নানান কঠোর সাধনার। এটা ঠিকই যে লোকসঙ্গীতকে আয়ত্ব করতে সত্যিই কঠোর সাধনার পথে যেতে হয়। এবং এই লোকশিক্ষা, লোকসঙ্গীতই বলছে, 'গুরুর গুরু মহাগুরু, তাহার গুরু কে?' আমার অভিজ্ঞতা বলে গুরু আসলে অবলম্বন মাত্র। মানুষকে তার অর্জনের জন্য শিক্ষার কারণে নানা অবলম্বন নিতে হয়। তার মানে এমনও নয় যে 'গুরুবিনা কি আর ভজিব'।

সাক্ষাৎকারে, কথাবার্তায় এরকম নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনো গুরুর দেখা পাইনি। কারুর কাছে শিখিওনি। সাধারণ মানুষের লোকশিক্ষা ও লোকসংস্কৃতির চর্চার ভিতর দিয়ে, মেলামেশার মধ্যে দিয়ে যতটুকু যা পেয়েছি। আমি তাই-ই পরিবেশন করি। আমার সহযোগী বাজনদাররাও এই গ্রামেরই মানুষ। অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন তাদের। তারা কেউ মাহুত ছিল, কেউ চাষাবাদ করে, কেউবা জন্মগত সূত্রেই চামড়ার বাদ্য বা দেশি ঢোলের কারবার করে। সমাজের নিম্নবর্গের এইসব মানুষের হাতে রাজবংশীদেরও জল চলে না। এদেরই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এককালীন দেশি গান আজ গোয়ালপড়িয়া লোক-সঙ্গীতের পরিচয় অর্জন করেছে।

ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় আমার তেমন মন ছিল না। বাবা বললেন, 'যাক, পড়াশুনা না করলেই বা ক্ষতি কি? ও আমার কাছেই থাকুক।' আমার বাবা ছিলেন গৌরীপুরের রাজবাহাদুর প্রভাত চন্দ্র বড়ুয়ার মধ্যম পুত্র। বড় ছেলে প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া তাঁর ফিলমের কাজে কোলকাতায়ই থাকতেন। আর বাবা চালাতেন এস্টেট। আমার বাবা প্রখ্যাত হাতি শিকারী প্রকৃতিশ বড়ুয়া তার জগৎ বিখ্যাত হাতি ধরা ক্যাম্পেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। বাবার সঙ্গেই বনে-জঙ্গলে আমি বহুদিন থেকেছি। নুড়ি-পাথর সংগ্রহ করা, পাহাড়ী অর্কিড সংগ্রহ করা, বকপাখি মারা, শিকার

করা আর গান সংগ্রহ করাই ছিল আমার জীবন। সঙ্গে ছিল বাবার শিক্ষা তাও যেন সেই লোকশিক্ষার মতোই আজও স্মৃতিতে কাজ করে যায়। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকার বাবা ছিলেন লালজী বা বাবা নামে খ্যাত। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর সন্ধ্যাবেলায় বাবা তাঁর হাতির মহল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। তামাক খাওয়া চলছে। কাঠকুটো জ্বালিয়ে আগুনের ব্যবস্থা হয়েছে। সওদাগরদের সাথে হাতি কেনাবেচার কথাবার্তায় ক্রমে মশগুল হয়ে উঠতেন বাবা। আমাকে বলতেন দূরে যেখানে মাহুতেরা ক্যাম্পের থেকে দূরে আগুন জ্বালিয়ে দোতারা নিয়ে টুং টাং করছে বা বহতা ঝর্ণার পাশে বসে কেউ একটা দেশি গান ধরেছে, সেখানে গিয়ে বসতে। বলতেন, 'ওদের গান শোন, গান কর। তবেই চর্চা হবে, গান শিখতে পারবি।'

এইভাবেই অনেকটা শুরু হয়ে যায়। ওদের আবেগ, ওদের শ্রম আর প্রেম বিরহের যে গান শুনেছি তা আজও আমাকে গান গাইতে অনুপ্রাণিত করে। প্রাচীন সেই লোকসুর সেই লোকছন্দ আমাদের বুঝিয়ে দেয় মানুষের কৃষ্টি, মানুষের সংগ্রাম, তার শ্রমশক্তির কথা। এই গানই আমি নানা অভিব্যক্তিতে নানা ভাষায় শুনেছি। শুধু কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারিকাই নয়। সারা পৃথিবীতেই এই লোক গানের একটি অভিন্ন কথা আছে। সেই কথা হলো মানুষের সংগ্রাম, তার ভালোবাসার কথা, সুস্থ্য জীবনবোধের কথা। বাবা বলতেন, 'তোদের গান আমি বুঝি না। ভাল লাগে তাই শুনি। আমি বুঝি ঝর্ণার শব্দ. ঝিঁঝিঁর ডাক, ঝরা পাতার খসখস, বাঘের ডাক, হাতির ডাক। এই সবই ভাল লাগে।' পরে মনে হয়েছে, ঠিকই তো এইসব শব্দ আর ধ্বনি থেকেই তো প্রাচীন সুর, ছন্দ, মাত্রা, লয়ের প্রকাশ ঘটেছে। এসব তো মহাসঙ্গীত।

ব্যক্তিগতভাবে বাবার প্রত্যক্ষ মদত থাকা সত্ত্বেও এই লোকসঙ্গীতকে জীবনযাপন ও জীবনধারণের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে যথেষ্ট লড়াই আমাকে করে আসতে হয়েছে। একজন নারী হিসাবে গৌরীপুর রাজবাড়ির প্রাচুর্য ও অনুশাসনের বিপরীতে খেটে খাওয়া মানুষের অর্থাৎ কিনা তথাকথিত ছোটলোকের গান গাইতে যথেষ্ট সামাজিক চাপের মধ্যে পড়তে হয়েছে। ফলে সম্পূর্ণ নতুন এক জীবনধারা আমায় বেছে নিতে হয়েছিল নিজের চেষ্টায় আর অগণিত শ্রোতাসাধারণের শুভেচ্ছায়।

একটা সময় ছিল যখন আসামে এই দেশি গান গাইতে গেলে অহমের মানুষ বলত 'এটো অহমিয়া ন হয়'। আবার বাংলার মানুষ বলত 'এতো আমাদের সংস্কৃতি নয়'। আজ অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। আজকে যেমন অহমের মানুষ বলে তেমন বাংলাদেশের মানুষও বলে গোয়ালপাড়িয়া

লোকসংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এখানে একটা কথা আছে। ভাওয়াইয়ার সাথে সরাসরি যুক্ত এই দেশি গানকে কেন গোয়ালপাড়িয়া গান বলছি। আমি গবেষক নই, বিশেষজ্ঞও নই। আমি গান গাই। যে গান বহু বছর ধরে এইখানকার মানুষ উৎসবে-অনুষ্ঠানে শ্রমের আনন্দে অবসর সময়ে গেয়ে আসছে। যে গান মানুষকে লোকশিক্ষায় শিক্ষিত করে। সেই গানকে কি নামে ডাকা হবে সেটা কি খুব বড়ো কথা? বইপত্তর আমি তেমন একটা পাড়িনি। তবে শুনেছি, কামতারাজ্যের মানুষ একসময় এই মিশ্রভাষায় কথা বলত। মিশ্র ভাষা বলতে মূলত গোয়ালপাড়িয়া ডাইলেকট হলেও এর সঙ্গে মিশে আছে কোচ ও রাজবংশীদের অভিব্যক্তি ভাষার ব্যবহার। যেমন পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিয়ের গান, নৌকা বাওয়ার গান, ধান কাটার গান, বিরহের গানের সাথে মাহুতের হাতিকে ধোয়াপাখলানোর গান যুক্ত হয়ে এই অঞ্চলের আবেগের সাথে—প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মিশে গেছে। ফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে নানা মানুষের আন্তরিক উৎসবে ও আনন্দে এই গান, এই সুর তৈরি করেছে এখানকারই লোক ইতিহাস।

এখানে ওখানে লোকজনের প্রশ্নের শেষ নেই। এমন প্রশ্নেরও মুখোমুখি হয়েছি, 'ভাওয়াইয়া ও আপনার গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতির পার্থক্য কি?' উত্তরে আমি প্রথম বলেছি গোয়ালপাড়িয়া আমার নয়। যারা আমাকে সাহায্য করছে, এই যে যারা বাজাচ্ছে, সঙ্গত করছে এই গান ওদের। ওখানকার মানুষের। আর দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে, পার্থক্য তো আছেই। ভাবের পার্থক্য। পার্থক্য ব্যঞ্জনার, পরিবেশনার। ভাষার ক্ষেত্রেও একটা ক্ষীণ পার্থক্য আছে। এই সমগ্র অঞ্চলের ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় দু-চার ফারলং অন্তর পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি আগেও বলেছি এখনো বলছি : এটা সম্পূর্ণতঃ ভাবের বৈসাদৃশ্য।

যে কোনো সঙ্গীতে ভাবই প্রধান অঙ্গ। কিভাবে গাইছে, কি ভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে, কিই-বা তার ভঙ্গিমা মানে এক্সপ্রেশন—ত্যর ওপরই নির্ভর করে সঙ্গীতের গুণাগুণ — রকমফের।

এরপরও জানিয়ে রাখি। আমার খুবই ভয় হয়। জানিনা লোকসঙ্গীত নিয়ে এতো কথা বলার অধিকার আমার আছে কিনা। পাছে কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি আমার ব্যাখ্যার কেতাবি ভুল দেখিয়ে নাস্তানাবুদ করে। তবু আমি সেইসব পণ্ডিত লোক বিশেষজ্ঞদের বলতে চাই এরকম টীকাটিপ্পনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে মেতে না থেকে বরং লিখুন না লোক-সঙ্গীতে কিভাবে অশিক্ষা ঢুকিয়ে, টাকা ঢুকিয়ে, বিদেশি যন্ত্র ঢুকিয়ে গ্রামের

মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আর কেনই-বা প্রকৃত লোকশিল্পী দুর্দশায়-অনাহারে তারই তৈরি করা শিল্পের সর্বনাশ দেখছে।

আমি লেখা-পড়া শিখিনি। ভাল লাগতো তাই গান গাইতাম। হয়তো পারতাম বলেই গাইতাম। কিন্তু কোনো কিছু লেখার জন্য যে সময় যে শিক্ষার প্রয়োজন হয় তা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। একজন সঙ্গীতজ্ঞ যুবক আমায় প্রশ্ন করেছিল আমি কোন স্কেলে গান গাই। প্রথমে আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়ে যাই। তারপর সামলে নিয়ে আমার সহযোগীদের জিজ্ঞেস করি। যুবকটি বুঝতে পারে। আমি বলি, এই স্কেল শব্দটাই আমার শহরের শিক্ষা। আর সব অশিক্ষা, বড়োই গ্রাম্য। এই গ্রামীণ ভাবধারার অশিক্ষাই কি তবে লোকশিক্ষা? □

অনুলিখন : ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

পটুয়া এবং সময়

চোদ্দই জুন (১৯৭০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পটুয়া-সংগীত সহ পটের ছবির যে-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল, তার জন্যে কর্মকর্তাদের প্রচুর মধুর সঙ্গে কিঞ্চিৎ হুলও প্রাপ্য। উদ্যোক্তাগণ প্রশংসাভাজন এইজন্যে যে নাগরিক সমাজের ঠিক নজরের সামনে পটুয়াদের কাজ জাঁকিয়ে হাজির করার দিক দিয়ে সাম্প্রতিক কালে এইটে নিশ্চয় এক মস্ত পদক্ষেপ। সত্যিই, এরকম অসাধারণ সাংস্কৃতিক ভোজ কলকাতায় কালেভদ্রে জোটে। কলকাতার সংস্কৃতির ঠিকাদারদের কল্যাণে এগজিবিশনে বা 'বিচিত্রানুষ্ঠানে' খাড়া-বড়ি-থোড় থোড়-বড়ি-খাড়ার বারমেসে ব্যঞ্জন খেতে-খেতে যখন আমাদের অরুচি ধরার জোগাড়, তখন জোরালো, স্পষ্ট ছাঁদের প্রায় ষাটখানা জ্বলজ্বলে পটের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো আর সেই সঙ্গে আমদাবাদ গ্রামের তিনজন পটুয়ার গান শুনতে পাওয়া—নিশ্চয়ই একটা উপাদেয় অভিজ্ঞতা ; এবং দুর্লভও। যত দূর জানি, কলকাতায় এরকম অনুষ্ঠান এর আগে আর একবারমাত্র হয়েছিল, তা-ও বহু বছর আগে, ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে। তার আয়োজন করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত মশাই। তিনি দাবি করে গেছেন, ভারতবর্ষে সেটাই 'গণ-শিল্প-প্রদর্শনী'র প্রথম অনুষ্ঠান।

পরিষদের এই প্রদর্শনীতে খুঁত ছিল বিস্তর। প্রথমতঃ, পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী একে বলা কঠিন। কারণ, চৌকো পট, বিশেষতঃ কালীঘাটের পট, ঠাঁই পায় নি এখানে। কর্মকর্তারা অবশ্য বলছেন, ওঁরা শুধুই জড়ানো পটের প্রদর্শনী করেছেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে : জাদুপট দেখানো হল কেন? জাদুপটের সঙ্গে তো সাধারণ জড়ানো পটের আকাশ-পাতাল তফাৎ। পট হিশেবে, আর ব্যবহারের দিক দিয়ে তো বটেই, সমাজতাত্ত্বিক স্তরের বিচারেও জাদুপটের সঙ্গে কোনও মিল নেই জড়ানো পটের। জাদুপটুয়ারা হল আদিবাসী বা উপজাতীয় শিল্পী। আর যারা জড়ানো পট লেখে (পটুয়াসমাজে 'পট আঁকা' নয়, 'পট লেখা' কথাটাই চালু), তাঁদের একাংশ আজ 'সামাজিক' শ্রেণীভুক্ত ; জাতিতে চিত্রকর। ছুতোর কামার তাঁতি কুমোর ইত্যাদি নয়টি কারুজীবী জাতির মধ্যে চিত্রকরদের স্থান। অর্থাৎ নীচের তলায় হলেও, বর্ণসমাজের কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি এরা পেয়েছে, যা জাদুপটুয়াদের কপালে জোটে নি। হয়তো, অনেকটা এরই দরুন, জড়ানো পটের থেকে জাদুপটের মেজাজটাই আলাদা হয়ে গেছে। জাদুপটে পড়েছে অনাত্মীয়ের নির্মোহ, ঈষৎ তির্যক দৃষ্টির ছাপ।

দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনীতে ছবি সাজায়, সেইভাবেই আধ-খোলা পটগুলোকে টাঙিয়েছিলেন কর্মকর্তারা। জড়ানো পট তো ফ্রেমে-বাঁধা ছবি নয়। তাই ওভাবে পট দেখালে, অনেক কিছুই দেখানো হয় না। তাছাড়া, পটুয়া-সংগীত শোনা গেল শুধু প্রথম দিন। পটুয়া ছবির সঙ্গে রোজ পটুয়া-গান শোনানোর ব্যবস্থা না-করলে (টেপ রেকর্ডে হোক, বা অন্যভাবে হোক) রীতিমত অঙ্গহানি ঘটে অনুষ্ঠানের।

তবে এসব খুঁতের জন্যেই কর্তৃপক্ষের নিন্দে করছি না। নিন্দে করছি, মান-বিভ্রমের জন্যে। উদ্বোধনের দিন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন একজন ধনী কাগজওয়ালা আর সভাপতির সিংহাসনে বসেছিলেন জনৈক আমলা, খুবই নৈকষ্য কুলীন। প্রধান অতিথি মশাই এক-গঙ্গা আবোলতাবোল অনেকক্ষণ ধরে বকে গেলেন আর মাঝে-মাঝে হেঁকে উঠতে লাগলেন : 'আমি পট সম্বন্ধে কিছু জানি নে। জানি নে বলেই এসব অবান্তর কথা বলছি।' কোনো সারস্বত প্রতিষ্ঠানে আকাট মূর্খতা এমন নিরেট দম্ভের সঙ্গে জাহির করা যায়, তা এর আগে কোথাও দেখি নি। আমদাবাদ গাঁ থেকে যে তিনজন পটুয়া সেদিন এসেছিলেন,— সেই তাঁদের কলকাতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়— কী ভাবছিলেন তাঁরা এই বোম্বাগড়ের রঙ্গ দেখে? হয়তো এ ওর দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় মনে ভাবছিলেন, 'ভাই, একেই কি মেলা কয়? বাবুদের মেলা?'

দর্শনধারী মহোদয়দের দোষ দিয়ে লাভ কী? কে ওঁদের আসন দিলে সুনীতি চাটুজ্জে মশাইয়ের পাশে? কে দিলে শিরোপা?

আমার অভিযোগ এই : ধনপতি আর আমলাদের সংস্কৃতির মাস্তান বানিয়ে কর্তৃপক্ষ সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসকেই প্রত্যাহত করে নিলেন। পরিষদের উঠতি কর্তারা সম্ভবতঃ ভুলে গেছেন, শোভাবাজার রাজবাড়ির আওতা থেকে বার করে এনে 'সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে' পরিষদের দপ্তর স্থাপন করার জন্যে কী প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল ১৩০৬ সালে। কারা ছিলেন সেই লড়াইয়ে প্রথম সারির নেতা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ এগারো জন মনীষী। একটা পবিত্র কিংবদন্তি আছে এ-নিয়ে। ১৩০৬ সালের ৪ ফাল্গুন, যেদিন পরিষদ-কার্যালয় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন নাকি লাইব্রেরির বই মাথায় করে বয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং!* চোদ্দই জুন দেখলুম, সেই ইতিহাসের উল্টো মুখে কেঁচে গণ্ডূষ গতি!

পটের ছবির পক্ষে দুটো দাবি পেশ করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত। প্রথমতঃ, পট

---

* এই কিংবদন্তি যে নিতান্তই অমূলক নয়, তার কিছু সমর্থন পাই রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ পত্রাবলিতে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪১ সালের ১৩ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন : 'পরিষৎকে রাজা বিনয়কৃষ্ণর বাড়ী হইতে সাধারণ স্থানে আনিবার নিমিত্ত আপনি সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহা আপনার মুখে শুনিয়াছি।'

হচ্ছে প্রাক্-বৌদ্ধ চিত্রকলার 'অবিরল-প্রবাহিত, অভ্রষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত' রূপ। দ্বিতীয়তঃ, 'জগতের চিত্রশিল্পের আসরে' বাঙলা দেশের পট নিঃসন্দেহে 'একটা শ্রেষ্ঠ আসন' পাবে। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের বলছেন কেন ? হয়তো এই কারণে যে কোনো-কোনো ভারততত্ত্ববিদ মনে করেন, আজীবিক সন্ন্যাসী গোসাল মংখলিপুত্ত পূর্বাশ্রমে ছিলেন পটুয়ার ছেলে। কথাটা তো ঠিকই, হালে ক্ষীণ হয়ে এলেও, পটের ছবির ধারাবাহিক ঐতিহ্যে কোনও দিনই ছেদ পড়ে নি। অনেক ছোটোখাটো ব্যাপারের মধ্যেও তার প্রমাণ আছে। যেমন কুমারস্বামী লিখেছেন, অজন্তার শিল্পীরা রঙ গুলতেন নারকোল-মালায়। পটুয়ারা নারকোলের মালাতেই রঙ গোলেন এখনও। পুরোনো সাহিত্যে সেকালের পটুয়াদের যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মিল আছে আজকের পটুয়াদেরও। উদাহরণ হিশেবে সপ্তম শতাব্দীর গদ্যকাব্য 'হর্ষচরিত' থেকে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> 'বিপণি-বীথিতে প্রবেশ করলেন হর্ষদেব। তাঁর চোখে পড়ল—যমপট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক যম-পটিক।
>
> তার ডান হাতে প্রকাণ্ড শর,
> আর বাম হাতে,— ভীষণ মহিষে-চড়া প্রেতনাথের এক চিত্তির-বিচিত্তির ছবি।
>
> নগরের পথের বালকেরা চীৎকার করছে— "কি হয়েছে, কি হয়েছে ?" দেখছে, আর ভীড় ক'রে সঙ্গে ছুটছে। যখন শ্রীহর্ষ তাঁর তুরঙ্গ-সৈন্য নিয়ে যমপটিককে পিছনে রেখে চ'লে গেলেন, তখন সে ছড়া আওড়াচ্ছে—
>
> "হাজার হাজার মা আছে, হাজার
> হাজার বাপ আছে ; ওরে,
> ছেলেও আছে ; ওরে, স্ত্রীও
> আছে। যুগের পর যুগ চ'লে
> যাচ্ছে, তুই কে, ওরা তোর কে ?" '
>
> 'হর্ষচরিত', প্রবোধেন্দু ঠাকুর -অনূদিত

এখনও প্রায় এইভাবেই ছবি দেখায় পটুয়ারা। আর যমরাজের ছবি ? তা-ও থাকে বীরভূমের পটের শেষ অংশে।

ঐতিহ্যের মূল্য ব্যবহারে। পটুয়াদের ঐতিহ্য যে কী দীপ্যমান চিত্রকলার জন্ম দিতে পারে, যামিনী রায়ের ছবিই তার অকাট্য প্রমাণ। ভবিষ্যতের কোনো শিল্পী যদি দেশজ ঐতিহ্যের জমির ওপর দাঁড়িয়ে নতুন চিত্রকলার সিংহদ্বার খুলতে চান, পটুয়াদের ছবি তাঁর হাতে চাবিকাঠির কাজ করবে।

শুধু ছবির রাজ্যেই কেন, শিল্পকলার আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রেও নতুন-নতুন প্রবর্তনা

জোগাতে পারে পটুয়াদের কাজ।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি করে মনে হয় সিনেমার কথা। সিনেমার সঙ্গে আংশিক মিল-ও আছে জড়ানো পটের। দীর্ঘ পটে পর-পর বিন্যস্ত ছবিগুলো খুলে-খুলে দেখানো হয় ক্রমশঃ। এতে থেকে-থেকে এক ধরণের গতির দোলা লাগে ছবিতে, ছবি হয়ে ওঠে চলচ্ছবি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে গানের-বাহনে-চড়া গল্প। আমার তো মনে হয়, জড়ানো পটের চলচ্চিত্রায়ণ সম্ভব! শুধু তা-ই নয়, জড়ানো পট থেকে নানান উপাদান নিয়ে রূপকল্পের পরীক্ষা করা যায় চলচ্চিত্রের জমিতে। ভাবতে অবাক লাগে চলচ্চিত্রের বাইরে থেকে, চৈনিক বা জাপানি চিত্রলিপি থেকে আইজেনস্টাইন মন্তাজ আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের পর সিনেমা পেল শিল্পের মহিমা, পালটে গেল তার ইতিহাস। আবার, মায়াকভস্কির কবিতার নানান মাপের ভাঙা-ভাঙা প্রবহমান লাইনেও সিনেমার ছন্দের প্রতিসাম্য পেয়েছিলেন আইজেনস্টাইন। পটুয়াও কাজে লাগান, অনেকটা মায়াকভস্কির রীতি, বা সিনেমার লং শট, ক্লোজ-আপ -এর মতন কৌশল। তাঁকেও ব্যবহার করতে হয় কাট্-এর রকম-ফের। পটুয়ারা যেভাবে গল্পের খেই টেনে যান, বা যেভাবে শুদ্ধ ডিজাইনের ঈষৎ চলন্ত আলপনা গেঁথে-গেঁথে নেন গান-গল্পের সুতো দিয়ে, তা বাস্তবিক লক্ষ করবার জিনিশ। আমাদের দেশ এখনও প্রতীক্ষায় রয়েছে কোনো অনাগত আইজেনস্টাইনের, যিনি জড়ানো পট থেকে যা-কিছু নেবার, তা ছেঁকে নিয়ে দুঃসাহসিক প্রয়োগে ফলবান করবেন চলচ্চিত্রের কলাবিধি। সিনেমার দেশজ শিল্পরূপ স্পষ্ট চেহারা পাবে সেদিন।

চীনের স্ক্রল বা জাপানি মাকিমোনো-ও জড়ানো ছবি। কিন্তু পটের মতন গানের সঙ্গে তার যোগ নেই। আসলে, গানেতে-ছবিতে মেশানো যৌগিক শিল্পরূপ হিশেবে জড়ানো পটের নিজস্ব মূল্যও অনেক। কারণ, ছবির আশ্রয় দেশ; আর গান কালে আশ্লিষ্ট; জড়ানো পট যুগপৎ এই দুই পৃথক মাত্রাকে ছুঁয়ে থাকে। এই বিশেষত্বকে রবীন্দ্রনাথের একটি বীজগর্ভ উক্তির পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারব বাঙলাদেশী পটের সম্ভাবনা: 'কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়।'

কালের মাত্রার সূত্রে মনে পড়ল, গুরুসদয় দত্ত তাঁর একটা ইংরেজি প্রবন্ধে লিখেছেন, সময়কে পটুয়ারা পরিহার করেছেন। হাইন্‌রিশ ৎসিমার তো বলেছেন, তামাম ভারত-শিল্পেই কালের মাত্রা বর্জিত। এ-সব কথা আমার কাছে গ্রাহ্য ঠেকে না। পটের ছবির প্রসঙ্গে তো নয়ই। তার একটা সোজা কারণ এই: পটের সঙ্গে গানের যোগ অচ্ছেদ্য; আর গান কালমাত্রিক। এ ছাড়া অন্য যুক্তিও আছে। টানা একটা গল্প বলে যায় পটুয়ার এই ছবি-আর-গান। গল্প এলেই, কাল আসে। পৃথিবীর সব গল্পই তো সারি-সারি 'তারপর'-এর অনুক্রম দিয়ে গাঁথা। অতএব পটুয়া মোটেই নিঃসময়ের কারবারি নয়; সময় নিয়েই তার কারবার। তবে আর্টের লজিকে ব্যবহারিক কালকে ভণ্ডুল করে

দিয়ে, নতুন রসায়নে সময়ের নবীন ছন্দ বানায় সে, পালটে দেয় কালের মাত্রা।

কথাটা স্পষ্ট করে বলি। দৃষ্টান্ত হিশেবে, পরিষদের প্রদর্শনীতে দেখানো মেদিনীপুর জেলার দুটো পটের উল্লেখ করা যেতে পারে। আঁকার রীতি দেখে মনে হয়, শিল্পীদের ঘরানা অভিন্ন। পটদুটোর থীমও এক : জটায়ু-রাবণের লড়াই। একটা পট সেকেলে ; অন্যটা হালের ; কিন্তু সময়কে ব্যবহার করার রেওয়াজটা একই রকম। আপাততঃ মনে হবে, কালের ঐক্য উপেক্ষা করেছেন শিল্পীরা। পুরোনো পটটিতে একই-বর্ডারে-ঘেরা জমিতে দেখানো হয়েছে : ১. জটায়ু রাবণের রথ গ্রাস করতে উদ্যত ২. পঞ্চবটী বনের শূন্য কুটিরে রাম-লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে, সীতা নেই ৩. আর তার পাশেই, জটায়ু রামকে সীতাহরণের খবর দিচ্ছে। আসলে, এই ঘটনা তিনটে তো ঘটেছিল ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ; পটে কিন্তু ওদের বাঁধা হল একই ছবির আবেষ্টনে, ঈষৎ-প্রসারিত একই কালের পর্দায়।

বীরেন চিত্রকরের আঁকা ঐ নতুন পটটিতে দেখি একই পদ্ধতি। তফাৎ শুধু এই : রামের সঙ্গে কথা বলার সময়ে জটায়ুর মুখটা অন্য দিকে ঘুরে গেছে।

আসলে কালের মাত্রার এই হেরফের ঘটানো চিরকেলে শিল্পীর স্বধর্ম। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারুতের ভাস্করও পাথরের গায়ে কুরঙ্গ-মৃগ জাতক উৎকীর্ণ করতে গিয়ে একইভাবে সময়কে ইলাস্টিকের ফিতের মতন খেলিয়েছিলেন। আবার খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সময়কে একইভাবে খেলিয়েছেন অমরাবতীর সেই শিল্পী যিনি পাথরফলকে খোদাই করেছেন গৌতম বুদ্ধের নালাগিরি-দমনের বৃত্তান্ত। খুবই চেনা গল্প। বুদ্ধকে পিষে মারার জন্যে দেবদত্ত এক মাতাল হাতি— নালাগিরিকে— লেলিয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ সেই খুনে হাতিকে বশ করেন অলৌকিক করুণায়। কালের সঞ্চরণকে এই ভাস্কর উৎকীর্ণ করেছেন নালাগিরির মূর্তিতে। দুই পৃথক ক্ষণকে কঁদে দেখাবার জন্যে ওই হাতিকে আনছেন দুবার। সময়ের এই দুই পৃথক ক্ষণের মধ্যে রয়ে গেছে রুদ্ধশ্বাস কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান : হাতির ঐ দুটো মূর্তির মধ্যবিন্দুতে যেন খোদাই হয়ে আছে একটি অনুচ্চার 'তারপর'। এই পাথরচিত্রকে, মনে মনে, ঠিক মাঝ বরাবর একটি ঋজু রেখায় দুখণ্ড করা যায়। যার এক পাশে দেখি : বুদ্ধকে সংহার করতে নালাগিরি ধাবমান ; এক উদ্দাম গতি, এক মথিত সময়, উত্তাল হয়ে উঠল এই মত্ত হাতির শরীরে। অন্য পাশে দেখছি : বুদ্ধের পায়ের তলায় শমিত, প্রণত নালাগিরি। তখন পালটে গেছে কালাঙ্ক, বদলে গেছে সময়ের চলন। বাঁ দিকে দেখছি, কালের রুদ্র রূপ ; ডান দিকে, তার শান্তকরুণ মূর্তি।

দুই

সময়কে পটুয়া খেলিয়েছে ঠিকই ; কিন্তু সে নিজে সময়ের হাতে মার খেয়েছে,

মর্মান্তিক মার। কমিউনিটি বা কৌম হিশেবে পটুয়ার আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। ওর বেঁচে বর্তে থাকার সমস্যা একালে হয়তো চরম দশায় পেঁচেছে; কিন্তু এই ধ্বংসের শুরু কি আজ? বিনয় ঘোষের হিশেব মতো 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে পটশিল্পের ক্ষয় শুরু হয়েছিল।' এভাবে ঠিক সন-তারিখ বলা শক্ত; তবে সন্দেহ নেই, ইংরেজ আমলে উপনিবেশের অর্থনীতি আর নতুন ভূমিব্যবস্থার আঘাতে গ্রামীণ কৌমের বিপর্যয় যখন শুরু হল, তখন থেকে পটুয়ারও এই ক্রমিক ধ্বংসের সূত্রপাত। গ্রামজীবনের যে-আবহমান কাঠামো পটুয়াকে একদা ধারণ করে রাখে, সেটাই ক্রমাগত ধসে যাচ্ছে। পালটে যাচ্ছে রুচি। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন চিত্রকর বিনয় ঘোষকে বলেছিলেন, 'আগে বারোমাসে তের পার্বণের সঙ্গে ছোটো বড়ো অসংখ্য গ্রাম্য মেলা হত সব জায়গায়। এইসব গ্রাম্য মেলাতে আমরা নানারকমের দেবদেবীর পট এঁকে, কাঠের পুতুল গড়ে বিক্রি করতাম। মেলাতে-মেলাতে ঘুরে পট দেখিয়ে, গান গেয়ে যা রোজগার হত তাতেও স্বচ্ছন্দে আমাদের চলে যেত। এখন অধিকাংশ মেলা উঠে গেছে, যা দুচারটে আছে তাতে রবার-প্লাস্টিকের পুতুল আর সস্তা ছাপা ছবির এত আমদানি হয় যে আমাদের কাঠের পুতুল বা আঁকা পটের দিকে কেউ ফিরেও চায় না' ('পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', ১৯৫৭, পৃ. ৭০০)। সেই রবার-প্লাস্টিকের পুতুল আর ছাপা ছবির পর, ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল সিনেমা, রেডিও; এসে পড়ল টিভি, ভিডিও। নব্য বিনোদনের বিস্ফোরণ! তাই মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামের শ্যামসুন্দর পটুয়া সম্প্রতি (২৪ জুন ১৯৯০) আনন্দবাজারের রিপোর্টারকে জানিয়েছেন, 'সিনেমা-টিভি-ভিডিওর বাজার এখন। পটে কি আর অতশত আনন্দ দেবার উপায় আছে?' পট লিখে আর পেট চলে না। তার ওপর আছে বাণিজ্যচণ্ডীর দাপট। পট এখন পণ্য। পট দেখানো নয়; পট বেচাই রোজগারের পথ। ক্রেতাও গ্রামের নয়; শহুরে মানুষ, বিদেশের মানুষ। তাই আজকাল পটুয়াদের 'মাসের মধ্যে চার-পাঁচবার দেখা যায় কলকাতা শহরে। হাতে পটভর্তি চটের ব্যাগ। বিভিন্ন অফিসে, বাড়িতে, পরিচিত জনের কাছে কয়েকটা পট বিক্রি করে সংসার খরচের টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে' যায় তারা। পরিস্থিতির এই বদলটুকু লক্ষ করে শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পোটোরা ব্যাগভর্তি পট নিয়ে শহরে আসছে এটা দশ বছর আগেও দেখা যায় নি। আমাদেরই গ্রামে গ্রামে ঘুরে পট দেখতে হয়েছে, পট সংগ্রহ করতে হয়েছে' ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৪ জুন ১৯৯০)।

পটুয়াদের নিয়ে প্রথম নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন বিনয় ভট্টাচার্য। তাঁরও বইয়ে ('কালচরাল অসিলেশন', ১৯৮০) ফুটে উঠেছে এই ক্রমিক ধ্বংসের ছবি। আয়তনের দিক দিয়ে এখন পটুয়া-কৌম বড়ো নয়, বরং ছোটোই। তাঁর আদমশুমার অনুযায়ী, বীরভূম জেলায় পটুয়াদের মোট সংখ্যা ১১৬৮; ৩৯টি গ্রামে ২৪৮ ঘর পটুয়ার বাস। সারা পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াদের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ৫০০০। বীরভূমে তিন পুরুষের হিশেব নিয়ে

তিনি দেখেছেন : পটুয়ারা ক্রমাগত 'স্ববৃত্তি' ছেড়ে দিচ্ছে। ঠাকুরদার প্রজন্মে ৭২·৫১% পট লিখত ; বাপের প্রজন্মে ৬৮·৯১%। আর বর্তমান প্রজন্মের মাত্র ৫১ ৫৯% নিজের বৃত্তি আঁকড়ে রয়েছে। এই পরিসংখ্যান বিনয় ভট্টাচার্য ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে সংগ্রহ করেন।

পটুয়া-কোম আজ ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখি : সমসময় যে-মানুষ গোষ্ঠীর নামে মৃত্যুপরোয়ানা পাঠিয়ে দিল, তারও কিছু দায়ভাগ অক্ষয় হয়ে থাকে মহাসময়ের ধারায়। সময়ের সঙ্গে এক-একটি কোম-সংস্কৃতির সংঘর্ষের হয়তো এও একটা ধরণ ; অথবা পরিণাম।

তাহলে, প্রশ্ন ওঠে : পটুয়ার জীবনধারা, শিল্পধারা থেকে এই সময়ে বা ভবিষ্যতে কী নিতে পারে বাঙালির অন্য সংস্কৃতি ?

বিনয় ভট্টাচার্য দেখাচ্ছেন : পটুয়ার জীবনধারা পেণ্ডুলামের মতন দুলছে বড়ো বড়ো দুই প্রতিবেশী সংস্কৃতির দুই মেরুবিন্দুকে ছুঁয়ে— হিন্দুর আর মুসলমানের। বড়ো বড়ো কালপর্ব জুড়ে দুই ভিন্ন মেরুর দিকে এই ক্রমান্বয় দোলন তো আছেই ; প্রতিদিনের জীবনধারাতেও রয়েছে এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েন। একদা বীরভূমের পানুরিয়া গ্রামের এক পটুয়া, ছবিলাল চিত্রকর, নিজেই যেমন বলেছিলেন গুরুসদয় দত্তকে : পটুয়ার 'রীত' মুসলমানের ; 'কর্ম' হিন্দুর। সে নমাজ পড়ে ; অথচ পট লেখে পুরাণের। ওর বিয়েশাদিতে কাজি আসে ; অথচ বিশ্বকর্মা পুজো করতে তার বাধে না। প্রত্যেক পটুয়ার দুটো নাম : একটা হিন্দু, অন্যটা মুসলমানি। যেমন : যার এক নাম সুদর্শন, তারই অন্য নাম সুকুরুদ্দিন। যে সুকুমার, সে-ই সুকুর। অথচ এই দুই বড়ো সংস্কৃতিতেই তার আগন্তুক-অস্তিত্ব। সে না-হিন্দু, না-মুসলমান।

অন্যভাবে বলা যায়, সে হল প্রান্তিক মানুষ। সমাজবিজ্ঞানে 'প্রান্তিক মানুষ' বলি তাকে, যে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির বাসিন্দা। সেই সময়ে এই প্রান্তিক মানুষের উদ্ভব ঘটে, যখন দুই আলাদা সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব আর মিশ্রণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতিহাসে বার বার দেখতে পাই : এই প্রান্তিক মানুষের নেই গোঁড়ামির অন্ধতা ; তার মনের দিগন্ত আরও মুক্ত।

হিন্দু-মুসলমান কোমের যে-বিকারকে আজ আমরা 'সাম্প্রদায়িকতা' বলি, বৈরিতার সেই দম-আটকানো পরিস্থিতিতে, পটুয়াদের ওই ছোটো কোমের জীবনধারা হয়তো একটা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেখিয়ে দেয়। এদিক দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে তার ভূমিকা অংশতঃ কবির বা লালনের সঙ্গে তুলনীয়।

পটুয়ার বাঁচার ধরণে আরেকটা ব্যাপার আছে, যা গণ্ডিবাঁধা নয় ; খোলামেলা। ভাত-কাপড় জোগাড়ের জন্যে কোনও একটা বিশেষ বৃত্তিতে সে বন্ধ থাকে না। আগেই তো বলেছি, পটলেখার মতন জাতিগত বৃত্তি বরং আজ পড়তির দিকে। এখন যা বলতে

চাচ্ছি তা হল : জীবিকার বহুতর ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ। যেমন : বীরভূমের বোনতা গ্রামের দ্বিজপদ চিত্রকর। তিনি পটও লেখেন, গোবৈদ্যাগিরিও করেন, আবার তুকতাকও করেন। আসলে পটুয়া স্বভাবেও যাযাবর, বৃত্তিতেও যাযাবর। মূর্তিগড়া, চাষবাস, সাপুড়েগিরি, ওঝাগিরি, চাটাইবোনা, সানাবাঁধা, টোটকা-চিকিৎসা, মনিহারি সম্ভারের ফিরিওয়ালার কাজ—এইরকম বিচিত্র বৃত্তিতে তার আনাগোনা। বীরভূমে দক্ষ রাজমিস্ত্রি হিশেবে—চুনকাম, ডিসটেম্পারিঙের মিস্ত্রি হিশেবে— পটুয়ার খুব নামডাক।

শ্রমবিভাগ নামক ব্যবস্থাটায় দাসত্ব আর একঘেয়েমি আছে বৈকি। এতে কাজ থেকে কাজের আনন্দ হারিয়ে যায়; বিচ্ছেদ তৈরি হয় শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমজের। শ্রমিক যেন আর মানুষ থাকে না; সে হয়ে ওঠে কলুর বলদ, মেশিনের গোলাম। শ্রমবিভাগের কল্যাণে আজকের সমাজব্যবস্থায় মেশিন পেয়ে যাচ্ছে শ্রমিক-নিরপেক্ষ এক স্বাধীন অস্তিত্ব; বরং শ্রমিকই হয়ে পড়ছে ঐ মেশিনের শুধু এক সজীব অংশ। অটোম্যাটিক ফ্যাকটরির যে-মজুর এই শ্রমবিভাগের শিকার, তার দশার বিবরণ দিতে গিয়ে 'ডাস কাপিটাল'-এ কার্ল মার্ক্স স্মরণ করেছেন গ্রীক পুরাণের সেই সিসিফুস-এর উপাখ্যান। অন্তহীন একঘেয়ে খাটুনির এই-যে দুর্বিষহ রুটিন, যেখানে একই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবিরত পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকে, সেটা সিসিফুসের অভিশপ্ত শ্রমের মতন। শ্রমের বোঝা ভারি পাথর হয়ে অবিরাম ঘুরে এসে পড়ে খিন্ন, জীর্ণ শ্রমিকের ঘাড়ে। শ্রমবিভাগের আরেকটা মারাত্মক দিক হচ্ছে : এই ব্যবস্থাতন্ত্র মানুষের আত্মপরিচয়কে টুকরো-টুকরো করে দেয়। মানুষের জীবিকাগত পরিচয়, যা তার আংশিক পরিচয় মাত্র, সেটাই গ্রাস করে তার পূর্ণ পরিচয়কে। শ্রমবিভাগের ঘূর্ণমান চক্রের ঘায়ে টুকরো-হয়ে-যাওয়া মানুষের এই-যে জগৎ, তারই একটা নিখুঁত ছাঁচ উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে। সেখানে মানুষ নেই : কেউ খোদাইকর কেউ অধ্যাপক, কেউ বা সর্দার। মানুষকে সেখানে শনাক্ত করা হয় সংখ্যা দিয়ে : কেউ সাতচল্লিশ ফ; কেউ হয়তো উনসত্তর ঙ। পটুয়ার জীবনধারা শ্রমবিভাগের এই রুদ্ধ ইস্পাত-খুপরি থেকে মুক্ত। সে একাধারে পট-লিখিয়ে— রাজমিস্ত্রি আর চাষী তো হতেই পারে। আমাদের এই যক্ষপুরীর জগতে সে যেন বিশুপাগলের প্রতিরূপ; যে একই সঙ্গে খোদাইকর ভাবুক আর গায়ক। ওই বিশুপাগলকেই নাটকের যক্ষপুরীতে নন্দিনী বলেছিল :

'তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।'

তিন

এবার প্রশ্নটির অন্য দিকটা নিয়ে আলোচনা করি : পটুয়ার শিল্পধারা থেকে এই সময়ে বা ভবিষ্যতে কী নিতে পারে আমাদের অন্য সংস্কৃতি ?

পটুয়ার শিল্পরীতি সম্পর্কে যামিনী রায় একবার খুবই দৃষ্টিমান মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, পটুয়ার ছবি যদিও ছবির আদিম ধারারই নিদর্শন, তবু অন্যান্য আদিম শিল্পধারার থেকে এক জায়গায় তার মস্ত তফাৎ। অন্য দেশের আদিম চিত্রকর নাচের ছন্দ এঁকেছে, মানুষ এঁকেছে, হরিণ এঁকেছে। কিন্তু এঁকেছে খাপছাড়াভাবে ; সব মিলে একটা জগৎ নয় এবং কোনও পুরাণে তার বিশ্বাস নেই। অন্য পক্ষে, বাঙলার প্রাচীন পটুয়া এমন একটা জগতের খোঁজ পায়, যা আগাগোড়া সামান্য লক্ষণের জগৎ, এবং একটি সংহত পুরাণের ওপর যার স্থিতি। সেখানে যে-জটায়ু সে তো মর্ত্যলোকের কোনও বিশেষ পাখি নয়, অথচ পাখির সামান্য লক্ষণ তার মধ্যে রয়েছে। পটের যে-হনুমান, সে তো জন্তু জগতের হনুমান নয়, অথচ তাকে হনুমান বলে চিনতেও ভুল হয় না। আর এই জটায়ু, এই হনুমান, এই রাবণরাক্ষস— এই সমস্তের মধ্যে আছে : একটি পুরাণের সংহতি। অর্থাৎ এক সংহত পুরাণ এল পটুয়ার অধিকারে, তার অস্তিত্বের শিকড়ে। সেকালের সেরা পটে জ্বলজ্বল করছে এই বিশ্বাস। এই সূত্রে যামিনী রায় বলেছিলেন, শিল্পের পক্ষে এই জাতের এক পৌরাণিক জগতে বিশ্বাস করবার অনিবার্য প্রয়োজন বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা অনেকে ভুল করে ভাবি, পুরাণ বুঝি-বা এক নিঃসময়ের দেশ। আসলে পুরাণেও কাল আছে ; তবে সেটা পশ্চিমী অর্থে ইতিহাসের কাল নয়। পুরাণে নিহিত আছে সময়ের অন্য চলন, অনেক বড়ো ছাঁদ— এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়ানো আর্কিটাইপ্যাল ইমেজ, প্রত্নপ্রতিমা (মহাকালী, শিব ইত্যাদি) ; যা উঠে আসে এক-একটি কৌম-মনের গূঢ়তম পাতালস্তর থেকে। সময়ের এই বিশাল ছাঁদ, এই প্রত্নপ্রতিমা পটুয়ার ছবি-আর-গানের অন্তর্বিষয়। সমাজের নীচের তলার এই আদিম শিল্পধারা থেকে তার ওই অন্তর্বিষয় কীভাবে উঁচুতলার সংস্কৃতিতে চারিয়ে যায়, তা বুঝে নেবার জন্যে একটি পটুয়া-গান আর তারাশংকরের একটি ছোটোগল্পকে এখন পাশাপাশি রাখব।

যে-পটুয়া গানটি বেছে নিচ্ছি তার নাম 'চাষপালা' আর তারাশংকরের গল্পটির নাম 'পৌষ-লক্ষ্মী' ('যুগান্তর', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫১)।

গুরুসদয় দত্ত -সংকলিত 'পটুয়া সঙ্গীত'-এর ১০২-১০৭ পৃষ্ঠায় গানটি পাওয়া যাবে। তারাশংকরের দেশ লাভপুর ; সেই থানারই অন্তর্গত দাঁড়কা গ্রামের গুণমণি চিত্রকরের কাছ থেকে এই পটুয়া গানটি পেয়েছিলেন গুরুসদয়। 'চাষপালা'র বিষয় : শিবের চাষ। শিবমঙ্গল বা শিবায়নেও লৌকিক পুরাণের এই গল্পটি পাই। চাষী সমাজে গাজনের সময় এই শিবের গীত গাওয়ার রেওয়াজ আছে। হর-গৌরীর মহিমাকীর্তন 'চাষপালা'র লক্ষ্য হলেও এ পুরাণের কৃষিকাজ-ঘটিত কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক কিন্তু ভীম। সে এই লোকপুরাণে দুর্ধর্ষ আদিম চাষীর প্রত্নপ্রতিমা।

পটুয়ার ভুবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তারাশংকরের। আর চাষপালার এই লোকপুরাণটি যে তিনি বিলক্ষণ জানতেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়ে যাচ্ছি ওঁর সাংবাদিক রচনায়। দৈনিক 'যুগান্তর'-এ 'গ্রামের চিঠি' নামে একটি নিয়মিত কলম

লিখতেন তিনি। ১৯৬৮ সালের ১৫ এপ্রিলের 'গ্রামের চিঠি'-তে উনি শিবের ভিখারি থেকে চাষীতে রূপান্তরের গল্পটি বলেন। সে প্রসঙ্গে লোকপুরাণের ওই কৃষক-ভীমের কথাও লেখেন তিনি।

গুরুসদয়ের 'পটুয়া সঙ্গীত' এখন দুষ্প্রাপ্য। বইখানি ছেপেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্তু ওঁদের লাইব্রেরি থেকেও এখন বইখানি বেবাক উধাও হয়ে গেছে! এই কারণে 'চাষপালা'র গল্পটি একটু ছড়িয়ে বলছি।

একদিন শিব দুর্গাকে বলল :

'দেহতে সুখ নাই গৌরী ভিক্ষাতে না যাব
তোমা হতে অন্ন আজ ঘরে বসে খাব।'

দুর্গা তো পড়ল আকাশ থেকে! পয়লা পাতে দেব কী? ঘরে যে একমুঠোও চাল নেই! ক্রুদ্ধ শিব তখন জানতে চায় :

'কাল ভিক্ষা করিলাম দুর্গা কুচনি নগরে
কি বুঝে বল গৌরী অন্ন নাইকো ঘরে।'

দুর্গা জবাব দেয় :

'হাতে খড়ি নাও না ঠাকুর নাও না কেন লেখা
উচিত কথা বলতে গেলে মুখ করো না বেঁকা।'

তুমি তো কাল ভিক্ষা করে এনেছিলে ছ পশুরি চাল। ধন-কুবিরের [কুবের] কাছে দেনা ছিল বহুকালের। পাঁচ পশুরি দিয়ে তার লেঠা চুকালাম। ভাত রাঁধলাম পশুরিখানেক চাল দিয়ে। তোমরা তিন বাপবেটায় তো সে ভাত খেলে; তোমাদের পাতে সব ভাতটুকু বেড়ে দিয়ে আমি রইলাম উপোসি।

শিব বলে, চালের হিশেবনিকেশ তো পেলাম। কিন্তু কালকের ভিক্ষের ধান কোথায় গেল?

দুর্গা জবাব দেয়, গোঁসাই, তিন পো ধান তো সবশুদ্ধু এনেছিলে তুমি। পোখানেকের চিঁড়ে-সন্দেশ খেয়েছে তোমার ছেলে। পোখানেকের ধান দিয়ে তোমার সিদ্ধির চাট, নকুল ভাজা, হল। বাকি পোখানেক ধান মেঝেতে পড়ে যায়। তা দিয়ে কার্তিক গণেশের দুই বাহন— ময়ূর আর ইঁদুর— জলপান করেছে।

শিব জানতে চায়, কাল যে ভিক্ষায় বড়ি পেয়েছিলাম সেটা কোথায় গেল?

দুর্গা বলে :

'হেই গো মাতা হেই গো পিতা এই কি নাজের কথা
ইন্দুরে খেয়েছে বড়ি কতই দেবো লেখা।'

ওই কথা শুনে খ্যাপা শিব ইঁদুর মারতে যায়। ইঁদুর তখন লুটিয়ে লুটিয়ে শিবের পা ধরে। আর দুর্গা বলে :

'…মেরো না মেরো না ইন্দুর গণেশের ঘোড়া

যার ঘরে ইন্দুর নাই সে যে লক্ষ্মীছাড়া ।'

তারপর, কাঁখে কার্তিককে নিয়ে আর লম্বোদরের হাত ধরে দুর্গা চালের খোঁজে গেল ধন-কুবিরের ঘর। কুবির ধুরন্ধর মহাজন ! সে খাতককে ল্যাজে খেলায়। দুর্গাকে দূর থেকে দেখেই সে একমুঠো ধান উঠানে ছড়িয়ে দিয়ে আটকাঠি দিয়ে এক-এক কণা ধান কুড়াতে শুরু করে। তারপর দুর্গাকে ডেকে হাঁক দিয়ে বলে, কোথায় যাও, দুর্গা ? এসো দেখি। কথা কও।

দুর্গা বলে, আজ শিব ভিক্ষায় যায় নি। পশুরিখানেক চাল দাও তুমি, তাহলে উপোস রক্ষা হয়।

কুবির চাল না দিয়ে কথা শোনায় :

'লেবার সময় লাও দুর্গা খাবার সময় খাও
শুধবার বেলা হলে কুন্দলী পাকাও ।'

ক্ষুব্ধ দুর্গা কৈলাসে ফিরে যায়। শিবকে মিনতি করে :

'…ভিক্ষার মায়া ছাড় ঠাকুর চাষে দাও গো মন
চাষ যে দুর্ল্লভ জিনিস এ তিন ভুবন।
ভুঁইএ লাগাও মুগ-মুশুরী পগারে লাগাও কলা
নৈবেদ্য বাড়াবে ঠাকুর ধর্ম্ম-সেবার বেলা।…
চাষ·· কর মহাদেব সুখে অন্ন খাবে
বড় বড় মণিলাগ দুয়ারে বসে পাবে।'

শিব চাষে নারাজ। সে নানান ওজর তোলে :

'কোথা পাব হাল জোয়ান লাঙ্গলের ইসে
চাষের সামগ্রী লইলে চাষ করিব কিসে।
চাষ চাষ করে দুর্গা না কর জঞ্জাল
কোথায় পাব হাল বলদ কোথায় পাব ফাল।'

নাছোড়বান্দা গৌরী উত্তর দেয় :

'হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গ ঠাকুর গড়াও কোদাল-ফাল
আমার বাঘ তোমার বসোয়া মর্ত্ত্যে জোড় হাল।

শিব শেষ ওজর দেখায় :

'…হাল যদি জুড়ব দুর্গা বীচন পাব কতি ?'

দুর্গা তখন বীচন আনার জন্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পাঠায় ভীমকে। লক্ষ্মীর কাছে হাজির হয়ে ভীম আর্জি জানায় :

'চাষ-কর্ষণ করবে তোমার ভোলা মহেশ্বর
বীচনের কারণে পাঠাইলে তোমারি নগর।

লক্ষ্মী বলে, অন্য লোককে ধার দিলে সে তো সুদ শুদ্ধ ফেরত পাই আমি। কিন্তু

মহেশ্বরকে ধান দিলে মূলে চুলে যায়। ভীম, তুই যদি বীচন নিবি, তাহলে জামিন ঠাওর কর।
সমস্ত পৃথিবী তন্ন তন্ন খুঁজে ভীম কোনও জামিন না পেয়ে, শেষ অবধি চন্দ্র সূর্য দুই ভাইকে ডেকে আনে।
লক্ষ্মী বলে, চন্দ্র সূর্য দুই ভাই তোমরা সাক্ষী থেকো। আমি শামুকখানেক বীচন ভীমকে দিচ্ছি। খেতে ধান হলে, ভীম দু শামুক ধান আমায় দিয়ে যাবে। আর, ভীম, তুমি যদি বীচন নেবে, তাহলে আমার এখানে ভাত খেয়ে যেয়ো।
পেটুক ভীম তো মহাখুশি!

'ওই কথা শুনে ভীম কুদিয়ে বসিল।
নখের টঙ্কারে ভাঙ্গে লোহার পঞ্চবেল
সইসে নিচুড়ে সেদিন গায়ে মাথে তেল।
বাহান্ন পৌটি চাল খেতে বাহান্ন পৌটি ডাল
শত হাঁড়া ঘৃত দিলে নব মণ চাল।'

ভীম গদা দিয়ে উনুন বানায়। মাড় গালে হাঁড়ার কানা ধরে। ষোল ক্রোশ জুড়ে কলার আঙ্গোট পেতে তার ওপর বাড়ে 'পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন'। গরম ভাতে ঘি আর নুন ছিটিয়ে আড়াই গ্রাসে ভীম সবটুকু খায়। আর চুষে চুষে খায় চৌষট্টি পণ আম। লক্ষ্মী এসে শুধায়, বাবা, ভাতে তোমার কুলিয়েছে তো? ভীম বলে, মা, পেট পুরো ভরে নি; মাত্র সিকিভাগ ভরেছে!
ভীম বীচন বেঁধে ফিরে যায় কৈলাসে। বাঘ আর বলদের কাঁধে হাল জুড়ে চাষ শুরু করে ভীম। 'চাষপালা' শেষ হয় এইভাবে:

'এক চাষ দু' চাষ ভীম তিন চাষ করিল
তিন চাষ করে সেদিন বীচন ছড়াইল।
জয় হরি শ্রীহরি বলে মই জুড়ে দিল
পূর্ব্বেতে জুড়িয়া মই পশ্চিমে তুলিল।'…

তারাশংকরের 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পটির শিখরে আছে মাঠ থেকে খামারে ধান তুলে আনার সময়ে এক সদ্‌গোপ চাষী— মুকুন্দ পাল-এর— মৃত্যু। মুকুন্দ রাঢ়ের সাবেক কালের সেরা চাষীর টাইপ। এই পরাক্রান্ত চাষীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তারাশংকর যা ফুটিয়ে তুলছেন সেটা তাঁর গল্প-উপন্যাসের মূল থীম: গ্রামসমাজের ভাঙন। এই বিষয়টির সঙ্গে তারাশংকর একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে ফলন্ত ঋতুতে।
'পৌষ-লক্ষ্মী'র পটভূমিতে কালো ছায়ার মতন থমথম করছে পঞ্চাশের মন্বন্তর আর তৎকালীন ম্যালেরিয়া মহামারী। ইতিহাসের বা ক্যালেন্ডারের যে-কালে গল্পটি বাঁধা, সেইটে খুবই নির্দিষ্ট: বাঙলা সন ১৩৫০-এর পৌষ মাস। হয়তো বা প্রকৃতির আর ইতিহাসের পরিহাস! মন্বন্তরের ঠিক পরে, সেই পৌষেই, ধানের অঢেল ফলন হয়

রাঢ় অঞ্চলে। মন্বন্তর-মহামারী আর 'মাঠ-থইথই-করা ধান', শবযাত্রার হরিবোল আর পৌষ-লক্ষ্মীর আবাহন— এই দুই কালো আর শাদা সুতোয় গল্পটিকে বুনেছেন তারাশংকর।

ওপর-ওপর দেখলে মনে হয়, কী-ই বা মিল? 'চাষপালা' আর 'পৌষ-লক্ষ্মী' তো একেবারেই আলাদা গল্প : প্রথমটি বীজ-বোনার গল্প, পরেরটি ফসল-তোলার। কিন্তু তলিয়ে দেখলে. ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, গভীর স্তরে, কত-যে সমান্তরতা আছে এই দুই গল্পে।

স্বভাবতঃই 'চাষপালা'য় লোকপুরাণের ওই গল্পটিকে বলা হচ্ছে গোটা কৌমের দৃষ্টিবিন্দু থেকে। 'পৌষ-লক্ষ্মী'-তে পাচ্ছি দৃষ্টিবলয়ের তিনটি সম্পৃক্ত স্তর। একটি স্তরে, ঘটনার স্রোতকে দেখা হচ্ছে গল্পের প্রোটাগনিস্ট মুকুন্দ পালের চোখ দিয়ে। আরেক স্তরে, সেটা দেখছে লেখকের চোখ। আর, গল্পের সবচেয়ে গূঢ় স্তরে এসে যুক্ত হচ্ছে ছোটোগল্পের পক্ষে নতুন এক দৃষ্টিবিন্দু : সমগ্র কৌমের দৃষ্টিবিন্দু,— পটুয়া-গানের মতন। যে-কারণে মুকুন্দ পালের মৃত্যুতে গল্প থামে না; তারপরেও আরও খানিক দূর এগোয় এইভাবে :

'সংক্রান্তির শেষ-রাত্রে পালের বাড়িতে পৌষ আগলাতে উঠে সরস্বতী, লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ পুজোর ছড়া বললে। শাঁখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে বসেছিল ঘরে চুপ করে। রমণ মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার—। সে দড়াম করে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলে।'

এই শেষ অংশে তো বটেই, গোটা গল্প জুড়ে এক কৃষক প্রজন্মের মৃত্যুকে দেখছে কৌমের সহস্র চোখ। গল্পের স্রোতে নিঃসৃত শব্দগুলির আবর্তের মধ্যে থেকে শুনতে পাওয়া যায় সমস্ত গ্রামসমাজের দীর্ঘশ্বাস।

এমনকি ভাষাগত স্তরেও, 'পৌষ-লক্ষ্মী'র জায়গায় জায়গায় 'চাষপালা'র অনুরণন শোনা যায়। 'চাষপালা'য় পাচ্ছি, লক্ষ্মী ভীমকে খেতে দিল :

'বাহান্ন পৌটি চাল খেতে বাহান্ন পৌটি ডাল'

আর. তারাশংকর বাগদি-কাহার-মুচি ইত্যাদি গ্রাম্য দিনমজুরের প্রসঙ্গে লিখছেন, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময়, বিশেষ করে অজন্মার বছরে, দল বেঁধে গাঁ ছেড়ে চলে যায়। আবার তারা দল বেঁধে ফেরে :

'এমনই ধারা বাহান্ন পউটির বছরে, ধানে ধানে ছয়লাপের পোষে।'

এই 'বাহান্ন পউটি' উঠে আসছে 'চাষপালা'র জগৎ থেকে। সিউড়ির শিবরতন মিত্রের সাহায্য নিয়ে গুরুসদয় 'পৌটি'র মানে লিখেছেন : '১৬ বিশ পরিমাণ'। হরিচরণ-এর অভিধান অনুযায়ী : এক শো ষাট মনে এক পউটি। তবে, তারাশংকর এখানে 'পউটি'র অর্থবিস্তার ঘটাচ্ছেন। তাঁর প্রয়োগে শব্দটি নিরূপিত পরিমাপ বোঝাচ্ছে

না ; ব্যঞ্জনা দিচ্ছে অপরিমিত প্রাচুর্যের।

কাঠামোর স্তরে এই দুই গল্পের মিল আছে নানান দিকে। যেমন : লক্ষ্মীর একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে দুটো আখ্যানেই। 'চাষপালা'য় ভীমকে বীচনও জোগায়, ভাতও দেয় লক্ষ্মী। আর তারাশংকরের আখ্যানে তো পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে পৌষলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। পৌষলক্ষ্মীর ব্রতপার্বণ আর পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান রাঢ়ভূমির কৌম-সংস্কৃতির মস্ত বড়ো বৈশিষ্ট্য। সেই ব্রতকথা আর অনুষ্ঠানের দীর্ঘস্মৃতিময় অজস্র অনুষঙ্গ দিয়ে গল্পটিকে পরতে পরতে ভরে দিয়েছেন তারাশংকর।

মহাজনের চরিত্র, দুটো গল্পেই প্রবলভাবে উপস্থিত। 'চাষপালা'য় ধন-কুবির হচ্ছে দেবলোকের মহাজন। দয়ামায়ার বালাই নেই তার মনে। অন্নপ্রার্থী অন্নপূর্ণাকে হেনস্থা করার ফিকিরে উঠানে ধান ছড়িয়ে সেই ধান সে আবার একটা-একটা করে আটকাঠি দিয়ে তুলতে থাকে। কায়দাটা সুকুমার রায়ের সেই খুড়োর কলের পৌরাণিক সংস্করণ ! চাল তো দেয়ই না ; উলটে দুর্গার মর্মমূলে বিষাক্ত কথার হুল ফোটায়। 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পের লৌকিক জগতে এই ধন-কুবিরের প্রতিরূপ হল : শ্রীকৃষ্ণ পাল, ওরফে চেকা। সে 'এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী'। মহাজন তো বটেই। ' "মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু" বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই-করা খত আছে ওর ঘরে।' চেকা আসলে রায়ত-খাদক রায়ত : মন্বন্তরের দুঃসময়ে অভাবী চাষীর জমি সে গ্রাস করে নেয়। কুবিরের মতো তার কথাও 'তপ্ত লোহার শলার' মতো। সে-ও বারবার হেনস্থা করে মুকুন্দকে, সম্পূর্ণ অনর্থক। 'পৌষ-লক্ষ্মী'তে এই শ্রীকৃষ্ণ পালই মুকুন্দের প্রতিপক্ষ। আখ্যানের ছন্দ টানটান হয়ে ওঠে এই দুজনের সংঘাতে। প্রসঙ্গতঃ বলি— চাষীমহাজন থেকে ধাপে ধাপে জোতদার হয়ে-ওঠা বাস্তবের যে-মানুষটি 'গণদেবতা'য় ছিরু পালের আদিরূপ, তারও প্রকৃত নাম : শ্রীকৃষ্ণ পাল। 'পৌষ-লক্ষ্মী'তে আরেক অবয়ব নিয়ে সেই চরিত্রটিই ফের ঘুরে যায় তার পৈতৃক নাম সমেত !

যে-সমান্তরতা সবচেয়ে তীক্ষ্ম রেখায় আঁকা তা ভীমের সঙ্গে মুকুন্দর। তারাশংকর অনেক অনুপুঙ্খ দিয়ে এই প্রতিসাম্য তৈরি করেছেন তিলে তিলে। মুকুন্দ যেন সত্যিই লোকপুরাণের দেশ থেকে নেমে-আসা ভীম, সেই আদি চাষী :

'পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে ; এ হাতের গ্রাসে, লোকে বলে, একপো চালের ভাত উঠে।...তার হাতখানা প্রকাণ্ড। এই হাতের এক মুঠোয় সে খপখপ করে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতের কাস্তের এক টানে কেটে চলত ঘাস-কাটার মত ; তার এই মুঠোর তিন মুঠো ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুণ না হোক, দেড়া মোটা হত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে, রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়খড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত।'

'ওরে বাসরে ! এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে।' ঠিক এ-কথাটা মুকুন্দকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুজন বলে, দুবার : একবার বৌ, আরেকবার নাতনি।

লোকমানসে ভীম মহাবলী মল্লযোদ্ধা। মুকুন্দও দোর্দণ্ড মল্লবীর। অম্বুবাচীর লড়াইয়ের আখড়ায় তার সঙ্গে আর কারোরই এঁটে ওঠার জো নেই।

'চাষপালা'য় আছে চাষ শুরুর আগে ভীম 'সইসে নিচুড়ে সেদিন গায়ে মাখে তেল।' 'পৌষ-লক্ষ্মী'তেও পেয়ে যাচ্ছি ধানকাটার আগে মুকুন্দর তেল-মাখার সরস বিবরণ।

টেকনিক হিশেবে, ভীমের সঙ্গে মুকুন্দর এই উপমাকে তারাশংকর এ গল্পে পাঁচবার পুনরাবৃত্তি করেন ঘুরে ঘুরে, গানের ধুয়োর মতন। এ প্রক্রিয়ায় আদিকৃষক ভীমের এই প্রতিমাটি ধীরে ধীরে অর্জন করে প্রতীকের তাৎপর্য। বিশেষতঃ পঞ্চম বা শেষ প্রতিমাটি অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যায়:

'গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠো-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত।'

তিনটি স্তর আছে মুকুন্দর চরিত্র-কাঠামোয়। এক স্তরে, ওর চরিত্রে তারাশংকর, রিয়ালিস্ট রীতিতে, ছোটো ছোটো রেখায় পরিস্ফুট করছেন ব্যক্তিস্বরূপ-চিহ্নিত নায়কের আলেখ্য। অন্য স্তরে— পটুয়ার রীতিতে— ঐ চরিত্রে তিনি ফুটিয়ে তুলছেন চাষীর সামান্য লক্ষণ। আবার, আরেক স্তরে, ওকে আঁকছেন লোকপৌরাণিক ভীমের আদলে। এই তিনটি পৃথক স্তর এই চরিত্রপটে জুড়ে গেছে, বেমালুম।

দেখলুম: লক্ষ্মী-ধনকুবির-ভীম সমেত 'চাষপালা'র সেই সংবন্ধ পুরাণ ফিরে এসেছে তারাশংকরের গল্পে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক: এই পটুয়া-পুরাণকে 'পৌষ-লক্ষ্মী'র অস্থি আর মজ্জার ভিতরে কেন মিশিয়ে নিচ্ছেন তারাশংকর? কেন উনি কৃষক-ভীমের ওই প্রত্নপ্রতিমার আশ্রয় নিচ্ছেন? মনে হয়, এর মূলে আছে মন্বন্তরের সেই ছিন্নভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতাকে শিল্পের স্থির বিন্যাসে বাঁধবার মরিয়া আকুতি, প্রয়োজন। পটুয়া-গানের ওই পুরাণ তাঁর হাতে জুগিয়ে দিল মহাসময়ের আয়তনে দুর্বোধ সমসময়কে বোঝবার, ধরবার, একটি ফ্রেম।*

---

* এ লেখার প্রথম পাঠ বেরোয় 'কলকাতা' পত্রিকায় ১৯৭০ সালের জুন মাসে। বর্তমান পাঠে লেখাটি বেড়ে গেল, প্রায় চার গুণ।

মীরা মুখোপাধ্যায়

বাস্তারের দিনলিপি

কারিগরের সন্ধানে বাস্তারে* যাবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আর্থিক সঙ্গতির অসুবিধে থাকলেও মানসিক জোরের অভাব ছিল না। তখন কলকাতা থেকে রায়পুর যেতে লাগত ১৭ টাকা।

গিয়ে গঙ্গামুণ্ডা বার করতে খুব কষ্ট হল না। তারপর তার সঙ্গে মানিক, গণেশ ঘড়ুয়াদেরও। যে বর্ণনা দেব তার সঙ্গে আজকের গঙ্গামুণ্ডার একটুও মিল নেই। সেদিনকার গঙ্গামুণ্ডা আমার কাছে বিশেষ আদরের ছিল।

বাস্তারে ঢুকেই যা সব চোখে পড়েছিল তা সবুজ ঘন বনানী আর মস্ত মস্ত লম্বা লম্বা বিশেষ উঁচু উঁচু গাছ। অতো খোলা, তখনও পিচের রাস্তা বেশি ছিল না। যেখানে ওরা ছিল সেখান থেকে গঙ্গামুণ্ডা ছিল ঠিক আড়াই মাইল দূরে।

মানিক ঘড়ুয়া রাজি হল আমাকে শেখাতে। টাকা যা চাইল তা আমার পক্ষে কষ্টের হলেও রাজি হলাম। ঠিক হল রোজ সকালে যাব। যাওয়া শুরু করলাম। গঙ্গামুণ্ডার চালা ঘরে এদের বাস ছিল।

সুন্দর একটি বেতের ঝাঁপি ঢাকা দেওয়া তাতে থাকত ওদের মোমের কাজের সরঞ্জাম। রৌদ্রস্নাত আঙিনায়— সেখানে চলত আমাদের শেখাশিখি।

প্রথম ওদের কাজ দেখতে লাগলাম। ওরা করত এবং আমি বসে বসে দেখতাম। এই ভাবে পুরো একটি সপ্তাহ দেখবার পর আস্তে আস্তে কাজ শুরু করলাম। কাজ শুরুর প্রথমে ছিল 'কুটন' মানে মাটির অন্তরগড়ন তৈরি করা। মানিক প্রথমেই বলল, এবার যেটা বলব হয়ত তুমি করবে না— কিন্তু এটা দরকার।

যাও— ছাগলের নাদি দেখিয়ে বলল, ওগুলি নিয়ে এস। ওগুলি তুলে প্রথমে জলে ভিজাবে, বলে একটি মাটির পাত্র দিল আমার হাতে। বলল এটি করা বিশেষ দরকার। আমি ওর কথা মতো কাজ করলাম। তারপর একটি শিল দেখিয়ে বলল,— এবার ওগুলিকে বাটতে হবে।

সেই মুহূর্তে একবার আমার মায়ের মুখটা মনে পড়েছিল। কিন্তু আমি মনটাকে দুর্বল হতে দিইনি। শিলে বেটে তারপর হুকুম হয়েছিল, যে যে মাটি ওখানে জড়ো

---

* ভাস্কর মীরা মুখোপাধ্যায় বাস্তারে গিয়েছিলেন আজ থেকে ৩১ বছর আগে। ছত্রিশগড়ের কারিগরদের কাছে তিনি কাজ শিখেছেন। সেইসব দিনের স্মৃতিচারণ করেছেন মীরা এই দিনলিপিতে।

করা ছিল, সেই মাটি বেছে তার সঙ্গে এই বাটা অংশ এক তৃতীয়াংশ করে ভালো করে মিলিয়ে নিতে হবে। তারপর শিলে রেখে একটি ধড় ও পায়ের গড়ন করতে হবে। আমি সেই মতো করলাম।

প্রথম দিন সকাল থেকে ১২টা বাজল এসব করতে। মানিক বলল, বাই, এবার চান খাওয়ার সময়। আমি বাড়িমুখো রওনা দিলাম। মানিক বলে দিল আড়াইটে তিনটেয় আবার কাজ শুরু হবে, আমি যেন সেই সময়ে ফিরি।

সকালে যখন আমি গিয়েছিলাম মানিকের বৌ কি যেন করছিল। রাঁধছিল বলে মনে হয়নি। মানিক অন্য শিলে মশলা বাটল। খুদের মতো একটা জিনিসকে ফোটাচ্ছিল তারপর এর সঙ্গে বাটা মসলা মিশিয়ে দিয়ে কি যেন করল। আরো কি তৈরি করল সেদিন দেখিনি। জিজ্ঞেস করতে লজ্জাও করছিল।

দুপুরে হেঁটে ফিরে আমার আবার হেঁটে গঙ্গামুণ্ডার ওখানে যেতে বেলা আড়াইটেই হল। এরপর মোমের কাজ দেখা। ভালো মোম— গাছ থেকে, মৌচাক ভেঙে হাট থেকে আনা। গলানো হল ও ছাঁকা হল। আমার পক্ষে সবটা নতুন, সুতরাং জলে ফেলে একটি চাকি শক্ত হল দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই করতেই বিকেল হল। এবার আমার চলে আসবার সময়। আবার হাঁটা।

রাস্তায় কোনও ভয় ছিল না, কি দেখতাম কি ভাবতাম, আজ আর সব মনে নেই। কিন্তু আমার মন এক অপরিসীম আনন্দে ভরে থাকত।

এরকম করে প্রতিদিন যাতায়াত হত আর কাজ শেখা। এসবের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি শুনতাম তা হচ্ছে দণ্ডেশ্বরীর নাম।

কত কি বানাত! হাতি, ঘোড়া সব চেয়ে বেশি তার মধ্যে। হাতি হলে কখনও হত দণ্ডেশ্বরী ঘোড়া হলে 'ভৈরম।'

প্রথম ঢালাই করল একটি দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি বোধ হয় ৬/৮ আঙুলের হবে। ছোট্ট একটি উনানের মতো দেখতে, মাটির তলা পর্যন্ত গাড়া বেশ নিচু— চমৎকার করে মাটি দিয়ে নিকোনো। নারকেল, কিছু ফুল এনেছিল, অল্প করে সিঁদুর—তাই দিয়ে পুজো হল। মন্ত্র যা বলল— 'নিরাকার ব্রহ্ম'। আমি জিজ্ঞেস করলাম নিরাকার ব্রহ্ম বলতে কি বোঝে? সে যা বোঝালো তাতে অবাক হয়ে যাবার মতো কিছু ছিল কিনা জানি না কিন্তু আমার তো সবই অবাক লাগত, তাই এই উত্তরেও অবাকই লাগল। ঝুলা তৈরি হত অনেক রকমের। কখনও সেই ঝুলা চড়ত হাতির পিঠে। এ ঝুলায় কে? 'দণ্ডেশ্বরী'। ক্রমশ ওদের সব দেব-দেবতাদের একটি ফর্দ বানানো হল।

এরপর ওদের দণ্ডেশ্বরীর বর্ণনা। দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি গড়ার প্রসঙ্গে একজন বললে দণ্ডেশ্বরীর দাঁত আছে— আরেকজন বললে, নেই। একজন বলল দণ্ডেশ্বরীর চার হাত। আমি বললাম, এখানে রাজবাড়িতে দেখে এলাম দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি সে তো দশভূজা দুর্গা মূর্তি।

কারিগর মানিক বলল 'হ্যাঁ, কিন্তু এখানকার দন্তেবাড়ার মূর্তি যদি দেখ অবাক হয়ে যাবে। বলে নিজের গড়া একটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে বলল, এ কিছুই হয়নি। কোথায় সেই বিকট ভাব ? এমন ভয়ংকর তাঁর চাউনি, বেশিক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায় না। দন্তেবাড়ার দন্তেশ্বরীর মূর্তির চার হাত ? হয়ত পাঁচ/ছয়ও হতে পারে। প্রশ্ন করলাম, তুমি নিজে দেখনি ? বলল, দেখেছি কিন্তু সে যা ঘন অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দেখা ; দেখলে প্রাণের ভিতর ভয় হয়।

এই ভাবে দন্তেশ্বরীর ওপর আমার মন আকৃষ্ট হয়। ওদের বর্ণনা শুনতে শুনতে ইচ্ছে হল মন্দিরে যেতে। একদিন গিয়েও পড়লাম মন্দিরে। অদ্ভুত দন্তেবাড়ার এই মন্দির। কাকতীয় বংশের উপাস্য। একবার ওখানে গিয়ে দু-তিন দিন রইলাম। যে প্রতিদিন সেবা করত এ বিগ্রহের, তার কাছে কথা বলে ঠিক করে নিলাম মূর্তিটি দেখতে আমাকে সাহায্য করবে— হলও তাই।

জগদলপুরে আমি যেখানে থাকতাম সেখান থেকে মাইল ৪০ দূরে। অনেক পথ, অনেক বন ভেঙে যেতে হয়। সেখানে বাস যেত। পথে পড়ত ডঙ্কিনী আর শঙ্কনী নদী। মন্দিরে যাওয়ার আগে বাস্তারের আদিবাসীদের জীবনের রীতির সম্পর্কে একটু বলে নেব। ছত্তিশগড়ীদের বিষয়ে আমি খুব বেশি জানি না— তবে জগদলপুরে ও তার আশেপাশে মেলায় যে সব আদিবাসীদের তখন দেখেছি তাদের বিষয়েই বলব।

প্রথম কাজ। ভোরে উঠে থেকে ওদের কাজ। যদি দুই ভাই থাকে দুই স্ত্রী থাকে তার স্ত্রীরাও স্বামীদের কাজে সাহায্য করে। ওদের সামাজিক জীবনের বেশি ধরা কাট নেই। ওরা ওদের স্ত্রীদের ভালবাসে। কিন্তু এও দেখা গেছে একজন পুরুষ অন্য স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে বিয়ে করেছে স্ত্রী তখন অন্য পুরুষ খুঁজে নিয়েছে। এদিক থেকে আমি খুব ঝগড়াঝাঁটি হতে দেখিনি।

এদের স্ত্রীরা পুরুষদের চেয়ে বেশি কাজ করে। পুরুষরা স্ত্রীদের জন্যে কাজ করে দেবার অপেক্ষায় থাকে। রান্না শুধু স্ত্রীরাই করে তা নয়— স্ত্রী পুরুষ মিলে মিশেই রান্না করে। সন্ধেবেলায় মদ খাবেই।

আদিবাসী কারিগরদের খুঁজে বার করতে আমার সুবিধে হত—মদের ভাঁটা দেখে। মদের ভাঁটার কাছেই এই আদিবাসীদের চালা হবে।

দশহরা মানে পুজো থেকে আরম্ভ করে আর ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় মাড়াই হবে। সে মেলাতে এরা পিতলের সামগ্রী নিয়ে বিক্রি করবে। সুতরাং শীতের সময় এরা পিতলের কাজ করবে সবচেয়ে বেশি। কতরকমের ঘুঙুর হবে। লাঠির মাথায় বসাতে— কোমরে বাঁধতে— হাতে বাঁধতে— পায়েও। সিঙ্গা তৈরি হবে, বাজবে। তাছাড়া দেবদেবী মূর্তি — নানারকম প্রদীপ ইত্যাদি হবে।

এদের মেলায় বড়ি পাওয়া যায়। মেয়েরা মেলার আগে ছোট ছোট বড়ি তৈরি করে ও মেলায় বিক্রি করে ও বাঙালীদের মতো বড়ি খায়।

এদের একটা অদ্ভুত রীতি ছিল। কেশকাল, রায়পুর ছাড়ার একটু পরে আসে— হয়ত ঘণ্টা দুই পর, পাহাড়ের উপর সেখানে একটি জায়গা আছে আদিবাসীদের— সে জায়গাটিকে এখানকার আদিবাসীরা 'জেল' বলত।

নতুন মূর্তি কেনার পর বাড়িতে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটত বা খারাপ কিছু ঘটত তাহলে সেই মূর্তিটাকে জেলে রেখে আসত। মানে সে মূর্তি বন্দী হয়ে থাকত।

প্রথমটা সেখানে গিয়ে আমিও অবাক হয়েছিলাম। কত সুন্দর সুন্দর কত রকমের মূর্তি এক জায়গায় রয়েছে, সেগুলি কিন্তু কেউ নিয়ে যায় না। যে দুঃসময়ের চাপে সে মূর্তিকে ফেলে রেখে গেছে সে সময় একটু ভাল হলেই, সে নিজেই সে মূর্তি আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেত। আমি বলছি ৩১ বছর আগেকার কথা, এখনও তাই করে কিনা আমার জানা নেই।

মেয়েদের সাজগোজের বেশি আড়ম্বর ছিল না। নিজেদের হাতে করা সাদা একটি শাড়ী আঁটসাঁট করে পরত তাঁরা— জামা পরত না। পায়ে গহনা থাকত রূপার— হাতেও – আর মেলার দিনে তাদের চুল বাঁধার শোভা হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে হত। কত রকমের খোঁপা — বড় বড়— তাতে থাকত চিরুনি, ছোট চিরুনি। এ চিরুনি মহেঞ্জোদাড়োর সময় থেকে পাওয়া যায়। মাথায় খোঁপা এমন সুন্দর করে বাহার করে করত এরা— নাচের সময় ছুটোছুটির সময় কখনও খুলে পড়তে দেখিনি। মাথায় থাকত কড়ির গহনা।

একটু অন্য কথায় যাচ্ছি, কৌশাম্বিতে নানা মাটির মূর্তি পাওয়া যায়। তাদের মাথার খোঁপা অনেকরকম বাহারের। শোনা যায় কিছু পশ্চিমী পণ্ডিতের মতে—মাথার এই বিশেষ রকম সজ্জা রোমান গ্রীকদের কাছ থেকে এসেছে। কিন্তু আমার মনে হয়— আমাদের দেশ থেকে এ কেশের বাহার ও খোঁপা বাঁধার পদ্ধতি ওসব জায়গায় মানে পশ্চিমে গিয়েছে একদিন।

কৌশাম্বির মাটির মূর্তিগুলি থেকে আরেকটি সত্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে—মুক্ত বক্ষ। ঐ পুতুলগুলিতে তা করা হলে আবার অনেকের মত তা প্রাচীন গ্রীস থেকে মিনাতয়েনদের দেবী-প্রভাব ছড়িয়েছে। কিন্তু যখন মানুষ কোন ভালোমন্দের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল— তখন সভ্যতা এরকম ছিল।

আদিবাসীদের অতীন্দ্রিয় বোধ অতি সূক্ষ্ম ছিল। তারা খুবই হাসিখুশি আনন্দময়ী ও আনন্দময় তবু গভীর গূঢ় কোনও বোঝাবুঝি বিশ্বজগতের ভিতর যেন তাদের কাছে পরিষ্কার ছিল।

কোন কোন মেলায় বিচিত্র এক খেলার পদ্ধতি ছিল। মেলা ছাড়াও আবার শুধু এই খেলার নিয়ম ছিল। চারিদিকের লোক নিমন্ত্রিত হত। খেলা দেখাবার জন্যে।

এ খেলায় থাকত কতগুলি কিশোর বালক কখনও তারা বয়েসে যুবকও হত। একদিকে এই ছেলের দল বসত অন্যদিকে কিশোরী বা যুবতী মেয়েরা থাকত। সেদিন এদের

সাজ পোশাকের আড়ম্বর থাকত না। নিত্যকার সাদাসিধে মেয়ে ছেলে।

একদল অন্য দলকে গান গেয়ে প্রশ্ন করত নিজেদের তৈরি কোনও ধাঁধাঁ। অন্যদল সে দলকে উত্তর করত সেও গান করে। আবার ব্যক্তিগত কারুকে ব্যক্তিগত আরেকজন গান রচনা করে ধাঁধাঁর প্রশ্ন করলে—অন্যজন যদি সে প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিলে, সেই ছেলেটি বা মেয়েটি জিতে গেল। এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন করেছিল তাকে বাড়ির মেয়ে হলে দাসী এবং ছেলে হলে ভৃত্য করবার জন্যে বেঁধে নিয়ে যেত। এতে বেশ হাসিহল্লা হত। এসব ক্ষেত্রে কখনও কখনও ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত। এ রকম সুন্দর সুন্দর খেলার পদ্ধতি জানিনে কতদিন বাঁচবে।

বাড়ি বাড়ি পুরুষদের মধ্যে মুরগি খেলাবার একটি প্রথা ছিল। কাজের পর কোনও কোনও দিন এরা মুরগি নিয়ে বন্ধু বান্ধবদের মুরগির সঙ্গে খেলাতে আরম্ভ করত। যাকে বলে অভ্যাস করতে যেত। মুরগির একটি পায়ের সঙ্গে চাকু বেঁধে দিত।

সব চেয়ে বেশি মুরগির লড়াই দেখেছি নারানপুরের মেলাতে। খেলার জায়গা রক্তাক্ত হয়ে থাকত। মেয়েদের মুরগি খেলাতে কখনও দেখিনি!

এদের খাবার ব্যাপারে মনে হয় পেলে সবই খায় কিন্তু এরা পেত না তাই যা সব সহজে ও সস্তায় প্রাপ্য তাই কিনত ও খেত। দেরীপুরের মাড়াল, বাঁকুড়ার-কারিগরদের সঙ্গে এদের একটা খাবারের মিল ছিল। ডাল পাতলা করে তাতে সব রকম মসলা বেটে মিশিয়ে রান্না করত। এই সব রান্না এক রকম কামার— যারা পিতলের ঢালাই করে, তারা রাঁধে।

প্রতিদিন এরা স্নান করে। প্রয়োজনে একবারের বেশিও। মেয়েরা নিমপাতা আর কাঁচা-হলুদের তেল করে স্নানের আগে মাখে।

মাড়েয়া, মুরিয়াদের নিজেদের ভাষা ছিল। এদের ভাষা হালবি। তাতে ৩/৪টি ভাষা পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ভাষা, হিন্দি, বাংলা ইত্যাদি। এরা ভাত পচিয়ে মদ করে কিংবা সাবু গাছের রস তুলে ঠিক তালের রসের মতো করে মদ করে।

শিশুকে এরা অবহেলা করে না। কাজেকর্মে গেলে গায়ের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যায়। ২/৩ বছরের হলেই ওদের সঙ্গে কাজ করতে বসায়, সুতরাং সে শিশুটি ৪/৫ বছরের হলে বাবা মার সঙ্গেই কিছু কিছু সৃষ্টিধর্মী কাজ করতে পারে। আজকাল অধিকাংশ শিশুই বই হাতে পড়তে যায়। আবার কোন কোন শিশু বই হাতে গাছের নিচে খেলতে লেগে যায়। এখানকার কোনও জিনিস, কোথাও পড়ে থাকলে তা সে জায়গাতেই থেকে যায়। যতক্ষণ না উক্ত লোকটি নিজে এসে তা সরিয়ে না নিয়ে যায়।

এখানকার লোক রগচটা হয়। তারা সন্ধ্যাবেলা মদ খেয়ে লোককে আহ্বান করে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে। যদি উক্ত লোকটি যোগ দিতে না চায় তারা মদের বসে কি করবে তার কিছু ঠিক নেই। খুন করেও ফেলতে পারে—এবং পরে নিজেই থানায় গিয়ে ধরা দেবে— 'আমি খুনি' বলে।

মেয়েরা বা যে সৌভাগ্যবতী— সে দিনরাত কাজ করে। স্বামীর সেবা, স্বামীকে দেখা ইত্যাদি। তারা মেলাতে বা সন্ধেবেলায় স্বামীর সঙ্গে নাচে গায় সব করে। তারা সরল ও হাসিখুশি হয়।

একদিন আমাকে মানিক বলল— তুমি দশহরা না দেখে চলে যেও না। আমাদের মস্ত মেলা হয় (মাড়াই)।

আসল যে দণ্ডেশ্বরীকে নিয়ে যায় তাকেই তুমি দেখনি।

এরপর আবার আমি ধরমপুরা জগদ্দলপুরে ফিরছি। আমার যাত্রা শুরু হল দণ্ডেবাড়ার দণ্ডেশ্বরী মন্দিরে। সকাল থেকে আমি আকুল হয়ে আছি ঘড়ুয়াদের ঠাকুর দেখব বলে। বাস্তারে ঢুকে পর্যন্ত শুনছি দণ্ডেশ্বরীর নাম। পিতলের কাজের শুরু থেকে— দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি হাতে অস্ত্র নিয়ে।

শুনলাম এখন যেখানে দণ্ডেশ্বরীর মন্দিরটি সেখানে এক সময় ছিল শীতলামায়ী গ্রামদেবীর মূর্তি। বর্তমান মূর্তিটি আনা হয় বাস্তারের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হলে। এরা বলল ২২ পুরুষ আগে। ৫/৬ 'শো বছর আগে। নতুন রাজবংশ ওরঙ্গল থেকে গৃহদেবী দণ্ডেশ্বরীকে নিয়ে এলেন। শীতলামায়ী নির্বাসিতা হলেন একটি পুষ্করিণীর ধারে। এখনও তিনি সেখানে।

সকাল থেকে আমি আকুল হয়ে আছি ঘড়ুয়াদের ঠাকুর দেখব বলে। বাস্তারে ঢুকে পর্যন্ত শুনেছি দণ্ডেশ্বরীর নাম। পিতলের কাজের শুরু থেকে, দণ্ডেশ্বরীর মূর্তি। নাম আর মূর্তির কথা শুনছি।

উপস্থিত হলাম যথাস্থানে। মন্দিরের সামনের আঙিনা ঢাকা। মন্দির যতদূর মনে পড়ে খুব সুরক্ষিত।

মন্দিরের ভিতর চোখ ধাঁধাঁনো অন্ধকার। দ্বারের পর দ্বার, গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকার। মূর্তির সম্মুখে রাখা একটি প্রদীপ, তারই সামান্য আলো গিয়ে পড়েছে মূর্তির উপর।

পুরোহিত বললে, মূর্তি রণচন্ডীর। দাঁড়িয়ে থাকতে হল মূর্তি দর্শনের অপেক্ষায়। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। ক্রমে অন্ধকারের অবরোধ একটু একটু করে সরে গেল। প্রদীপ কিরণের এক-একটি পথ খুলে দিল।

দেখলাম কালো এক শিলার একটি দেবীমূর্তি। দেবীর মুখে হাসি, জয়ের হাসি, বিকট সুন্দর। মুখে ক্ষমা নেই। অন্যায় সহ্য করার মতো বিন্দুমাত্র নমনীয়তাও নেই সেই পাথরে।

দেবী মূর্তির উপরে ঝুলছে রুপোর ছাতা। এ মূর্তিকে কখনও স্থানচ্যুত করা হয় না। উৎসবে শোভাযাত্রায় যদি কখনও দণ্ডেশ্বরীর উপস্থিতির প্রয়োজন হয় তবে তাঁর ছাতাই হয় প্রতিনিধি। এই প্রতীককে বহন করবার অধিকার থাকে রাজার এবং রাজপুরোহিতের। এখানেও দেবীমূর্তি বস্ত্র দিয়ে ঢাকা। আক্ষেপ হল। এই কালোবরণ মূর্তি তাতে

পরানো সাদা শাড়ী। এখন বুঝলাম কামাররা (ঘড়ুয়া) কেন দেখেও দেখেনি দণ্ডেশ্বরীকে। ঐ অন্ধকার, ঐ ভয়ানক আর সুন্দরের সংমিশ্রণ আর শাড়ী ঢাকা দেহ। দেবী চতুর্ভুজা কি ষড়ভুজা তা শাড়ীর আবরণের কল্যাণে বোঝা যায় না।
পুরোহিত শোনালো পুরানো কথা। দেবগণ এই শক্তি সৃষ্টির কালে দণ্ডে দণ্ডে ঘর্ষণ করেছিলেন, তাই দেবীর নাম দণ্ডেশ্বরী।
কিছুদিন বাদে নারায়ণপুর থেকে পারালকোট যাবার পথে সোনপুর নামে একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। এখানে আদিবাসীদের একটি মন্দির আছে। মূল দেবতা অধিষ্ঠিত একটি খড়ো ঘরে, শালের খুঁটির ঘর, দেওয়াল নেই। বিচিত্র এই দেব মূর্তি। নাম কুড়ুমতুল্লা। একখানি কাঠ, তার দু-পাশে আরও দু-খানা কাঠ, লতা দিয়ে বাঁধা এই ত্রিমূর্তি। একটি গোষ্ঠীর কুলদেবতা। ব্যাধি নিরাময় কল্পে।
মনে পড়ল পুরোহিত বলেছিল এই মন্দির ছিল আগে, গ্রামদেবী শীতলামাঈর। শীতলার রোগ নিরাময়ের এক প্রাচীন সংস্কার এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত ছিল।
দণ্ডেবাড়ার পুরোহিত ও অন্যান্য সকলে আমার অত ঔৎসুক্য দেখে বার বার অনুরোধ করল এখানকার দশহরা উৎসব দেখে যেতে।
প্রবীর ভঞ্জ দেও বাস্তারের রাজা। এঁর উপর একটি ফিল্ম দেখি, দশহরার রথ উৎসবও দেখি। তার আগে যা যা দেখেছি, শুনেছি, সবই 'দণ্ডেশ্বরী', তার অল্প বিবরণ রইল। মুখ চোখ না থাক। বেদীর উপর রাখা তাও দণ্ডেশ্বরী। আবার পিতলের অতি সুন্দর কারুকার্য করা হাতির উপর মাহুত, মাহুতের পিছনে হাওদা—সেটি ঘেরাটোপে ঢাকা। ঘেরাটোপটি খুলে দেখালেন তাতে একজন দুলছেন। কে দুলছেন ?
প্রধান বেদীর উপর মাটির ঢিবিটিকে দেখিয়ে বললেন, এই ইনি 'দণ্ডেশ্বরী'।
সর্বত্র দণ্ডেশ্বরী। রূপ ভিন্ন, বাহন ভিন্ন, কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা, ষড়ভুজা, দশভুজা, কিন্তু সবাই দণ্ডেশ্বরী। কোথাও কোথাও নামেও বৈচিত্র্য যেমন ভাণেশ্বরী, মাণিকেশ্বরী, তবু তারাও যেন অভিন্ন।
ইতিহাস দণ্ডকথা অনুযায়ী লোকমুখে যা পেয়েছি তা লিখলাম। বাস্তারে নাগবংশ রাজারা রাজত্ব করতে থাকে। এরা ৯ ভাই ছিল। মা দণ্ডেশ্বরীর আদেশে ওরা উড়িষ্যায় গিয়ে ঢেংকানাল, খড়িয়াল, কালাহাণ্ডি, বিজয়নগর, খালিকোট, ভুবনেশ্বর, পুরী, জয়পুর, জাজপুর চলে গিয়ে রাজত্ব করতে লাগলেন। বাস্তারের মহারাজ ঔরঙ্গল থেকে এলেন। উড়িষ্যা থেকে ভাস্কর নিয়ে এলেন এঁরা—।
নাগবংশী রাজাদের রাজত্বের সময়েই বারসুর, ভৈরমগড়, কাঠে-কল্যাণ, চিন্তানার, জাগলে-গুণ্ডা, ভজি, চাপকাল, গুপ্তেশ্বর, কুটুমসার— এ সমস্ত জায়গায় মন্দির— নানাপ্রকার শিল্পজনিত অট্টালিকা, থান তৈরি হয়।
দণ্ডেশ্বরীর মন্দিরের ভিতর যে শিলাতে লেখা ১৬ / ১৭ বংশের বাস্তারের রাজার কথা। এঁরা বা দণ্ডকথায় শুনলাম তখন এখানে তেলেঙ্গানা রাজবংশের একচেটিয়া রাজত্ব

চলত। তার আগে এসব রাবণ বিভীষণের ও রাক্ষসদের দেশ ছিল।
এখানকার পুরুত আবার বলতে লাগলেন এখানকার নানা দণ্ডকথা। আস্তে আস্তে দেখলাম, দেবী মূর্তির উপরে আরও একটি শিলা তাতে খোদাই একটি নৃসিংহ অবতার এবং আরও কতকগুলি অস্পষ্ট কারুকার্য। একটি নতমস্তকে কঙ্কালী মূর্তি এবং আরও কতগুলি শায়িত অর্ধশায়িত কঙ্কালসার মানুষের প্রতিকৃতি। যেন ক্লিষ্ট রোগাতুর মানুষ প্রাণভিক্ষা করছে।
মনে পড়ল পুরোহিত বলেছিলেন এই মন্দিরটি আগে গ্রামদেবী শীতলামাঈর ছিল। শীতলার রোগ নিরাময়ের এক প্রাচীন সংস্কার এই মন্দিরের সঙ্গে জড়িত ছিল। দণ্ডেশ্বরী এলেন আজ থেকে ৫০০ / ৬০০ বছর আগে কিন্তু নির্বাসিতা শীতলার রোগ নিরাময়ের সংস্কার রাষ্ট্র পরিবর্তন সত্ত্বেও অব্যাহত রাখা হল।
দণ্ডেশ্বরীর মন্দিরে কত ঘর আর কত মূর্তি। যেমন শাস্ত্রীয় ভাস্কর্য, কত মূর্তি দেখলাম তেমন আবার চোখকে অবাক করা আধুনিক ভাস্কর্যের খোদাই দেখলাম। সেগুলি দেখে বেশ নিশ্চিত ভাবে বলা যায় ওগুলি মাড়েয়া মুরিয়াদের খোদাই কার্যে সম্পাদিত। কতরকম আছে— কুকুর— আদিবাসীরা কাঁধে বাঁক নিয়ে, গোয়ালিনী ইত্যাদি।
এবার ভৈরমগড় যাওয়া। ভৈরমগড়, দণ্ডেবাড়া থেকে আরও ৪০ মাইল।
কে জানে কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল মহিষাসুর আর দুর্গার। কারণ এল্লবায় গুহাতে-দেওয়ালে খচিত একটি খোদাই দেখেছি। দুর্গা যে মহিষাসুরের সঙ্গে লড়ছেন— সেই অসুর ইংরাজিতে যাদের বলা যায় বাইসেন হর্ণ মাড়িয়া সেই কথা বাংলায় বললে দাঁড়ায়, মাড়িয়ারা মাথায় মহিষ সিং এঁটে, মেলায় মেলায় নাচতে যায়।
মাথায় মহিষ সিং পরা এই মাড়িয়াদের নাচের সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরানো যায় না। কী তাদের ছন্দ— কী তাদের তালের গতি। আজও মনে পড়লে আমার শিহরণ লাগে। দল বেঁধে এরা নাচে, মাথায় ময়ূরের পেখম থাকে, হাতে গলায় মাথায় থাকে অজস্র কড়ির গহনা। মস্ত মস্ত মাদল নিয়ে থাকে কেউ কেউ ; মাড়েয়া মেয়েরাও নাচে এদের সঙ্গে। এদের মুখের উপরও থাকে কড়ির আর ময়ূর পালকের গহনা। সেগুলো দোলে মালার মত।
মনের গভীরে যেন একটি পুরানো ক্ষত থেকে রক্ত নিঃসৃত হতে থাকে আমার।
ডঙ্কনী শঙ্কনী নদী পেরিয়ে গিয়ে বন। সেই বনে আবার মস্ত মস্ত বড় বড় গাছ, এদের ভাষায় কোশাম গাছ, সেগুন গাছ, কেকাড় গাছ।
এখানে কত ভৈরবের উপস্থিতি— বন ভৈরব, চণ্ডাল ভৈরব বা টুণ্ডাল ভৈরব, ঘাট ভৈরব, জটা ভৈরব, চিনা ভৈরব (ছোট ভৈরব), পেদ্দা ভৈরব, নৌকা ভৈরব। এসব বনের ভিতর এই সুন্দর সুন্দর মূর্তি ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা মন্দির ছড়িয়ে পড়ে আছে।
বন ভৈরবের মুখে একেবারে মাড়েয়া আদল। চিনা ভৈরব (বামন অবতার) অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমায়। এখানে কোনও মূর্তির সঙ্গে কোনও মূর্তির মিল নেই। নামও অদ্ভুত,

যেমন বড় বড় ঘাসের মধ্যে দাঁড় করানো ঘোড়ায় চড়া, ঢাল তলোয়ার নিয়ে সেই পাথরের খোদাই রিলিফগুলিকে এরা বলে চোর ভগবান।
ভৈরমগড় একটি অতি প্রাচীন জায়গা। এখানে জায়গাটিকে ভালো করে দেখলে বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে এসেছিল আক্রমণকারী আততায়ী।
বিশাল বিশাল বনে লুকানো লুকানো পড়ে আছে ভাঙা, টুকরো, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। তখন অত পরিষ্কার না বুঝলেও এখন জানি ওখানে ছিল চৌষট্টিটি যোগিনীর মন্দির। যে চক্রে ছিল যোগিনীরা সে চক্র ভাঙা, যোগিনীরাও ছিন্ন ভিন্ন।
তবু যেখানেই যোগিনীর রূপ দেখেছি, পাগল হয়েছি। অপূর্ব তুলনাহীন ভাস্কর্য— ভাস্করই বা কি দক্ষতায় প্রেমে তা খোদাই করে গিয়েছেন। শিল্পীরা আমাদের শিল্পে কত দিয়ে গিয়েছেন— অপর্যাপ্ত।
ভৈরবরা কোথাও নিস্তব্ধ, কোথাও অট্টহাসি, কোথাও নৃত্যের ছন্দে সমস্ত বনকে জাগিয়ে দিচ্ছে।
সেদিনকার সকালের সেই সুন্দর নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ— তারই কোলে এই ঘন বন, হাওয়ায় ঝিরঝির করে শব্দ হচ্ছে। অট্টহাসি মিলিয়ে গেছে। গাছগুলি এই বনে আকাশচুম্বী। একদিকে ভয়ংকর স্তব্ধতা, অন্যদিকে প্রকৃতির এই অপূর্বতা। প্রত্যেকটি গাছ প্রত্যেকটি মূর্তির মতো স্বতন্ত্র। আম, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, হাবরা, বাহেরা, তেন্দু, সেমহার চার, মহুয়া, সেগুন, বিজা, মুণ্ডি, আমলা, শিমুল ইত্যাদি। এতরকম গাছ তবু কোনটার সঙ্গে কোনটা মিলিয়ে যায়নি। এই সবুজের ভিড়েও নয়।
এখানে এগোতে এগোতে অতি সুন্দর পাথরের দরজার কাঠামো দেখলাম। এই দরজার চারপাশ দিয়ে একটি ঘেরা।
ইতিপূর্বে যে সব মূর্তি দেখেছি— সব এই সীমানার ভিতরই রাখা। এইটিই ছিল ভৈরমগড়। যে রাজা এসে জয় করেছিলেন এই স্থান—তা কাকতিয়দের অনেক পূর্বে, সেই রাজার আদেশে গড় তৈরি করেছিল এখানকার আদিবাসীরা। এই পাথরের ঘেরা আর সেই পাথরের রাস্তা। যে রাস্তা চলে গেছে ভৈরমগড় থেকে সোজা দণ্ডেবাড়া। এই রাস্তা ধরেই একদিন রাজা, হাতিতে চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, লোক লস্কর নিয়ে, যেতেন দাণ্ডেওয়াড়ায়। এই গড়ের ভিতরই থাকতেন রাজা, প্রজা, মিত্র, অমাত্য, ভাস্কর আর পুরোহিত নিয়ে।
কিন্তু একজনই কি রাজা এসেছিলেন এখানে ? একটু দেখলে বোঝা যায় বিভিন্ন প্রভাব, যার চিহ্ন আমরা পাই পাথরের খোদাই-এ।
একদিকে ঘোর শৈব। ভৈরব এখানকার প্রধান দেবতা। অন্যদিকে রামসীতার মন্দির। আর হনুমানের মূর্তি। চারিদিকে পাথরের উপর তেলেঙ্গানার হরফে লেখা— হয়ত ইতিহাস। কিন্তু সকলে তেলেঙ্গানার লোকেরাও এ হরফ পড়তে পারেন না।
হাঁটতে হাঁটতে কোথাও চলেছি টিলা পাহাড়ে, কোথাও নুড়ির রাস্তায়। কোথাও ঢুকছি

বাঁশঝাড়ের ভিতর— কোথাও পুকুর পাড়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখছি চারিদিকের মূর্তি। একটি শায়িত গণেশ। এটিকে আদিবাসীরা কেটেছে তা এর পাদদেশই প্রমাণ করে। গভীর অরণ্যে ঘুরতে ঘুরতে যখন তেঁতুল গাছের নিচে কলকে গাছের তলায় এসে দাঁড়ালাম— দেখলাম আবার সেই দেবী মূর্তি— বিভিন্ন ভৈরবী মূর্তি। সেই সব যোগিনী তারা— এদের হাতে ত্রিশূল আর ডমরু। ডমরুর শব্দ বুক ভেদ করে যাচ্ছে, আসছে বনের এই নিস্তব্ধ শব্দ থেকে। এসব দেবী বা যোগিনীদের আদিবাসী নাম শুনলাম।

আশ্চর্য আদিবাসীরা এক নামে ডাকেন। এখানে বলে 'কোলাই মাতা', 'মুসরে মাতা', 'নোহাজার মাতা'। আবার মনে আছে বোরি গাঁয়ে বাস্তারের অন্য এক গাঁয়ে শুনেছি ঃ

'চিতলা দেয়ী' এক কথায় বলে 'ডোক্রী' (বাং ছুঁড়ি)

'লিঙ্গাদেয়ী'	"	'ডোক্রী'
'কোদাই বুড়ি'	"	'ডোক্রী'
'দুলার দেয়ী'কে	"	'মুড়াকি মায়ী'
রাক্ষীণ	"	গল্পদেবী

(গল্পদেবীর গল্প আছে আরেকবার সে কথা হবে)

কারি কংকালিন্ ওদের ভাষায় পেন্দ্রাউন্দ্রিন বলে। (যদি কালী মা হন তবে আশ্চর্য আদিবাসীরা এর সামনে মূর্তি বলি দেয় না।)

এরা একবার আমাকে বলে যে, সব দেবদেবীর সামনে বলি হতে পারে কিন্তু পেন্দ্রাউন্দ্রিনের সামনে হবে না। ওরা যাকে বলে পেন্দ্রাউন্দ্রিন কখনও দুটি মূর্তি পাশাপাশি দেখেছি। সুতরাং এ বিষয়ে ওরা খুব ওয়াকিবহাল কিনা জানি না। আমার যা মনে হয়— ওরা সত্যি মুক্ত। তাই ২ / ৪টি ছাড়া নাম সম্পর্কে ওরা একেবারে মাথা ঘামায় না। কিন্তু খুব সমীহ, ভয় ও ভক্তি থাকে।

দন্তেশ্বরীকে কোদাই বুড়িও বলে।

ভাঙ্গারাম যদিও ভৈরম— কিন্তু তেলেগু ভাষায় ভাঙ্গারাম মানে সোনাও। কোন এক দেবীর নাম তেলেঙ্গীন। এরা সব ঘড়ুয়া যারা আমাকে নাম বলেছে— সুতরাং ভাষায় ওদের সঙ্গে মাড়েয়া মুরিয়াদের সঙ্গে কিছু তফাত আছে।

আবার দান্তেওয়াড়া— এরপর দুর্গম পথ, নালা ঢিবি ক্ষেত বন ভেদ করে সেই প্রান্তর। এই প্রান্তরের চারিদিকেই বন। পশ্চিমে শুধু উঁচু উঁচু পাহাড়। দিগন্তের কোল যেন ভৈরমগড়কে সমস্ত দুঃখ থেকে লড়াই থেকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি আপনি সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে এই পাহাড়গুলি। এই পাহাড়গুলিরই সামনাসামনি শুকনো উঁচু উঁচু ঘাসের উপর রাখা এই ২০টি মূর্তি। আগেই বলেছি এগুলি প্রত্যেকটিই পাথরের উপর খোদাই করা, যোদ্ধা মূর্তি। ২ থেকে আড়াই ফিট অন্তর রাখা। কোনটির হাতে তীর-ধনুক, কোনটির হাতে ঢাল, তলোয়ার, কেউ বা গদা আর ঢাল নিয়ে ছুটছে, কেউ বা

খড়্গ নিয়ে।

আদিবাসীদের 'চোর ভগবান' 'চোর দেওতা' এই শুনে আরও মনে হয়, যখন চোর দেওতারা এল—লড়াই করে মাড়েয়া, মুরিয়া, গণ্ডিয়াদের রক্ত বইয়ে দিল তখন কে এক মুরিয়া ভাস্কর ভাবল, রাতারাতি এদের মূর্তি বানিয়ে পুজো করে— এই চোর ভগবানদের খুশি করতে পারলে, হয়ত আর আমাদের রক্তপাত করবে না।

বনপথে এসে দাঁড়িয়েছি – বনপথ দিয়ে যাচ্ছে দুই আদিবাসী মেয়ে। সুতোর কাপড় আঁট সাঁট করে বাঁধা দেহের সঙ্গে। মুখগুলি হাসি-হাসি, ঢলঢলে। পিঠে বাঁধা ছেলে।

আবার ফিরছি জগদ্দলপুরে। দশহরার কদিন আগে থেকে রাজপ্রাসাদের কাছে আসতে থাকে আদিবাসীরা। কাঁধে মস্ত মস্ত কাঠ নিয়ে। ধবধবে সাদাসাদা ছোটছোট ধুতি, কখনও খালি গা কখনও একটি গেঞ্জি। অনেক লোক এল, গ্রাম থেকে গ্রাম— আদিবাসীরা মাথায় টুকরি, কাঁধে মস্ত মস্ত গাছে কাটা গুঁড়ি নিয়ে, কাঁধে পিঠে ছেলে নিয়ে। বৌরাও এসেছে স্বামীর সঙ্গে দলে দলে।

তারা কাঠ কেটে কেটে রথ তৈরি করেছে। যে কদিন ওরা রথ তৈরির জন্যে ব্যস্ত ছিল সে কদিন ঘড়ুয়া কামারদেরও দেখতে পাইনি। একদিন এরপরই শুনলাম রথ তৈরি হয়ে গেছে।

দশহরার দিন একটি বাড়ির তিন তলার উপরে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রাসাদের কাছেই এক ব্যবসায়ীর এই বাড়ি। উঁচুতে দাঁড়িয়ে অত লোক দেখে অবাক লাগল। কারণ সম্ভবত দশহাজার লোক কি তার বেশিও হবে— অথচ শব্দ এত কম।

একটু পরে দেখলাম শোনা যাচ্ছে, রথের পাথরে ঘষার শব্দ আর সেই সঙ্গে টানার শব্দ। সে দৃশ্য না দেখলে বোঝানো যাবে না।

রথ আসছে আসছে। রথ এল. রথের চাকার ধ্বনি ছড়িয়ে। মাঝে মাঝে আদিবাসীদের "জয় দন্ডেশ্বরী দন্ডেশ্বরী মায়ী কি জয়" বলে রব ওঠে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কথা মনে হলেও সে কবিতার শ্লেষ আমাকে স্পর্শ করেনি—

তখন আমার যা মনে হয়েছিল তাই চার ছত্রে লিখলাম।

পথ ভাবে আমি ধন্য চক্রেরে বহিয়া
লোক ভাবে ধন্য মোরা রথেরে টানিয়া
রাজা ভাবে প্রজা পুণ্যে মোর পুণ্য দেবী ছত্র লইয়া
অন্তর্যামী চুপ রহে সবারে আঁকড়িয়া

হাজার হাজার আদিবাসী এগিয়ে আসছে। রথ চলেছে টেনে। প্রবীর চন্দ্র ভঞ্জ দেও, রাজা, দন্ডেশ্বরীর রুপার ছাতা হাতে বসে। পরনে গৈরিক বসন। গলায় রুদ্রাক্ষের আর জবা ফুলের মালা। বড় বড় দুটি চোখ। তুলি দিয়ে আঁকা দুটি ভ্রূ। বিনীত— তাঁর পরম শক্তি ঈশ্বরীর ছত্র বহন— প্রজাদের জন্যে তাঁর এ আপ্রাণ কর্তব্য। তিনি সেখানে

প্রজাদের ভক্তির প্রতীক। তাদের সকল উপাসনা পরম শক্তিময়ীর, দণ্ডেশ্বরীর কাছে তিনি তুলে দেবেন।

আমি এমন করে সেই কুলপুরোহিত বীরেন্দ্র ভঞ্জ দেওকে দেখতে পেয়েছিলাম— কারণ একই উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাঁর রথ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল।

উপোষী রাজা ভক্তদের ভক্তি পৌঁছে দিচ্ছেন দণ্ডেশ্বরীর কাছে। সেই যে প্রজাদের এত স্নেহ করে ভালবেসে করে চলেছেন। আর হাজার হাজার আদিবাসী যেন বলছে তোমাকে আমরা ভালবাসি। আমরা ভগবানের ভাষা জানিনে, আমরা কিছু জানিনে, জানি তোমাকে, যে তুমি আমাদের কর্তব্যের ভার নাও— যে তুমি আমাদের চালাও।

পাঠক এইখানে আমাকে বলবেন, তুমি 'রিঅ্যাকসানারি'। না আমিও ঐ প্রজাদের মতো ঐ শত শত আদিবাসীদের মতো কিছু জানিনে। শুধু ওদের সঙ্গে আমার তফাত— আমি সমস্তটায় যে সৌন্দর্য আছে অবাক হয়ে দেখি। আমার সমস্ত দিয়ে এই সৌন্দর্যকে বেষ্টন করে থেকেছি। এই শত সহস্র আদিবাসীদের এক হওয়া তাঁদের রথ গড়া— তাদের দণ্ডেশ্বরীর ছাতা হাতে টানা। রাজার এই দীপ্তিময় ত্যাগী রূপ— প্রজাদের ঐ একান্ত ভালবাসা— রথের ফিরে আসার পর সেই প্রজাদের কুলপুরোহিতকে পুরনারীদের বরণ করে নিয়ে যাওয়া। দিকে দিকে কত কত প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল। কত শঙ্খধ্বনি। কত উলুধ্বনি হল। সবটা যেন এক অবিশ্বাস্য সঙ্গীত।

যখন রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে রাস্তা পার হচ্ছিলাম আমরা আরেকবার অবাক হয়েছিলাম— যে কোন ধাক্কা তো লাগেইনি। গায়ে গায়ে লাগেওনি।

আমি কিছুতে ভুলতে পারি না। সভ্য এ সব দৃশ্য যে সব আজকের দিনে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। (লুপ্ত করা হয়নি তো ?)

সময় চলে যায়— শুনি নাঙ্গাড়ার শব্দ, জোরে— শুনি দামামা উত্তেজিত হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল সৌন্দর্য। সে সব দৃশ্য ম্লান হতে লাগল।

একদিন মানিক, গণেশ এরা বলল, জান, আমাদের রাজাকে কষ্ট দেবে বলেছে। কিন্তু আদিবাসীরা বলেছে কিছুতেই ওসব হতে দেবে না।

দেশ স্বাধীন হবার পর একদল বিদেশি বাস্তারে ঘুরে বললেন— ছিঃ ছিঃ এসব কি সভ্যতা ?

তার আগে পণ্ডিত নেহেরুর সঙ্গে প্রবীরেন্দ্র ভঞ্জ দেও-র একটু গোলমাল লাগল। শুনেছি নেহেরু এক সময় বাস্তারের জন্যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রাখেননি। তাছাড়া কি একটা কারণে বাস্তারের রাজা আদিবাসীদের বলতে থাকেন কোন কোন বিষয়ে। এরপর বোধহয় ৬২ সালের গোড়ায় লোহাণ্ডিগুড়াতে গুলি চলে। দুজন আদিবাসী মারাও যান। রাজা সম্পর্কে নানা রকম কথা লোকে বলে থাকত— যেমন তিনি খামখেয়ালী ছিলেন।

তার আগে আমি আরেকটি গল্প শুনি তাঁর এবং নেহেরুর বিষয়ে। নেহেরু মধ্যপ্রদেশে

কোথায় যাচ্ছিলেন হয়ত জগদলপুর দিয়েই হবে— । রাজাও বেরিয়েছিলেন গাড়িতেই। নেহেরুর গাড়ি ভঞ্জদেওর গাড়িকে বাধা দেয়। তারপর ডেকে পাঠান ভঞ্জ দেওকে। ভঞ্জ দেও বলে পাঠান তাড়া থাকলে— নেহেরুই আসতে পারেন রাজার কাছে। নেহেরু এলেন না কিন্তু সেই থেকে শুরু হয় মৌন যুদ্ধের।

বিদেশি, স্বদেশি, বিজ্ঞানীদের পাঠিয়ে পাঠিয়ে খোঁজ নেওয়া হল। ফিল্ম ওঠানো হল। তারপর ঠিক হল, আদিবাসীদের তৎকালীন কুলপুরোহিত প্রবীর ভঞ্জ দেওকে সরিয়ে দেওয়া হবে। লাগিয়ে দেওয়া হল গোলমাল তাঁর নিজেরই ভাই অথবা আত্মীয় কারু সঙ্গে মাসা জাতিও কেউ হাত মেলালেন সরকারের সঙ্গে। আরম্ভ হল বিরক্তিকর পরিস্থিতির। আদিবাসীরা রাজাকে বলল— ভয় পেওনা রাজা— আমরা আছি। আমরা থাকতে আর তোমাকে কেউ কষ্ট দিতে পারবে না। আসা-যাওয়া শুরু হল প্রজাদের কাছে রাজার আর দলে দলে প্রজারা আসতে লাগল রাজপ্রাসাদে। কতদিন এসব চলল। কে একজন বলল রাজা গণনা করে জানতে পেরেছেন উনি আর বাঁচবেন না। ওঁকে খুন করা হবে।

একদিন দাণ্ডেওয়াড়ার সেই দন্তেশ্বরীর দৈনিক পুরোহিত আমাকে বললেন, রাজা দন্তেশ্বরীর সামনে উদভ্রান্তের মতো বসে থাকেন। সরকার ওঁকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। নিজের আত্মীয়রাও ওঁর বিরুদ্ধে গিয়েছেন।

এরপর আমি ফিরে আসি বাস্তার ছেড়ে। আসবার আগে দুঃখের ভেরি বেজে উঠেছিল তা শুনে এসেছিলাম।

২৭শে মার্চ রবিবার জগদলপুরের দণ্ডকারণ্য সমাচারে বেরোলো ইংরেজি ও হিন্দিতে — Pravir Killed.

খবরের কাগজ অনুযায়ী রাত সাড়ে তিনটের সময় পুলিশের গুলি থেমেছে যাঁরা সরকারি চাকুরে ওখানে কাজ করতেন তাঁদের মুখে শুনেছি— সোমবার মানে ২৮ তারিখ, মার্চ-এ দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত লোকে গুলি-বর্ষণ শোনে।

তাঁর মৃতদেহ এবং আরও আদিবাসীদের মৃতদেহ তাঁর ঘরে পাওয়া যায়। বহু বহু আদিবাসী রাজপ্রাসাদে তীর ধনুক বল্লম নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সবাই মৃত।

আরেকটা খবরে বেরোয়— ১২ জন পুলিশ-এর লোক S. A. F. Subidar Shri D. D, Suroti খুব জখম হয়েছেন এবং একজন তীরবিদ্ধ অবস্থায় মহারানী হাসপাতালে যান ও অস্ত্রোপচার-এর টেবিলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয় পাঁচহাজার পুরুষ মেয়ে, শিশু, বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে যেমন তীর, বল্লম, ধনু, টাঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে পুলিশের গাড়িকে আক্রমণ করে।

কিন্তু তার আগে প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও-র শুধু চিৎকার অত্যাচারিত হয়ে, শোনা যায় তাঁর ঘর থেকে।

শোনা যায় তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে বহু আদিবাসীদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাঁর ঘরের

দেওয়াল থেকে আড়াইশো বুলেটের দাগ পাওয়া যায়।

যাঁরাই তাঁকে দেখেছে ভালবেসেছে আদিবাসীদের সঙ্গে মর্মান্তিক শোকে তারা বিহ্বল হয়েছিল। তাদের সঙ্গে আমিও।

সে বার ভাদ্রমাসের শেষে আমি গেলাম জগদলপুরে।

অন্যছবি, অন্যছবি—বাস্তারকে অত্যাচার করেছে।

একটি মারিয়া মুরিয়াকে দেখতে পাইনি। সমস্ত আদিবাসীরা কোথায় পাহাড়ে পালিয়ে গেছে। এবার কোনও চাষ হয়নি। খাঁ খাঁ করছে শূন্য মাঠ। পড়ে আছে শূন্য দেশ। সন্ধ্যা হলে কোথাও থেকে তাদের গান আর শোনা যায়নি।

"ধীরে সায় রিলি রিলি রিলি"

মনে পড়ল চোর ভগবানদের কথা। 'চোর দেওতাদের'। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

জীবন থেমে থাকে না। চলে, যারা বেঁচে থাকে। আমি আবার চিলকুঠি গেলাম। গেলাম কোণ্ডাগাঁও। ঝিলিমিলি বোরি গাঁও। এসব জায়গায় কাজ করলাম। দেখা হল শ্রীরাম, জম্মুরাম, মঙলু, সিতাড়ি, ইত্যাদির সঙ্গে।

কাজ করতে করতে সব ভুলে গেলাম। ঢালাই করা হল। ওরা ধরমপুরাতে এসেও ঢালাই করল। তবুও পরে বুঝলাম তা যথেষ্ট নয়। অনেকবার অনেকবার ঢালাই করতে হয়। একেবারে নিজে না করলে হয় না। বুঝলাম আরও পরে।

দু-একটা মাঢ়াই হল। কোথায় সে আনন্দ ? সে নাচ ? এরা ভয়ে ভয়ে কথা বলে চুপি চুপি। কাঁধে করে নিয়ে যায় কলসির গাদা— ঘাম মোছে— অবিশ্বাস নিয়ে এদিক ওদিক দেখে— সন্ধ্যা না হতেই ফিরে যায় যে যায় ডেরায়।

মনে পড়ল আবার দলবেঁধে মেয়েদের গলার সুর

'ধীরে সায় রিলে রিরিলো রিরিলো
রিরিলোইয়ো রেরেলো।
ধানো বানা দেরে ও দাই
ধানো বানা দেবে ও দাই ॥'

জম্মুরামদের গাইতে বললে গেয়ে উঠত

'জয় রাম হরি পালক সুন্দরী
গাছ মূলে গঙ্গাবরি গঙ্গাবরি !

যা যারে হনু সিন্দি ডেঁয়ী কিরি সীত্যাকু দেখে আসিব সীত্যাকু ডেকে আসিব।'

ওদের এ গান শিখিয়েছে উড়িষ্যা থেকে হিন্দু পুরুতরা রামায়ণ থেকে রামায়ণ পাঠ করে।

জয়দেব বলল, দিদি কত কী হয়েছে। দুঃখের উপর কষ্টের না মজার ব্যাপার ?

একবার শোনা গেল হঠাৎ, রাজা মরেননি। রাজা ফিরে এসেছেন। এসে একটা অন্ধকার মতো জায়গায় কোথায় শহরের একটা চাপা জায়গায় ঝোপড়ি বেঁধে বসেছেন।

এ খবর দেখতে দেখতে সমস্ত বাস্তারে রটে গেল আর ক্রমে ক্রমে এসে সমস্ত আদিবাসী

ঝোটিয়ে পাহাড় গাঁ সব জায়গা থেকে এসে উপস্থিত হতে লাগল।
প্রথম কদিন তারা হাত জোড় করে চোখের জলে ভাসত। আর রাজামশাই সাধুর বেশে অন্ধকারে বসে বসে বলত, তোমরা রাম নাম কর। তার চেয়ে ভক্তি আর কিছুতে নেই। আর পশুপক্ষী যা আছে— আর খেও না। সব শেষ করে দাও।
কিছুদিন মুরগির মাংসের দাম খুব কমল। এরা দলে দলে যার যা পশুপক্ষী ছিল বেচে দিল।
সবাই প্রায় কণ্ঠী পরবার মতো। মাস ২/৩ দিন পর আরও কিছুদিন পর কি করে আস্তে আস্তে বুঝল ঐ রাজা আসল রাজা নয়। আস্তে আস্তে নিজেদের জীবনে ঘুরে এল।
এমনি করে কতরকমের সমস্যা পুরাকাল থেকে ওদের জীবনে এসেছে। মরেছে, মেরেছে, পালিয়ে গেছে। বিপদ কমলে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।
ওদের জীবন না জেনে, না বুঝে ওদের আমরা সভ্য করতে যাচ্ছি। ঠিক যা আমাদের উপর হয়েছিল। আমাদের শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, বাইরে থেকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা বুঝতে না পেরে আমাদের উপর যে শিক্ষা আরোপ করেছিলন এবং যার জন্যে আজকের আমাদের মধ্যে এতরকম সমস্যা। ঠিক তাই আমরাও আদিবাসীদের উপর করতে যাচ্ছি।
কিন্তু ভোলা যায় না মাড়েয়া, মুরিয়া, গোণ্ড আদিবাসীদের জীবনের ছন্দ— ভোলা যায় না এদের নৃত্য, ভোলা যায় না এদের মেলার সুর। চলেছে এদের জীবনকে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ভোলা যায় না এদের পাথর আর কাঁসার মূর্তি। □

Space donated by a well wisher

Space donated by
HARAT TRANSPORT SERVICE

'তেরো নদীর পারে' ছবিটি বারীন সাহা শুরু করেন ১৯৫৯ সালে। আজ এই তেত্রিশ বছর পরেও লিটল ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায়, চলচ্চিত্রপ্রেমীদের আড্ডায় তাঁর নামটি উচ্চারিত হয় প্রথমত ওই ছবিটির জন্যই। সাহিত্যে যেমন প্রতিষ্ঠিত, বাণিজ্য-সফল লেখকদের সমান্তরাল কিছু ব্যক্তি-লেখক আছেন যাঁদের প্রায় কেউ চেনে না, জানে না, অথচ যাঁরা জনদৃষ্টির আড়ালে সাহিত্যের বিকাশ ঘটিয়ে চলেছেন, চলচ্চিত্রে ঠিক সে-রকম ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া কঠিন। মাধ্যমটি ব্যয় বহুল বলেই হয়ত তা দুরূহ হয়ে পড়ে। বারীন সাহা এই দুরূহকে সম্ভব করে তুলেছিলেন। ম'লে পরে চিতায় মঠ তোলার যে বাংলা ঐতিহ্য বারীন সাহার ক্ষেত্রে তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ এখনও আমাদের হাতে আছে। সরকার তো কতজনকেই টাকা দিল ছবি তুলতে। বারীন সাহা কেন এই বাম রমরমাতেও সে সুযোগ পেলেন না। চলচ্চিত্র নির্মাণ নৈপুণ্যের কথা না-হয় বাদ দেওয়া গেল। কমিউনিষ্ট পার্টি করার অর্থ যখন দারিদ্র, কষ্ট ও পীড়নের মধ্য দিয়ে যাওয়া, জেল খাটা—বারীন সাহা তো সেই যুগের কমিউনিষ্ট!

পঁচিশ বছর বয়সেই রাজনীতির উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়াটা ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি ১৯৫২ সালে ফ্রান্সে গিয়ে চলচ্চিত্র নিয়ে পড়াশুনো করা. 'ছিন্নমূল'কে গুরুত্ব দেওয়া, স্টুডিওর পুরোপুরি বাইরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়া এবং তাঁর শিল্পী-সুলভ গোঁ। যে শিল্পী ব্যবসায়ী নন তাঁর কাজ করার সুযোগ না থাকাটাই তো স্বাভাবিক। বারীন সাহা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের সেই তাঁতি হয়ে গেলেন, যিনি আর কাপড়ই বোনেন না

গুটিকয় তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন বারীন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙার 'ভেড়ি' নিয়ে একটি ছবি করতে বলেন। তৈরি হয় 'ভাসা'। রাজনীতির পট বদলে যায়, কংগ্রেস সরকার 'ভাসা'-র দিকে ফিরেও তাকায় না। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রথম যুক্তফ্রন্টের কালচার মিনিষ্টার বুদ্ধদেব বারীন সাহাকে ডেকে বললেন 'ছবিটা রিমেক করুন।' বারীন জানতে চাইলেন, 'কোথায় ত্রুটি বলুন', গদির বলে বলীয়ান মন্ত্রীর কথাই শেষ কথা, যুক্তি বিশ্লেষণ এসব কথা আসে কোথা থেকে। মানুষটা তো বারীন সাহা, স্বর্ণ-ময়ূর শিকারি খবরের কাগজের কালচার পেজের এডিটরের এয়ার নন, সুতরাং তিনিও কলা দেখালেন। তথ্যচিত্র আরও একটি করেছেন 'চেনচু'। তবে লোকে যখন ফিল্ম করে টাকা কামায় বারীনের সেখানে শুধু বেড়ে গেল ঋণের বোঝা। ফিরে গেলেন পঁচিশ বছর বয়সের আগের জীবনে। এখন দলীয় রাজনীতির তকমা, দড়ি এসব নেই। আছে গ্রামের মানুষ। বারীন সাহা নামে সাতষট্টি বছরের এক প্রবীণ কাদা ভেঙে এখনও গ্রামের রাস্তায় হাঁটেন, এখন তাঁর গৌরবোজ্জ্বল পরিচয় হল : সমাজকর্মী। বারীন সাহার যে দু-টি রচনা ছাপা হল তাতে ইংরেজি বাংলার একটা সংমিশ্রণ পাঠক লক্ষ করবেন। পাঠে হয়ত কিছুটা বিঘ্নও সৃষ্টি করবে এই ভাষা। বারীনবাবু মুখে-মুখে বলে গিয়েছেন পরে সেই বক্তব্যকে একটা আকার দেওয়া হয়েছে। লেখার এই পদ্ধতি এবং বারীন সাহার ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের আধিক্যেই ভাষা এরকম দাঁড়াল। অন্যরকম করলে শুধু অনুবাদ-অনুবাদ হয়ে যেত তাই নয়, সাবলীলতাও মার খেত।

বারীন সাহা

চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—১

আজকাল সব বিষয়েই নন্দনতত্ত্বের ছাপ বা ছক বার করা হচ্ছে, অতএব সিনেমায় নন্দনতত্ত্বের সন্ধান বিচিত্র নয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজে আমরা লাবণ্য অনুসরণ করে সংযোজনা করতে পারছি। সুদৃশ্য ছবি, সুন্দর নরনারী, নানা শব্দ ও রঙের বিচিত্র সমাবেশ, বিশেষ সুখকর সংলাপের মধ্যে লাবণ্য খুঁজে পাব না—একথা নিন্দুকের। কথা হচ্ছে, খুব বেশি করে পাচ্ছি, ও যা পাচ্ছি তা পরস্পর বিরোধী। আমরা সকলেই যেমন উপন্যাস পড়ে বলি লেখক সত্যি প্রথম শ্রেণীর লেখক, বা লেখক লিখতেই শেখেননি। কবিতা পড়ে বলি, কবির এ কবিতা কণ্ঠে তুলে নিলাম; বা এত দুর্বোধ্য, বাজে কবিতা ছাপা হয়েছে কেন? নাটক দেখে নাট্যকারের প্রশংসায় মুখর হই বা মুণ্ডপাত করি। অভিনেতার গুণ ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ হই; বা কেন এই অভিনেতাকে এ পার্ট দেওয়া হল তার কৈফিয়ত চাই। মোট কথা, আমাদের মতপ্রকাশ, নন্দনতাত্ত্বিক ভাল লাগা বা না লাগা বড়ই বিরোধী। মাপকাঠি এমন স্পষ্ট যে সকলে তা ব্যবহার করতে পারে ও বিষয়বস্তু এমন যার কালেরও পরিবর্তন হয় না। সাহিত্য, নাটক, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও চলচ্চিত্রের বিচারে এমন কোনো স্পষ্ট মাপকাঠি আছে কিনা, ও বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত থাকতে পারে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে ও হচ্ছে। আমরা এখানে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব এই প্রকার রস-বিচারের পরিমাপ সূত্র ও বিষয়বস্তুর মান নির্ণয় কীভাবে হতে পারে—বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে। আমরা ধরে নিচ্ছি চলচ্চিত্র যদি রসগ্রাহ্য সৃষ্টি হয় তবে অন্যান্য রসগ্রাহ্য সৃষ্টির সঙ্গে তার স্বরূপগত মিল থাকবে।

প্রথমে সাহিত্যে রসসৃষ্টির বিচার আলোচনা করি। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের লেখা। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা বয়স্ক তাঁরা মনে করতে পারবেন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকেও অনেক সংস্কৃত ও বিদেশী সাহিত্য-অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রবীন্দ্র-কাব্যকে উপেক্ষা করতেন। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক পর্যায়ভুক্ত করা হয়। অতি আধুনিক যুগে রবীন্দ্র-কাব্যের সমাদর নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠেছে। আমরা বলতে পারি মাপকাঠিও বিষয়বস্তুর তিন যুগে বিভিন্ন, নয়তো এমন বিরোধী মত পেতাম না। প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞ সমালোচকরা শব্দবিন্যাস ও কৌশলের দিকে নজর দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাই রবীন্দ্র-কাব্যে তাঁদের অভ্যস্তরূপ না পেয়ে তাঁরা কাব্যে তৃপ্ত পাননি।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তাঁদের ভিন্ন ছক যেহেতু তাই তাঁদের মাপকাঠি ও বিষয় মান অনুযায়ী বিচার দ্বিতীয় যুগে অগ্রাহ্য হল। এখানে বাংলা ভাষার সংস্কৃতের বন্ধন থেকে মুক্তি ও তার স্বাধীন প্রকাশ বড় কথা হল এবং বিষয়বস্তুতে রোমান্টিক মনের প্রকাশ ও বিস্তার প্রাচীন সংস্কৃত অনুমোদিত বিষয় থেকে পৃথকীকৃত করল, মানও হল আলাদা। তৃতীয় যুগে এল বিদেশী আঙ্গিকের প্রভাবে রবীন্দ্র-আঙ্গিক অত্যন্ত সীমিত বলে ধারণা ও রবীন্দ্রকাব্যের মধুময় জীবন সম্বন্ধে বিষয়গত মতভেদ। এখানেও তাই মতের অমিলের কারণের আভাস পাওয়া যায়, সত্যাসত্য বিচার পরের কথা। সঙ্গীতের কথা ধরা যাক। প্রথম যুগে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত গান বলতে কালোয়াতিই বোঝাত। রোমান্টিক মনের স্থায়িত্ব এলে, তৃতীয় দশকের মধ্যভাগ থেকে, রবীন্দ্রসঙ্গীত শব্দগত, অর্থগত রোমান্টিক মনের সীমাহীন পরিধির বার্তার কথা স্পষ্ট হল। আবার এই রোমান্টিক মনে ফাটল ধরাতে দ্বিধা-বিভক্ত মন একবার ধ্রুপদী, একবার আধুনিক-বিকৃতির অনুসরণ করেছে। এখানেও মাপকাঠি ও বিষয়ের মানের কথা আসে। প্রথম যুগে সঙ্গীত ছিল শব্দের কৌশলী সঠিক প্রকাশ, মনের অন্তরতম কন্দরের লুকানো ভাবের, ব্যক্তিগত নয়, সার্বিক অরূপ-প্রকাশ। দ্বিতীয় যুগে এল বিষয়বস্তুর প্রাধান্য, ব্যক্তিগত গোপন ধন রহস্যের আবরণে অর্ধোন্মুক্ত করে দেখা দিল। মাপকাঠির ভিন্নতা হল কৌশল ও বিষয়বস্তুর নির্ণয়ে। তৃতীয় যুগে এই বিষয়বস্তু আরও বড় হয়েছে। আমরা বিচারের বিভিন্নতায় মাপকাঠির ও বিষয়বস্তুর তারতম্য দেখি।

এবার চলচ্চিত্রের বিষয় আলোচনায় আসি। এখানে কলাকৌশল যন্ত্র-সাহায্যে প্রকাশ পায় ও যন্ত্র ভাল হলে শব্দ ভাল হওয়া স্বাভাবিক ; উন্নত ক্যামেরা থাকলে ছবিতে নানা ভাব সংযোগও সম্ভব। অর্থাৎ সাহিত্যিকের শব্দ কৌশল, প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য এখানে হল উন্নত যন্ত্রের সদ্ব্যবহার।

তাঁদের শিল্পকৌশল আয়ত্তের দৈহিক ব্যক্তিগত সাধনা এক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বলা যায়। অর্থাৎ যন্ত্রের পরিধি সীমা ও কার্যক্ষমতা জানা থাকলে তার সদ্ব্যবহার যন্ত্রশাসন মাত্র।

বিষয়বস্তু সম্বন্ধে এখানেও স্তরভেদ দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় চলমান চিত্র কেবল দর্শককে চমকিত-বিস্মিত করে মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রচলিত উপন্যাস, নাটক বা ঘটনাকে যথাযথ প্রকাশ করে সাধারণের মনোরঞ্জন করা হয়েছে। তৃতীয় অবস্থায় চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু উপন্যাস, নাটক ও যথাযথ ঘটনা প্রকাশ নয়, এমনকি দর্শকের মনোরঞ্জনও এর প্রথম কথা নয় এমনি একটা মনোভাব দেখা দেয়। যান্ত্রিক মান-নির্ণয় সোজা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে প্রায় প্রতিবারই এই মুদ্রিত পৃষ্ঠার দৈর্ঘের মতোই স্থির।

গণ্ডগোল বিষয়বস্তুর প্রকাশ নিয়ে। প্রথম স্তর আলোচনার বিষয়ীভূত নয়। দ্বিতীয় স্তরে মাপকাঠি বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত নয়, অন্য বিষয় বা রসসৃষ্টি থেকে গৃহীত। এখানে

মাপকাঠির যন্ত্রগত ক্ষেত্রে প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হলেও বিষয়ের মাননির্ণয় ক্ষেত্রে অন্য-রস-গৃহীত-মান অযৌক্তিক। তৃতীয় স্তর, নবীন মানের প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ ছবির বিচার এখনও ঠিকমত হয়নি। যা হয়েছে, তা অন্য রস সৃষ্টির বিচার-মান-দ্বারা বিচার ; যে বিচার মূলত অগ্রাহ্য।

নতুন বিচার মানের কথা আলোচনা করি। প্রথমে আসে ক্যামেরার কথা। এই যন্ত্রের ক্ষমতা সীমাবন্ধ ও সুনির্দিষ্ট। এই সীমাকে স্বীকার করে যা কাজ হয় তাতে যদি প্রয়োজনীয় বস্তুর সীমিত প্রকাশ সম্পূর্ণ হয় তবে ক্যামেরার কাজ পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। অর্থাৎ ক্যামেরাম্যানকে যা বলতে বলা হয়েছে ছবিতে যদি ক্যামেরার প্রকাশগণ্ডী মেনে নিয়ে তার স্বচ্ছ প্রকাশ পাই তবে ক্যামেরার কাজ সার্থক হয়েছে বলা যায় ; সূক্ষ্মভাবে এর মাপ সম্ভব। তারপর ধ্বনির কথা। এ বিষয়েও ওই এক কথা। এরপর আসে বিষয় নির্বাচন। অর্থাৎ কী ছবি তোলা হবে ও কেন ? এতদিন এ-বিষয়ে দ্বিমত ছিল না যে সিনেমাতে একটা গল্প থাকবে। অর্থাৎ সিনেমা, উপন্যাস, নাটক বা ঘটনার বন্ধন মেনে নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করবে, হবে তাদের চিত্রগত প্রকাশ। শিল্প-কলায় এ বন্ধন নেই, সঙ্গীতে এ বন্ধন অগ্রাহ্য। সিনেমায় এ বন্ধন থাকবেই তার যুক্তি কী ? কথা ওঠে তবে সিনেমা কী প্রকাশ করবে, কী বলবে দর্শককে ? যা বলবে তা হয়ত পরিচালকের মনের কথা। অর্থাৎ সার্থক ঔপন্যাসিক যেমন তাঁর মনের ছাপ দিয়ে অলক্ষ্যে এক বিশ্ব গড়ে তোলেন যা প্রত্যহের ম্লান স্পর্শ-জাত হলেও পঙ্কজের মতো অমলিন, যার সান্নিধ্যে এসে ধূলি-ধূসরিত মলিন জীবন নতুন নির্মল জীবনের স্বপ্ন দেখে, পরিচালক এমন এক মহান জীবনের পাশে আমাদের পঙ্গু জীবনকে স্থাপিত করেন যা জীবনের পঙ্গুত্ব, হীনতা, নীচতা, অক্ষমতার সমস্ত আভরণ মুক্ত করে আমাদের মন-মুকুরের সামনে দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করেন। এখানে বিষয়-মান হবে জীবন-বিচার। তা মেনে নিলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সত্য অর্ধসত্য ও মিথ্যা অনুযায়ী এর বিচার আলাদা হবে।

এই আলোচনায় যে মাপকাঠির আভাস পাচ্ছি তা এই : সিনেমার প্রকাশ রীতি যান্ত্রিক। এখানে অর্থ, কৌশল, উন্নত যন্ত্রই মান নির্ণয় করবে এবং এ মান প্রতিটি অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে আজও যেমন কালও তেমন। বিষয়বস্তুর মান সম্বন্ধে দেখা গেল সিনেমায় চিত্র বা সঙ্গীতের মতো বিষয় হয়ত অবান্তর, বা সামান্য লক্ষণমাত্র। আমাদের বর্তমান বিচারে এই গল্পাংশ ও তার প্রকাশই বড় কথা হয়েছে ও সিনেমার এ রূপ অত্যন্ত সীমাবন্ধ ও তার সম্ভাবনার মাত্র ক্ষুদ্র অংশজাত। এখন নতুন রূপ স্পষ্ট নয়, কাজেই বিচার চলছে অন্য সৃষ্টির রীতি অনুযায়ী যা যুক্তিগতভাবে অগ্রাহ্য। ফলত এখনও সিনেমার প্রকৃত জন্ম হয়নি, বিচার বিচাররূপে অপ্রয়োজনীয়, নবতর সম্ভাবনার সূচক হিসাবেই এসব ব্যক্তিগত বিচারের প্রয়োজনীয়তা। □

রচনাকাল : ১৯৬৩

১৯৬৩ সালে 'দর্শক' পত্রিকায় এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৯৯১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত বারীন সাহা ফিল্মের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কোথাও এক লাইনও লেখেননি। শুধু তাই নয় উনি এটা মেনে নিয়েছেন 'আমি লিখতে পারি না।' তবু আমরা তাঁকে লেখার অনুরোধ করি। বারীন বললেন, 'এসো আড্ডা মারা যাক।' অর্থাৎ আমরা আলোচনা শুরু করলাম। চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—২ সেই আলোচনা থেকে ছেঁকে তোলা।

—সম্পাদক

চলচ্চিত্র ও নন্দনতত্ত্ব—২

১ : নানা মুনির নানা মত

আর্ট, আর্টিজান ছাড়া হয় না, কিন্তু সব আর্টিজান আর্টিস্ট নয়। ব্যতিক্রম আছেই। একটি পর্যায়ে গেলে আর্টিস্ট হওয়া যায়— যদিও এর নির্দিষ্ট কোনো নিরিখ নেই। আদিম শিল্পে যেমন দেখা গেল কলসী তৈরি করা হচ্ছে— সবই একরকমের। একটা একটু অন্যরকম। তখন খোঁজটাই হল— কেন এটা অন্যরকম। এখানেই প্রকাশের প্রশ্নটি এসে যায়। কেউ হয়ত চেয়েছিলেন কিছু একটা প্রকাশ করতে। তার সঙ্গে সাধারণ কারিগরির পার্থক্য দেখা গেল। তবে, কারিগরি না থাকলে হবে না। ক্রাফট্‌সম্যান-শিপ। একজন ভাল লেখকের ক্ষেত্রেও তার কথার একটা ক্রাফট্‌সম্যানশিপ, কারুকাজ থাকা উচিত। কিছুদিন আগে নাইপলের লেখা পড়ে এই কারিগরির আভাস পেলাম। ওঁর সম্পর্কে একজন সমালোচকের মন্তব্য : 'হি হ্যাজ নেভার রিটেন এ ব্যাড সেনটেন্স'। অবশ্য, শুধু তাতেই যে তিনি একজন মহান লেখক হয়ে যাবেন সেকথা বলা যায় না। ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করেছেন তিনি কিন্তু একটিও সদর্থক কথা বলেননি। যার জন্যে আমি ওঁকে নিহিলিস্ট বলে থাকি।

ইওরোপের ফিল্ম-প্রশিক্ষণে একদিকে যেমন ফিল্ম-এর ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি পড়ানো হয়, তার সঙ্গে কারিগরি বিদ্যাও শেখানো হয়।

ইওরোপে ফিল্ম-এর ক্লাসে পুরনোদিনের নানান ছবি দেখানো হত, যেগুলো ফিল্মের ইতিহাসে 'ল্যান্ডমার্ক' হিসাবে চিহ্নিত। এই ছবিগুলো ওদেরই— ওরাই করেছে ছবিগুলো— ওরাই 'ল্যান্ডমার্ক' বলছে। আগে ওরা আবিষ্কার করেছে, আমরা পরে নিয়েছি। ক্রিকেটের মতো। আমরা যারা বিদেশের ছাত্রছাত্রী ছিলাম, আমাদের কাছে — কখন কী অবস্থাতে একটা ছবিকে 'ল্যান্ডমার্ক' বলা হচ্ছে— তা পরিষ্কার ছিল না। বছরে হয়তো দেড়শো / দু-শো ছবি দেখলাম, সেগুলো সম্পর্কে প্রফেসরদের বক্তব্যটাই শুনতাম, নিজেদের কোনো ক্রিটিকাল ফ্যাকাল্টি গড়ে ওঠেনি। আর তখনকার

দিনের খারাপ ছবিগুলোও দেখিনি। যখন সাম্প্রতিক কালে চলে আসি আর তার সঙ্গে পুরনো দর্শনের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করি তখন ছবিটা অন্যরকম হয়ে যায় নিজের কাছে। অনেক তফাত হয়ে যায়। আমার নন্দনতত্ত্ব আর আরেকজনের নন্দনতত্ত্ব যে একরকমই তার কোনো মানে নেই। ফিল্ম নিয়ে আলোচনা করার অর্থ শুধু ফিল্মের কারিগরি নিয়ে আলোচনা নয়। ধরা যাক আমি একটা সোস্যাল স্যাটায়ার করলাম কি সমাজের একটা চিত্র তুলে ধরলাম, দেখতে হবে চিত্রটা কী হওয়া উচিত, কোথায় তার উড়ান বা উল্লম্ফন (ডিপারচার) হয়েছে, কোথায় মনগড়া হয়েছে ইত্যাদি। এবারে দর্শনের প্রশ্নও আছে,— বাহ্য, বহির্বস্তু আর অন্তর্বস্তুর বিচার। যেটা আমি দেখছি সেটা করছি— আমার দেখাটা আত্মগত (সাবজেকটিভ)। আর একজন যদি অন্যরকম ভাবে দেখে তাহলে সে আমায় 'সাবজেকটিভ' বলবে না। ইংরেজিতে বলে 'পীয়ার অ্যান্ড পল' থিওরি। একটা রঙ দেখে পীয়ার ও পল দুজনেই বলল, 'হলদে'। তাহলে দুজনকেই 'অবজেকটিভ' বলব। কিন্তু একজন 'হল্‌দে' আর একজন 'লাল' বললে দুজনকে 'সাবজেকটিভ' বলব। আসলে শিল্পের নৈর্ব্যক্তিকতা বলে কোনো জিনিস নেই। আমি কীরকমভাবে দেখছি, সেটা যদি আর পাঁচজনকে দেখাতে পারি তাহলেই আমি সফল। কিন্তু সেটা নন্দনতত্ত্বের দিক থেকে কতখানি ওতরাচ্ছে ? হঠাৎ একটা জিনিসকে বললাম 'মাস্টারপিস্'। পাঁচটা ছবিকে 'ভাল' বলছি— আর একটাকে 'মাস্টারপিস'। কেন? মাস্টারপিস আর কিছুই নয়— একটা পারটিকুলার সময়ে যে সমস্ত চেষ্টা হচ্ছিল, কোনো একটায় তার সবকটা শৈল্পিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেল— সেটাই মাস্টারপিস। গুয়োর্নিকা যেমন, অনেকদিন ধরে, অনেক রকমের চেষ্টা হতে হতে নতুন দিশার এক উন্মোচন (ব্রেক-থ্রু)। একটা আবিষ্কার— যা পরে একজন কেউ করলে তা আর আবিষ্কার থাকে না।

নন্দনতত্ত্বের বিচারও অনেকরকম হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস দেখার পর আমার 'ভাল লেগেছে' বা 'খারাপ লেগেছে'— এটাই চূড়ান্ত কথা। ওই অস্তিত্ববাদীরা যেমন ধরে নেয়— 'আই অ্যাম দি সেন্টার অব দি ওয়ার্ল্ড।' বিশ্বের কেন্দ্রে কেবল আমিই।

২ : এক তরকারি নুনে পোড়া!

আর একটা জিনিস হল— যা দেখেছি সেটাকে পর্দায় নিয়ে আসা— এ এক বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ। ইওরোপেই আমি এই প্রশিক্ষণ লাভ করি। এ কেবল যন্ত্রকুশলতা অর্জন নয়। এর মধ্যে নানা রকমের নান্দনিক শিক্ষাও ছিল। অর্থাৎ ফোটোগ্রাফি হোক, ফিল্ম-ফটোগ্রাফি হোক, অথবা গল্প বলার মধ্যেই হোক, বা টোটাল ফিল্ম-এর স্ট্রাকচার-এর মধ্যে দিয়েই হোক— যা দেখছি সেটা তুলতে পারাটাই আসল কথা।

ইওরোপে ফিল্ম-স্কুলে পড়ার সময় ওখানকার মাস্টাররা ফিল্মের শুদ্ধতা নিয়ে অনেক জিনিস মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। রোজই বক্তৃতায় শুনতাম—এটার মধ্যে খানিকটা থিয়েটার আছে, ওটার অভিনয় ভাল—এইসব। এই শুদ্ধতার বিষয়টি আমার ছবি 'তেরো নদীর পারে'তে আছে। মানে ছবিটির গল্পের মধ্যে।

বাইরে থেকে দেখলে গল্পটা হল—একটা সার্কাস চলছিল। কিন্তু তা দেখে কেউ আমোদ পাচ্ছিল না। কারণ সেখানে কখনও জন্তু-জানোয়ারের খেলা দেখানো হয়, আবার যখন জন্তু-জানোয়ার নেই তখন শুধুই অ্যাক্রোবেটিকস দেখানো হয়—বিভিন্ন সব খেলা দেখানো হয়। উনিশ পয়সার টিকিট, গায়ে লাগে না, লোকে তাই এসে দেখছিল। তা একটি মেয়ে সস্তায় পাওয়া গেল। হাতি কি বাঘ অত সস্তায় পাওয়া যায় না। এখন যে ক্লাউন ছিল, যে এমনি করেই এখানে সারা জীবনটা কাটিয়েছে হঠাৎ তার একটা সংকট আরম্ভ হল—'তাহলে তো আমার কোনো দাম নেই, মেয়েছেলেটাই পয়সা পেতে পারে।' এই ছিল গল্প। আমার কাছে গল্পটা হল—যে যত গরিব দেশ আমরা দেখি, সেখানে তারা নানারকম পদ রান্না করে না। একটাই এমন পদ রান্না করে যার মধ্যে সব থাকে। যদি একটা তরকারি খেল তো তার মধ্যে একটু মাংস দিয়ে দিল। একটু মশলা বা তেল দিল, এটা ওটা দিয়ে একটাই প্লেট তৈরি করল। আমাদের দেশে যেমন খিচুড়ি কিংবা ঘ্যাঁট রান্না হয়। আমাদের দেশের আমোদ বা বিনোদনের অবস্থাও এরকম। এখানে যেই আপনি খুব বিশেষে (স্পেসিফিকেশনে যাচ্ছেন, ধরুন শুধু সার্কাস করছেন, হবে না। আমাদের যাত্রা যেমন অপেরা আর নাটকীয়তা দুটোই মেশানো। আর যাত্রার থিয়েটার-পার্ট'টা মেলোড্রামাটিক—তাতে প্রচুর চিৎকার করা হয়। দর্শক দূরে থাকে বলে চওড়া মেক-আপ দিতে হয় যাতে আলো ফেললে অনেক দূর থেকে বোঝা যায়। সূক্ষ্ম জিনিসটা বাদ দিতে হয় যাত্রার মধ্যে। এই সমস্যাটা সব জায়গাতেই আছে। দিস ওয়াজ দি প্রবলেম ডেলট্ ইন মাই ফিল্ম। আমার ছবি 'তেরো নদীর পারে'র বিষয় বা থিম বলতে এটাই। এই সমস্যাটিকেই ধরা হয়েছে। অর্থাৎ, বিশুদ্ধ শিল্পের আঙ্গিক চলে না।

স্থূল আর সূক্ষ্মের এই দ্বন্দ্ব—ছবি করার সময়ে এই বিষয়টাকে আমার দেশের সমস্যা হিসাবেই আমি ভেবেছি। পরে এটা আমার সমস্যা হয়ে গেল। অর্থাৎ বিষয়টা তখন হয়ে গেল স্থূল-সূক্ষ্ম দ্বন্দ্বের মাঝখানে একজন ফিল্ম-মেকার হিসাবে আমার সমস্যা।

৩. ইমেজ+সাউণ্ড নাকি ইমেজ এবং সাউণ্ড

নামটা ভুল হতে পারে সম্ভবত আর্লহাইন ১৯৩২ (?) সালে বলেছিলেন 'টকি'র যথার্থতা তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, যদি ইমেজ আর সাউন্ড-ট্রাক দুটো আলাদা স্তরে (ডিফারেন্ট প্লেনে) ব্যবহার করা যায়। প্রথমে উনি টকির বিরুদ্ধে ছিলেন। পরে মত পাল্টে বলেন যে একমাত্র দুটো ডিফারেন্ট প্লেন-এ গেলেই টকি শিল্পের পর্যায়ে যেতে পারে। মুখের ভাষায় যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তার জন্য একটা আলাদা স্তর (ওর‍্যাল প্লেন) থাকবে ;

যেটা সাউন্ড-ট্র্যাক এর মধ্যে থাকছে। সেটা মিউজিক হতে পারে বা কথাও হতে পারে। সাধারণত বাংলা সিনেমায় যা দেখি তাতে সাউন্ড আর ইমেজ-এর মধ্যে একটা সাপ্লিমেন্টারি আর আরেকটা কমপ্লিমেন্টারি হিসাবে রোল প্লে করে। অর্থাৎ কোনো জায়গায় মনে হল যে ইমেজটা ডেফিসিয়েন্ট—তাতে অ্যামবিগুইটি আছে—সেই অ্যামবিগুইটিকে মারতে সাউন্ড ব্যবহার করা হল, একটা মিউজিক বা ডায়লগ দেওয়া হল। এইভাবে একটা জিনিসের উপর জোর দেওয়া হল। একে সাপ্লিমেন্টারিও বলা যায় বা কমপ্লিমেন্টারিও বলা যেতে পারে। এ ধরনের জিনিসই প্রচুর। আর একটা হল ইনসিডেন্টাল ব্যবহার, একজন পেয়ালাটা রাখল তার আওয়াজ হল। তাতে একটা সাউন্ড দিতে হল।

আমার ঘরে বসে কেউ কথা বলছেন, সেখানে গ্যালিলিয়ান সায়েন্সের মতো সাউন্ড এর ব্যবহারকে জাসটিফাই করতে হবে—অন্য জায়গার সাউন্ড এখানে আসতে পারে না—বাহ্যত ব্যবহারটা এভাবেই হয়ে থাকে। ফিল্মকে জাস্টিফাই করতে গেলে সাউন্ড এবং ইমেজ একই সঙ্গে রয়েছে—এটা হতে বাধ্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাউন্ড-ট্র্যাকটা সব সময় 'কনডেম্‌ড উইথ দি ইমেজ' হবে। সমস্ত সাউন্ড-ট্র্যাকই ইমেজের তলায় চাপা পড়ে যাবে এমন কিন্তু নয়।

এখানে আর্নহাইনের কথাটা আসছে। উনি চাইলেন একই জিনিসকে অন্য স্তর থেকে ধরতে। এটা একেবারেই উপলব্ধির ব্যাপার। এমনিতে বোঝা শক্ত তবে ছবি দেখলে বোঝাটা খুবই সোজা হয়ে যায়। রাগ্রিয়ে বা রেনের ছবিতে এর ব্যবহার আছে। 'হিরোশিমা মন আমর' বা 'মারিয়েন বাগ' এ দেখা যাবে কোনো কোনো জায়গায় কমেন্ট্রিতে চলে যাচ্ছে, কোথাও একটা সাউন্ড ভেসে আসছে—এই জায়গাটা খুবই মানসিক, মনস্তাত্ত্বিক।

সাধারণভাবে, ইমেজটাই সাউন্ড-ট্র্যাক নির্ধারণ করে দেয়। গ্রাউন্ড রিয়্যালিটির ব্যাপার আছে। একটা লরি চলে গেল—তার সাউন্ড তো দিতেই হবে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি সেখান থেকে বের হতেই না পারি, দরকার হলে লরির আওয়াজকে চাপা দিয়ে একটা মিউজিক বা একটা ডায়লগ যদি সেখান থেকে না বের করি, তাহলে আর শিল্প হচ্ছে কোথায়?

আমাদের বাংলাদেশের প্রগ্রেসিভ ফিল্ম-মেকাররা ইমেজের ওপরেই জোর দিয়ে যাচ্ছেন। ওই সাপ্লিমেন্টারি ব্যবহার ছাড়া আর কিছু নেই, এমনকি সত্যজিৎবাবুও তাই। প্রথানুগ বলুন, বা স্বাভাবিক এই ধরনের ব্যবহারকে আমি ঠিক নিন্দে করছি না, তবে আমি নিজে ছবি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন বুঝে একে বাদ দেব।

৪. গপ্‌পের লজেঞ্চুস

ফিল্মে গল্প একটা থাকেই। আপনি না বললেও লোকে একটা গল্প ঠিক বের করে

নেবে। একটা কনটেন্ট আছে বলে ধরে নেবে। আপনার কিস্যু করার নেই। যদি আমাকে 'শূন্য' (০) নিয়ে ছবি করতে বলা হয়, তাতেও একটা সাবজেক্ট, একটা কনটেন্ট আছে। এখন ছবিটা কীভাবে করব সেটা আলাদা ব্যাপার। আমাকে হয়ত লীলাবতীর কাছে গিয়ে জেনে আসতে হবে! সুতরাং তর্কের খাতিরে কনটেন্ট একটা আছে বলেই ধরে নিতে হবে। গল্প বা একটা প্লট সব ছবিরই আছে। কিন্তু প্লটটা আপনি কীরকম ভাবে বলছেন, সেইটাই বড়। ডায়লগ, মিউজিক, ফোটোগ্রাফি সব কিছু মিলিয়ে কীভাবে বলছেন গল্পটা—এতেই গোটা জিনিসটা চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে। প্রক্রিয়াটি হচ্ছে ওইরকম : আমাকে প্রথমে ভাবতে হয় যে কীসের ওপর ছবি করব। তারপর আস্তে আস্তে ছবিটা গড়ে তুলব। স্ক্রিপ্ট্ লিখতে পারি, নাও লিখতে পারি। শুধুই চিন্তা করতে পারি। করতে করতে এমন একটা জায়গায় যাই যখন কনটেন্ট বলে আর কিছুই থাকে না। কী রকমভাবে বলছি সেটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এই জিনিসটাই আঙ্গিক। কনটেন্ট বা বিষয় এখানে আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাই বলে তর্কের খাতিরে কনটেন্টকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সম্ভব নয়। কনটেন্ট থাকলেও তার একটা পয়েন্ট অফ ডিপারচার থাকবে। কনটেন্ট আর্ট নয়, কীভাবে বলা হল – সেটাই আর্ট।

সঙ্গীতে যেমন কনটেন্ট বলে কিছু নেই—তেমনই মনে হয় সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই একটা পর্যায়ে সাধারণ ভাবে কনটেন্ট হিসাবে আসলে কিছু থাকে না। আমাকে একজন বললেন, 'সার্কাস নিয়ে কেরালায় একটা ছবি হয়েছে।' আমি বললাম 'যাঁরা সার্কাস নিয়ে চিন্তা করেন তাঁরা দেখুন, আমার চিন্তা ফিল্ম নিয়ে।'

আলোচনা করতে গিয়ে কখনো বলছি কনটেন্ট আছে, কখনো বলছি নেই—এই একটা বিরোধ থেকে যাচ্ছে। আসলে আমাদের ভাষাতেই এই বিরোধ সব সময় আছে। যা ভাবি তা সবসময় বলে উঠতে পারি না, যিনি পারেন—নিঃসন্দেহে তিনি একজন মহান শিল্পী। সবকথা বোঝাতে পারলে আমি খুব বড় দার্শনিক হয়ে যেতাম!

গল্পের কথায় ফিরে আসি। আপনি যখন কোনো গল্প বলেন, গল্পটা কিন্তু পাল্টে যায়। আমার এক অ্যামেরিকান বন্ধুর ডাইরি লেখার অভ্যাস ছিল। আমি সেটা জানতাম না। একবার ৫২-৫৪ সালে ওদের ওখানে গিয়েছি ; পরে আবার ৬৬ সালে গিয়েছি। অনেক রকমের গল্প করতাম, মজার-মজার সব গল্প। ও আমায় বলল, 'তোমার গল্পের মূল জিনিসটা ঠিক থাকে কিন্তু বলতে গিয়ে প্রতিবারই তুমি নতুন কিছু জিনিস যোগ কর আর পুরনো কিছু বাদ দাও। ডাইরিটা দেখিয়ে বলল, 'এই গল্প তুমি আগেও করেছ।' আমি ঘটনার বর্ণনা করছি, কিন্তু ঘটনার মধ্যে নিজের কথাও চলে যাচ্ছে —এটা হয়।

আন্তোনিওনি সম্পর্কে এক ক্রিটিকের বক্তব্য ছিল যে সব ছবিতে উনি একই কথা বলেছেন। বেশিরভাগ বড় ফিল্ম মেকার একই কথা বলেন বিভিন্ন রকম ভাবে। আমার তো একটাই ছবি। তাই, হাঃ, নিজের বিরুদ্ধে যে যাব, অন্যরকমভাবে বলব, তার কোনো

সুযোগই পেলাম না!
ফিল্ম প্রেজেন্ট টেনস্-এ কথা বলে। এটাই ফিল্মের ধর্ম, সবসময় আপনাকে প্রেজেন্ট টেন্সে বলতে হবে। এর মধ্যে ফ্ল্যাশ-ব্যাক থাকলে তা পাস্ট টেন্সে বলা যায়। তবে তার জন্য দর্শককে প্রস্তুত করতে হয়, বুঝিয়ে বলতে হয় এতক্ষণ প্রেজেন্ট টেন্সে ছিলাম, এবার অতীতে যাচ্ছি, এর জন্য কতগুলো টেকনিক আছে।
ফিল্মে লোকে যা পর্দায় দেখে সেটাকেই বাস্তব হিসাবে ধরে। বস্তুত তা বাস্তব নাও হতে পারে কিন্তু তা বাস্তব হিসাবেই গৃহীত হয়। এমনকি পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। পর্দায় তাকে বাস্তবই হতে হবে। আমরা জানি জিনিসটা বাস্তব নয়, কিন্তু ছবি যখন দেখানো হয় তখন সেটা বাস্তব হিসাবেই ধরা হয়। আদ্রেঁ বাজ্যাঁ বলেছিলেন 'পুভওয়ার ইর‍্যাশিওনেল দ্য সিনেমা' (ইর‍্যাশনাল পাওয়ার অফ সিনেমা)। এই বাস্তব জিনিসটা তো সে অর্থে যৌক্তিক নয়। ছবিতে সবকিছুই বাস্তব হওয়া চাই। আমি স্টুডিয়োতে সাজিয়ে গুজিয়ে যা তুলছি সে সব বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে। সেইজন্য ফিল্ম এর কারিগরিতে বাস্তবের ছাপ রাখতে হবে। ছবি করার সময়ে আমার মনে হয়েছিল টালিগঞ্জ আমাকে সেটা দিতে পারবে না, লোকেশন পারবে। কেননা তা বাস্তব, সেটা বাস্তবে আছে—ওই রবি বা বংশীকে ধরে ভাঙা দেওয়াল তৈরি করতে হচ্ছে না।
এই ব্যাপারটা একসময় থিয়েটারে (প্রসেনিয়াম) ছিল। প্রসেনিয়াম মানে ব্রিটিশদের কাছ থেকে নেওয়া আমাদের ওই পুরনো থিয়েটার—তাতে বাস্তবের সঙ্গে একটা যোগ ছিল। তারপর যখন ফিল্ম এল, তখন প্রসেনিয়ামের 'রেজঁ দেত্র্'—অর্থাৎ 'রিজন্ অফ বিইং'-এর অর্থাৎ অস্তিত্বেরই আর কোনো মানে রইল না। প্রসেনিয়ামে যা করা হচ্ছিল, ফিল্মে তা আরও ভাল করা যায়। তখন থেকে থিয়েটারও অন্য ফর্ম খুঁজতে আরম্ভ করল। খুঁজতে-খুঁজতে আজ থার্ড থিয়েটার, এরেনা থিয়েটারে এসেছে। এরেনা থিয়েটার ব্রিটিশ থিয়েটার নয়, শুরুতে এটা গ্রীকরা করত। প্রসেনিয়ামের বাক্সের মধ্যে নয়। ধরা যাক, একটা সিগারেট দেবার দৃশ্য। আমি এমন ভাবে প্যান্টো-মাইম করে সিগারেটটা দিলাম আর আপনি নিলেন—সিগারেটটা সিগারেটই হল। সিগারেটের প্যাকেটটা আজকের থিয়েটারে দেখাবার প্রয়োজন নেই। ফিল্ম-এ তা হবে না। 'পিরিয়ড-গল্প' হলে আপনাকে সেইরকম প্যাকেট যোগাড় করতে হবে—সেই রিয়্যালিটি দেখাতে হবে—চূড়ান্ত নিখুঁত ভাবে। তাহলে ফিল্ম এর একটা ধর্ম পাচ্ছি—ফিল্মের ফোটোগ্রাফ বাস্তব হিসাবে গৃহীত হয়।

৫. মাধ্যমের ধর্ম, সীমা

প্রতিটি মাধ্যমেরই 'স্পেসিফিক কোয়ালিটি' বলে একটা জিনিস আছে। অর্থাৎ যে জিনিসটা করা হবে, দেখতে হবে সেটা অন্য কোনো মাধ্যমে করা যায় কি না। উদাহরণ দিয়ে বলি। বিভিন্ন অবস্থায় আমরা নিজেদের ভারতীয় বলি অথবা বাঙালি

বলি। তাহলে এই 'বাঙালি'টা কী? এই নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। বাংলাদেশ রেডিয়োতে একটা বিতর্ক শুনেছিলাম, তাতে অনেকের বক্তৃতার পর আনিসুজ্জামান নামে একজন বক্তব্য রাখেন। উনি ইতিহাস আর বাংলা ভাষা চর্চায় নামকরা লোক। পুরনো বাংলা থেকে রূপান্তর করে আধুনিক বাংলায় উনি একটা কবিতা শোনালেন। তাতে ছিল — শাকান্ন— শাক আর অন্ন; গব্যঘৃত, মৌরলা মাছ, স্ত্রী স্বামীকে খাওয়াচ্ছে, হাতে একটা পাখা— এই হচ্ছে বাঙালি। এই এলিমেন্টারি জিনিসগুলো ধরে উনি বাঙালির স্পেসিফিক কোয়ালিটির সন্ধান করেছেন।

স্পেসিফিক কোয়ালিটির বিচার করলে দেখতে হবে আপনি যা ফিল্ম-এ করবেন তা অন্য মাধ্যমে করা যায় কি না। কিন্তু অত বাছবিচার করা সম্ভব হয় না। কাজের মধ্যে অন্য মিডিয়ামের জিনিস চলে আসে।

ফিল্ম-এর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে থিয়েটার [প্রসেনিয়াম] বিবর্তিত হয়ে আজকের থার্ড থিয়েটারে এসেছে সে কথা আগেই বলেছি। থার্ড থিয়েটারে প্রপ-এর দরকার হয় না, পোশাকেও কোনো বৈশিষ্ট্য থাকে না। অভিনেতাদের ভিতর থেকে জিনিসটা বের করে আনা হয়। একটা মাধ্যম যদি জোরের সঙ্গে কোনো কাজ করতে থাকে, তার প্রভাব অন্য মাধ্যমগুলোতেও পড়তে বাধ্য, তখন অন্য মাধ্যমগুলোও পাল্টে যেতে থাকে। যেমন ফোটোগ্রাফির আবিষ্কারের পর পেন্টিং অনেক পাল্টে গেল। একটা সময়ে আপনার আঁকা কাটা আপেলের ছবিতে ভুল করে মাছি বসেছে—এটাই ছিল তখন চিত্রের উৎকর্ষের নিরিখ। কিন্তু ফোটোগ্রাফি আবিষ্কৃত হওয়ার পর দেখা গেল, ফোটোগ্রাফিতে যা করা যাচ্ছে, পেন্টিং আর তা পারবে না। তখন পেন্টিং নিজের সত্তা খুঁজতে আরম্ভ করল। এই সত্তা তার ছিলই। কিন্তু এখন তার উপর কেন্দ্রীভূত হল সমস্ত আলো।

ছবিতে বাহ্য বাস্তব তুলে তুলে আনার মূল সূত্রটা কী। যদি আমাকে ক্ষুধার্ত মানুষ দেখাতে হয় খিদে ব্যাপারটা মুখে লেখা থাকা উচিত। যতই ডাস্টবিন বা এটা-ওটা দেখাই না কেন। এখানে ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক হতে পারে। আমি ঠিকমতো নাও দেখাতে পারি। অথবা দর্শকের মনে হয়ত দাগ কাটা গেল না। অর্থাৎ হয় আমি ব্যর্থ হয়েছি নয় তো দর্শক।

বাস্তবে যা নেই তা দেখাতে না পারাটা পরিচালকের সীমাবদ্ধতা। আর ফর্ম-এর ক্ষেত্রে প্রতিটি মিডিয়ারই নিজস্ব কিছু বাধা থাকে। কাঠের কাজ করলে একরকম, পাথর এক-রকম বা মেটাল আর একরকম। ম্যাটার-এর এই রেজিস্ট্যান্স সমস্ত আর্ট ফর্ম-এর ক্ষেত্রেই একটা সমস্যা। ফিল্ম-এর রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি। আমাকে একটা ইউনিট নিয়ে কাজ করতে হবে। কোথাও না কোথাও কেউ হয়ত 'ফেল' করল। হয়ত একজন অভিনেতাকে নির্বাচন ঠিক হয়নি, বা ঠিক হলেও লাইটিং হয়ত ঠিক হয়নি — সেক্ষেত্রে দেখা গেল মুখে ক্ষুধার আঁচড় ফুটে উঠল না।

৬. আত্মজৈবনিক প্রলাপ

আত্মজৈবনিক উপাদান মিশে থাকলে ছবি ভাল হবে। সে জন্য আমার 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' ভাল লাগে। দেশের সমস্যার সঙ্গে ওখানে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্টস মিশে আছে। ঋত্বিক অনেক নিজের কথা বলেছেন। এই প্রথম দেখা গেল উনি বিষ্ণুবাবুদের আওতা ছেড়ে বেরিয়েছেন। 'কোমল গান্ধার' দেখে মনে হয়েছিল— উনি বিষ্ণুবাবুতে (কবি বিষ্ণু দে) একেবারে মজে আছেন। বিষ্ণুবাবু যেমন গ্রীক পুরাণ নিয়ে কবিতার মধ্যে ঢোকেন 'কোমল-গান্ধার'-এ ঋত্বিকও তাই করেছিলেন। মায়ের ডাইরিটা হচ্ছে বাংলার ইতিহাস, 'আর্কিটাইপ থিওরি' এই সব ছবিতে ঢোকানো ছিল। 'মা'-এর ব্যাপারটা 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে একেবারে না গেলেও কম আছে। এ ছাড়া নিজের মদ খাওয়া নিয়ে বক্রোক্তি— এইসব ছেলেমানুষি কিছু আছে।

গ্রেট আর্ট হতে গেলে তার মধ্যে অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট থাকতেই হবে এমন ধরনের কমেন্ট করতে আমি রাজি নই। তবে অথেনটিসিটি অব আর্ট-এর প্রশ্নে, মনে হয় অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট থাকা দরকার। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতাসমূহ ঠিক কী স্তরে কাজ করে চলে আমরা তো সবসময় জানি না। যখনই অবাধে কাজ করতে পারি তখনই তা প্রকাশ পায়। যেমন নিজের কথা অবচেতন স্তর থেকে বেরিয়ে এল। কিন্তু সেটা কখন বের হচ্ছে তা সব সময় বোঝা মুশকিল হয়। আমি যখন ছবিটা করেছি তখন, আমার অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট ছবিতে থাকবে— মনে হয় না এরকম বুঝে করেছি। তখন মনে হয়নি।

ছোটবেলা থেকেই সার্কাস ভাল লাগত। বাবা, শুধু চার্লি চ্যাপলিন আর সার্কাস আমায় দেখতে দিতেন— আর কিছু নয়। কনজার্ভেটিভ ফ্যামিলি। ঠাকুরদা কনজার্ভেটিভ ছিলেন। বাবা কিছু বলতেন না, বলতেন 'আমার সঙ্গে যাবি।' বাবা ও অন্যান্যদের একটা আড্ডা ছিল কলেজ স্ট্রিটের ওপরে। মাঝে মাঝে বাবা নিয়ে যেতেন, বেরিয়ে কচুরি খাওয়াতেন। কখনো কখনো এলফিনস্টোন হলে চার্লি চ্যাপলিন আর শীতকাল এলেই সার্কাস। হিউম্যান ক্যানন-বল। সেটা ছোটবেলার একটা ভাললাগা ছিল।

এই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্ট সম্পর্কে এখন আমি মাঝে মাঝে ভাবি। ছবিতে কেন এটা হল, কেন ওটা হল, এসব ভাবনা আসে। আমার সেই সময়ের বন্ধুবান্ধব মদটদ খেলে যারা সন্ধেবেলা অনেক কথা বলত, কথাগুলো আমার মনে ছিল। আমার ধারণা মদ খেয়ে বা সঙ্গমের পর আমরা যখন খুব ঢিলেঢালা হই তখন অনেক সত্যি কথা বলি। বিভিন্ন সিকোয়েন্সে সে সমস্ত কথা আমি প্রচুর প্রয়োগ করেছি। আমার এক বন্ধু ছিল দিলীপ – পোস্টাফিসে কাজ করত। অ্যালকহলিক। প্রচুর মদ খেয়ে বলত, 'আমার কথা কী বুঝবি ? সারাজীবন তোকে যদি ফরেন মেল সর্ট করে যেতে

হয় ·· বাঞ্চোৎদের মেল সর্ট করি আর বস্ পিছনে দাঁড়িয়ে দেখে ঘোষবাবু ঠিক সর্ট করছে কি না···।' ইওরোপেও প্রচুর লোকের সাথে দেখা হয়েছে—কথা হয়েছে—যা হয়ত অবচেতনভাবেই আবার ফিল্মে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমাদের অস্তিত্বের একটি স্তরে, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে টাকা জিনিসটা কিস্যু নয়। সেখানে আমার সত্তাই সব। আপনি হয়ত একটি ছবি এঁকেছেন, ছবিটায় কত টাকা পেলেন সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সবাই আসছে, ছবিটা দেখছে, বোঝবার চেষ্টা করছে এর একটা তৃপ্তি আছে। আমি অবশ্য এটা করবার চেষ্টা করেছিলাম, পারিনি। খেদ হয়ত থেকে যাচ্ছে—তা আমরা তো প্রত্যেকেই কোনো না কোনো খেদ নিয়ে বেঁচে থাকি। অনেকে যেমন কোনো ভয় নিয়ে বাঁচে, কোনো কনসার্ন নিয়ে বেঁচে থাকে। এটা টাকাকড়ির কোনো ব্যাপার নয়। আন্তোনিওনি থেকে উদাহরণ দিই। 'মনিকা ভিত্তি'তে যেমন দেখিয়েছেন যে বিরাট ইনডাস্ট্রিয়ালিস্ট-এর বাড়িতে বিয়ে হয়েছে, কোনোই অর্থচিন্তা নেই— সে হঠাৎ মনে করছে—জীবনটা ফাঁপা, শূন্য। এ একটা মানবিক সমস্যা। ও বলছে 'হোয়েন ইউ আর শ্রাউডেড উইথ ইকনমিক প্রবলেম' তখন অনেক সমস্যাই আসবে না। তা আমি একটা সাধারণ চরিত্র নিয়ে কী করব? আমি অবশ্য এত ভেবে ছবি করিনি, পরে আন্তোনিওনি পড়ে মনে হয়েছে— রাত্রি বারোটার পর কোনো সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্ত লোক বোধ হয় 'শ্রাউডেড উইথ ইকনমিক প্রবলেম' থাকে না। ওই যে বারোটার পর মদ খেয়ে কথা বলত লোকে, আমিও হয়ত অনেক কথা বলেছি, সেটাই ছিল আমাদের যথার্থ অস্তিত্ব, সেটাই আমাদের মানবিকতা।

ক্যামু যে রকম বলেছেন, মানুষ আর কী করতে পারে, নিজেকে ছড়াতে পারে—ফরাসি ভাষায় 'সেঁতাদ' মানে নিজেকে প্রসারিত করা। এছাড়া অস্তিত্বের আর কোনো মানে নেই। আপনি নিজেকে ছড়াবেন, আপনি একা বাড়িতে বসে থাকতে পারেন না। 'নো ম্যান ইজ অ্যান আয়ল্যান্ড', কোথাও না কোথাও আপনি নিজেকে মেলে ধরবেনই।

৭. বস্তুত পপ আর্ট

ছবি দেখার জন্য দর্শককেও প্রস্তুত হতে হবে, নিজেকে তৈরি করতে হবে। যেমন অ-আ-ক-খ শিখতে হয়েছে, তবেই বই পড়তে পারছি, ভুলেই গেছি শিখতে কত কষ্ট হয়েছিল। ফাদায়েভ নামের একজন লেখক একবার পিকাসোর ছবি দেখে বলেছিলেন 'আমি বুঝতে পারছি না', পিকাসো বলেছিলেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, তোমার বোঝা সম্ভব নয়। তুমি তো লেখাপড়া শিখেছিলে—কতদিন ধরে অ-আ-ক-খ শিখেছ? পেন্টিং দেখা তো শেখনি। শিখতে হবে, তা না হলে তুমি পারবে না।' ফিল্ম দেখাও অভ্যাস করতে হবে, পরপর, ফিল্মের মিউজিক খানিকটা জানতে হবে। আজকালকার

ছেলেরা অবশ্য অনেক বেশি মিউজিক্যাল মাইন্ডেড হয়। টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদিতে তারা নানারকম জিনিস শুনছে। ছোটবেলায় আমরা এতটা সুযোগ পাইনি। একই সঙ্গে কালোয়াতি গান আর পপ-মিউজিকে রিঅ্যাক্ট করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের কাছে সেটা খুব সহজেই সম্ভব। শুনে শুনে তাদের মনটা তৈরি হয়ে গেছে।

নানারকম শিক্ষাদীক্ষার পর ছবি নিয়ে আমরা যখন দর্শকের কাছে যাচ্ছি তখন সবসময় যথার্থভাবে গৃহীত হচ্ছি না। যেহেতু দর্শকের অভিজ্ঞতা অন্যরকম, বোঝবার শক্তি অন্যরকম। হাজার হাজার লোক যাত্রা দেখে, বক্স-অফিস-হিট ছবি যেমন 'মহাতীর্থ কালীঘাট', 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' ইত্যাদি দেখে। কিন্তু আমাদের ছবি দেখে না।

এই কারণেই, সত্যজিৎবাবু এত প্রাইজ পেলেও—কমার্শিয়াল ফাইনান্সররা তাঁর কাছে যায় না। নানারকমভাবে এখান-ওখান থেকে টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে। বুদ্ধদেব-বাবুও এমন জায়গা থেকে টাকা জোগাড় করছেন যেগুলোকে 'পলিটিক্যাল প্যাট্রোনেজ' বলা যায়। তরুণ মজুমদার, তপন সিংহ যেভাবে বাইরের ফিন্যান্স পান, এঁরা সেভাবে পান না। তবে একটা প্রবলেম থেকেই যায়। এখন যদি আমাকে কেউ ছবি করার জন্য পয়সাও দিত— আমার মনে হয় ছবিটা মার খেত। 'তেরো নদীর পারে' এক সপ্তাহ চলেছিল, না হয় পাঁচ সপ্তাহ চলত। একই কারণে ঋত্বিকবাবুও মার খেয়েছেন। শুনেছি 'মেঘে ঢাকা তারা' কোনোরকমে পয়সাটা কভার করেছিল। সেটা—যে যাই বলুক— আমার মনে হয় ঋত্বিকের অন্যান্য ছবির স্ট্যান্ডার্ডে অনেক নিম্নস্তরের ছবি। তার ওপর তাঁকে সুপ্রিয়াকে রাখতে হয়েছে— অনেক ফ্যাক্টর প্লে করেছিল।

আজ ভ্যান গগের যা অবস্থা, তাঁর জীবদ্দশায় তেমনটা ছিল না। ভাইয়ের সাহায্য ছাড়া আঁকতে পারতেন না, ভাই ওঁকে পয়সা দিয়েছে, বাঁচিয়ে রেখেছে। এই হচ্ছে মুশকিল। একটা টাইম-ল্যাগ থাকে। লোকের তখন বোঝবার ক্ষমতা হয়নি। পিকাসোর ভাগ্য ভাল যে তাঁর সময়ে গুয়ের্নিকার মর্ম বোঝার লোকের অভাব হয়নি। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, ইওরোপের ওই অবস্থায় কেউ সমগ্র জিনিসটাকে ধরছে না। গুয়ের্নিকায় ধরা পড়ল সেই সামগ্রিকতা।

চ্যাপলিনের ক্ষেত্রে যেমন শুরুতেই বাণিজ্যিক সাফল্যটা মার খায়নি। ক্রিটিকরা প্রথমে ওঁর ইনটেলেকচুয়ালিটি নিয়ে মাথা ঘামায়নি। ছবি করলেই বক্স-অফিস হত—যেখানেই যায় সেখানেই পয়সা পায়। পরে ইনটেলেকচুয়ালরা ভাবতে আরম্ভ করল। লেখালিখি হল। চার্লির মতো সাকসেসফুল ফিল্ম-মেকারকে দেখে আমার যেটা মনে হয় যে ফিল্মের ভিত্তিটাই হল পপ-আর্ট। এর গণ-আবেদন না থাকলে চলবে না। কারণ এত টাকা খরচ করে যদি রিটার্ন কিছুই না থাকে তাহলে কেন ছবি করা বলুন তো ? আপনি যদি বাজারেই না বের হন, আপনার যদি দর্শকই না হয়, আপনি কেন ছবি করবেন ? ছবি হবে—অনেক প্রিন্ট হবে—একসঙ্গে রিলিজ হবে—লোকে দেখবে—যেমন ইওরোপে

এখন গান গাইছে—লোকে দেখছে—একসঙ্গে বিশ-পঁচিশ হাজার লোক। একটা বিরাট বাজার। ধরা যাক বড় বাজার, এই বড় বাজারের সঙ্গে শুদ্ধতা ও সত্যের বিরোধ আছে কি নেই তা ক্রিটিকদের আলোচনার বিষয়। আর্টিস্টদের কথা সেটা হতে পারে না। তা'ছাড়া, যাকে আমি শুদ্ধ বলছি তা সাবজেকটিভ, বিরোধটাও সেইজন্য সাবজেকটিভ। অবশ্য যে দর্শক 'শোলে' দেখে খুশি তার পক্ষে রুচিশীল ছবি দেখার কোনো কারণ নেই। আর দর্শক যদি তৈরি না হয়, তার দায়িত্বও আমি নিতে পারি না।

মাধ্যমটা আন্তর্জাতিক স্তরে একটা সংকটে পড়েছে। অন্ধ গলি। আর কিছু করার নেই। তবে ফিল্ম এর ভবিষ্যত একটা হবে। আপনি ক্যাসেট নিয়ে বাড়িতে বসে দেখবেন। একা একা বসে। আমি যেমন ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ি। এরকম একটা বাজার হবে। ভিডিও কালচার গড়ে উঠবে। সেটাই ফিল্মের ভবিষ্যত। আর বাকিটা হল স্পেকটাকুলার। স্পেকটাকলস্—যেমন ধরুন সমুদ্র শুকিয়ে গেল—টি. ভি.-র মহাভারতে যা দেখানো হল। অথবা সার্কাসে যেমন দেখানো হয়। আপনি যদি নতুন ধরনের ছবির সঙ্গে পুরনো ছবি আলাদা করেন, তবে দেখবেন এই স্পেকটাকল্‌টাই আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি নতুন ছবিতে। আর রয়েছে মাইথোলজিক্যাল টাইপ এর জিনিস। মডার্ন মাইথোলজি। জেমস বন্ড। একটা লোক যে যেকোনো বিপদ থেকে উদ্ধার করে। কিছুদিন আগে কাউবয় ছবিতে যা ছিল। ঐ র‍্যাগেড লাইফ এর মধ্যে একটা বন্দুক আর ঘোড়া থাকলেই সে সব করবে। মডার্ন মাইথোলজি, অ্যামেরিকান মাইথোলজি। □

বারীন সাহা

টুকরো কথা

১

আমাদের শুঁড়িদের মধ্যে তখন লেখাপড়ার চল ছিল না। আমার ঠাকুরদা ছিটকে চলে এসেছিলেন। ওকালতি পড়লেন নিজের চেষ্টায়। বললেন, মদের দোকান আমি করব না। আত্মীয়-স্বজনদের সব মদের দোকান। তারপর, আমার বাবা ডাক্তার হতে গেলেন, কাকা এনজিনিয়ারিং পড়তে গেলেন যাদবপুরে; আমার দাদা পড়াশুনো করেছেন ফিলসফি আর ল নিয়ে। আর আমি হচ্ছি ব্ল্যাকশিপ!

২

পনের থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টি করেছি। লেখাপড়ায় খুব একটা ভাল ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু শেষের দিকে আমি ভাল ছাত্র হয়ে গেলাম। বিয়াল্লিশ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ফেল করলাম। পরের বার টেস্ট পরীক্ষায় বসিনি। স্কুলের কেরানি পেতলের গরাদের পেছনে একটা উঁচু টুলের ওপরে খাতা খুলে বসে পরীক্ষার ফি জমা নিচ্ছিলেন। বললেন, 'পরীক্ষায় বসিসনি? ঠিক আছে, টাকা জমা দিয়ে দিবি।' আমার এক বন্ধুর টাকাটা জমা নেবার পর, আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবার বললেন, 'কীরে তোর টাকাটা দে?' আমি বললাম, 'স্যার, আমার কত বাকি আছে?' খাতা খুলে দেখেন প্রায় দু-শ টাকার মতন বাকি—সারা বছরের মাইনে আর পরীক্ষার ফি। পরীক্ষার ফি যারা যারা দিয়েছে সবাই সেন্ট-আপ। ফি জমা দেবার পর, আমার এক ভাই, সেও পার্টি করত, তাকে বললাম, 'কী করি বল দিকিনি? দু-আড়াই মাস সময় আছে!' যা হোক করে একটা মাস্টার জোগাড় করা গেল। তিনি বললেন, 'মুখস্থ লিখলে আমি পড়াব না। ইংরিজি আর অংক করাব, বাকিটা তুমি নিজে পড়ে নেবে।' তখন বেশ কিছুদিন কম্যুনিস্ট পার্টি করি। প্রচুর বই পড়ি, ফলে আমার জেনারেল নলেজটা বেশি ছিল। আর একটা কনফিডেন্সও ছিল। দু-মাস পড়ে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে গেলাম। মাস্টার বললেন, 'আশ্চর্য! কী করে পাশ করলে বলতো?' যেদিন রেজাল্ট বেরুল আমি হৃষিকেশ পার্কের কাছে বসেছিলাম। ভাবলাম, 'দেখতে

যাব ? আমি তো পাশ করতে পারব না !' এক বন্ধু এসে বলল, 'আমাদের আড্ডার অনেকে ফেল করেছে। তুই আর আমি পাশ করেছি।' আমি বললাম, 'এখন এটা প্রকাশ করবি না।' ভিড় ঠেলেঠুলে গিয়ে দেখি, হ্যাঁ, লেখা আছে। বললাম, 'আর একবার দেখি !' তিনবার দেখেছি। আমার বন্ধু পাশ করেছে বলে বাড়ি থেকে কিছু টাকা পেয়েছিল। ওর থেকে দশটা টাকা ধার করে বন্ধু-বান্ধব সকলে মিলে খেলাম। কিন্তু অনেকে ফেল করেছে বলে খাওয়াটা তেমন জমল না।

পার্টি থেকে বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হতে বলা হল। কমার্সে ভর্তি হয়েছিলাম। বাড়িতে, পাড়াতে সকলে বললে, 'কমার্স ? সায়েন্সে যাও !' সায়েন্সে চলে গেলাম, ফেল করলাম। তারপর পড়াশুনো ছেড়ে দিলাম।

রণদিভের পিরিয়ডে যখন পার্টিতে অ্যাডভেঞ্চারিস্ট লাইন নিয়ে আসা হল, আমরা দশ-বারো জন বন্ধু তখন একসঙ্গে পার্টিতে কাজ করি। তার মধ্যে আমি, বাদল (বাদল সরকার) আর অজিত (অজিতনারায়ণ বসু) ছিলাম লিডিং পার্ট-এ। এক জায়গায় একটা কালভার্ট উড়িয়ে দিতে বলা হল আমাদের। আমি আর বাদল (অজিত তখন জেলে) ভাবলাম, এতো উচিত হবে না, সাধারণ লোক মারা যাবে আর তাছাড়া, স্ট্রাইক তো ফেল করেছে— এখন কালভার্ট উড়িয়ে কী লাভ ? যতটুকু পলিটিক্স বুঝি আর কি ! বলা হল, পার্টির ডিসিশন না মানলে বের করে দেওয়া হবে। আমরা বললাম, ইউনিটে আলোচনা করতে চাই, ইউনিটের ডিসিশন হলে করব, নইলে নয়। তখন সাসপেন্ড করে দেওয়া হল। সাসপেন্ডেড অবস্থায় বাড়ি থেকে আমায় অ্যারেস্ট করা হল। আই ওয়াজ দ্য ওনলি পার্সন হু নিউ অল দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড ডেনস্। কিন্তু, পুলিশ আমায় মারল না, খবর বের করার কোনো চেষ্টা করল না। জেলে গিয়ে দেখলাম, পার্টিতে আমার ঠিক ওপরে যে কাজ করে সেও অ্যারেস্টেড। সে সেন্ট্রাল কমিটির সব ডেন এর খোঁজ জানে। একদিন ফাঁকা পেয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার গো ?' বলল, 'ব্যাপার তো বুঝতেই পারছ। তোমাকে আর আমাকে ধরেছে, কোনো ডেন উড়ল না, কিছু হল না—' আমি বললাম, 'কী করবে ?' বলল, 'কী করব ? পার্টি ডিসিপ্লিন তো মানতেই হবে।' এরপরে জেলখানায় মারামারি হল, হাঙ্গার-স্ট্রাইক হল। এসব করার পর পার্টি-মেম্বারশিপ পেয়ে গেলাম। তারপর একজন জিজ্ঞাসা করল, 'কী করবি এবার ? কাজ করবি ?' আমি বললাম, 'না, এবার ছেড়ে দেব।' সাসপেন্ডেড অবস্থাতে তো ছাড়া যায় না, মেম্বারশিপ পেয়ে ছেড়ে দিলুম।

৩

ইউরোপে যখন যাই, ফিল্ম শেখার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমার আর্ট-এর কোনো ট্রেনিং ছিল না। ফিল্ম শেখার ইচ্ছেটা অন্য অনেকগুলো ইচ্ছের মধ্যে

মিশে ছিল। বিদেশের বিভিন্ন কোর্সে অ্যাপ্লাই করি। তার মধ্যে, ফিল্ম ছাড়া ফার্মিং, অটোমোবাইল এনজিনিয়ারিং আর ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি ছিল। শেষ পর্যন্ত ফিল্ম-এ সুযোগ পেলাম। তখন ফরাসি শিখতে হল। পরে ইতালিয়ান শিখতে হল।

ফিল্ম-এর ক্ষেত্রে আমার পজিশনটা হল— আমি আদ্রেঁ বাজ্যাঁর থিওরিতে বিশ্বাস করি। 'ইমপিওর সিনেমা'-র থিওরি। ফরাসি দেশে থাকার সময় হি ওয়াজ এ রোরিং ফিল্ম ক্রিটিক, ওর লেখা বইগুলো সম্ভবত কিছুদিন পরে বেরিয়েছে। 'কাইয়ে দ্য সিনেমা' গ্রুপের সঙ্গে ওর যোগাযোগ ছিল। নিউ- ওয়েভ-এর ত্রুফো, গোদার, শ্যাব্রল-এর সঙ্গে বাজ্যাঁর দহরম-মহরম ছিল। পরে অবশ্য ডিফারেন্স হয়ে যায়। ক্রিটিসিজম্ যতই করুক, হি ওয়াজ হাইলি রেসপেকটেড। এমনকি লেফট্-রাও ওকে রেসপেক্ট করত। যুদ্ধের পরে ফ্রান্সে তখন এভ্রি থার্ড ম্যান ওয়াজ এ কম্যুনিস্ট ভোটার। লেফট্-রা ফিল্মের একটা প্যারালাল মুভমেন্ট ডেভেলপ করাতে আরম্ভ করে। সিনে ক্লাব দার্কসিঁয়ো বলে একটা গ্রুপ করল। তারা সোস্যাল কনটেন্টে বিশ্বাস করত— ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং কলড্ কনটেন্ট। 'কাইয়ে'-দের গুরু ছিল হিচকক। হিচকক তো প্রায় অ্যাবস্ট্রাক্ট সিনেমার মতন সাসপেন্স তৈরি করে— এরা এ ধরনের সিনেমা পছন্দ করত। অবশ্য নিজেরা যা করেছে, তার সঙ্গে হিচককের অনেক তফাত। কিন্তু থিওরিটিক্যাল আলোচনায় হিচককের নামে কিছু বললে মারামারি লেগে যেত। ইমপিওর সিনেমা, অর্থাৎ এর মধ্যে সবকিছু ঢোকে। রেনেই বল আর রগ্রিয়েই বল (রগ্রিয়ে বেসিক্যালি লেখক পরে ফিল্ম করেছে) মনে হয় ওই রকম প্লেনেই যাওয়া উচিত। ভাবনাটা আমারও ওইরকম। আমি যখন ছবি করেছি, মোটামুটিভাবে আদ্রেঁ বাজ্যাঁ ফিল্ম সম্পর্কে যা বলে আমার ট্রেনিংটা ওইখানে ছিল। কিন্তু এই ভাবনাটা ডেভেলপ করেছে ছবি করার পর।

একটা ফোটোগ্রাফিক ইমেজের আলোচনায় যেমন ইউ ক্যান নট ডিসকাস ইট উইদাউট ইয়োর ফর্মার কালচার অফ পেন্টিং, ফিল্ম-এর গল্প যদি অ্যাডাপটেশন হয় তাহলে লিটারেচারের আলোচনায় যেতে হয়, তেমনি ইমপিওর ফিল্মের আলোচনাতে অন্য শাখার শিল্পের প্রসঙ্গ মিশে থাকে।

আমার দুটো বাবা, একজনতো ঐ আদ্রেঁ বাজ্যাঁ। কারণ আমি নিউ-ওয়েভ ছবি পছন্দ করি। নিও-রিয়্যালিস্ট অনেক ছবিও আমার পছন্দ। খুব কমন— বাইসাইকেল থিফ— দারুণ ভাল লাগে আমার। ইকনমিক পয়েন্ট ফোরফ্রন্টে চলে আসে বলে অনেকে যতই ব্লেম করুক আমরা ছবির সেই লোকটা গরিব বলে ওটাকে নিও-রিয়্যালিস্ট হিসাবে ক্লাসিফাই করেছি। কিন্তু ওর মধ্যে অনেক হিচকক আছে। বাচ্চাকে খোঁজার সময়ে হিচককের 'স্পেল বাউন্ড'-এর মতো সাসপেন্স ডেভেলপ করে।

আরেকজন রেনোয়া। রেনোয়া ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ইন ফ্রেঞ্চ ফিল্ম। নিও-ওয়েভ, কাইয়ে গ্রুপদের রেনোয়া-তে আপত্তি নেই। ওর সম্পর্কে আমি কিছু কিছু

আগেই জানতাম। সব ছবি দেখেছি। মানে তখনকার দিনে যা দেখা সম্ভব। ওর যে ধরনের কাজের পদ্ধতি সেটা আমি অ্যাডমায়ার করি। হয়ত ফ্লোরে গিয়ে অ্যাক্টরদের বলল, 'হ্যাঁরে, তোর কী বলার ইচ্ছে যাচ্ছে আজকে?' নিজের কাজের ক্ষেত্রে একেবারে ওইভাবে করতে পারিনি আমি। তবে অনেক সময়, পাঁচজনে হয়ত বলল, 'বারীনদা, এটা হলে ভাল হয়', তখন সেটা আমি করেছি। রেনোয়ার আর যে ব্যাপারটা আমার পছন্দ তা হচ্ছে ওর ইম্প্রোভাইজেশন। থিম নিয়ে মিউজিসিয়ানদের মতো কাজ করত। অনেক সময়েই স্ক্রিপ্ট যেত পালটে।

বর্তমানে আমার ইনফ্যাচুয়েশনটা রেনে আর রগ্রিয়ের ওপর। অবশ্য আমার ছবির সঙ্গে ওদের কোনো মিল নেই।

যদি কেউ প্যাট্রিয়ার্কাল লিনিয়েজ খোঁজে তাহলে বলব, শিল্পী হিসাবে আমি অরফ্যান। একটু ক্ল্যারিফাই করলে বলতে হয়, 'আই অ্যাম লুকিং ফর এ ফাদার!' সেই যে আছে না বাস্টারকিটানের একটা ছবিতে। বাপ কৃষক, ছেলে শহরে এসে লায়েক হয়েছে। বাপ ছেলেকে চিনতে পারছে না। এমন তার চেহারা হয়েছে। তো প্ল্যাটফর্মে ছেলেকে পায়চারি করতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'আর য়ু লুকিং ফর এ ফাদার?'

আমাকে যদি কেউ নিও-রিয়্যালিস্ট বলে থাকে— দ্যাট ইজ রং। আমি যখন ইওরোপ থেকে ফিরেছি ওখানে তখন নিও-রিয়্যালিজম্ শেষ হয়ে গেছে। না, আমি এখানে তা নিয়ে আসিনি। আই নেভার থিংক দ্যাট আই অ্যাম এ নিও-রিয়্যালিস্ট। লোকে বললে আমার কিছু করার নেই। আর একটা জিনিস হচ্ছে নিউ-ওয়েভও প্রায় শেষ। অর্থাৎ গোদার শ্যাব্রল, ত্রুফো-এঁরা। আমার প্রবলেম হল ছবি করার সময় আমার কাছে ওরকম থিওরি-টিওরি কিছু ছিল না।

নিও-রিয়্যালিস্টরা— দে ইউজড্ টু প্রেফার আউটডোর। সম্ভবত, আমিও আউটডোরে ছবি করেছি বলে আমাকে নিও-রিয়্যালিস্ট বলা হয়েছে। কিন্তু আমার আউটডোরে যাওয়াটা নিও-রিয়্যালিস্টদের মতো নয়। বিশ / তিরিশ বছর ফ্যাসিজম্-এ থাকার পর তখন নিও-রিয়্যালিস্টরা হয়ত নিশ্বাস ফেলতে পারল। যুদ্ধের পর তারা বলল, ক্যামেরা আর ভেতরে থাকবে না, ক্যামেরা বাইরে বেরিয়ে যাবে। তখন ইনক্লুডিং ভিসকন্তি সবাই নানারকমের ছবি করেছে।

আমার লোকেশনে যাওয়াটা কিন্তু তেমন ছিল না। এক জায়গায় একটা সার্কাস বসে। উনিশ পয়সার সার্কাস। এই চিত্রটা আমায় তুলতে হবে। এ জিনিস আমি পয়সা খরচ করে সেট-এ করতে পারব না। এটা আমাদের সাধ্যে কুলোবে না অত সঙ্গতি নেই, তাই সত্যিকারের সার্কাস খুঁজতে হল। যে সার্কাস বাস্তবে আছে, সেটাই আমি সেট হিসাবে ব্যবহার করব। 'লক-স্টক অ্যান্ড ব্যারেল'— বলে না, এটা ছবিতে তোলা যায় এবং ওটাই আমাকে করতে হল। কয়েকটা নাইট-শুটিং ছিল। আমি ঠিক করলাম, আমার নলেজ কে একটা এক্সপেরিমেন্ট এর মধ্যে নিয়ে যাব— ক্যামেরা থেকে শুরু করে সমস্ত

কিছুকে এক্সট্রিমে নিয়ে যাব।
লোকেশনটা ছিল একটা গঞ্জ— তেরোপেখিয়া— জায়গাটা মহিষাদল থেকে সাত / আট কি.মি. দূরে, হলদি নদীর পাশে। মহিষাদলের রাজা তেরোজন পাইক পাঠিয়ে ওই গ্রামটা দখল করেছিল— তাই ওই নাম। স্থানীয় এক কবির মুখে শুনেছি আগেকার দিনের লোকাল পাব্লিকেশনেতে পাওয়া গেছে— হল্‌দি নদীকেই তেরো নদী বলা হত। আমার মনে হয়েছিল 'তেরো নদীর পারে' মানে— ইট ইজ এ ফার ফেচেড স্টোরি। তেরো-পেখিয়ায় কোনো বসত বাড়ি নেই। শুধু একটা বাজার। সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে। হাটবার বলে। যেদিন দোকানগুলো খোলা হয় না সেদিন গড়হাট। আর, বছরে একটা দুটো সময়ে ফেস্টিভ্যাল এর আকার নেয়। মেলা বসে, রোজই হাট হয়। পাইকাররা কেনাবেচা করে নৌকোয় উঠে কাকদ্বীপ চলে যায়। দেয়ার ওয়াজ নো ডাইরেক্ট লিংক উইথ ক্যালকাটা। জায়গাটার একটা হিন্টারল্যান্ড আছে — নন্দীগ্রাম। আর কোনো বড় বাজার নেই। আমার মনে হয়েছিল যদি বাইরে থেকে টেকনিশিয়ান, জেনারেটর আর অন্যান্য জিনিসপত্র আনি, ওই অঞ্চলকে আমি ম্যানিপুলেট করতে পারব টু ইউজ্ ইট অ্যাজ মাই সেট। ছবি আঁকতে গেলে যেমন রঙ-তুলি ক্যানভাস দরকার, ফিল্ম মেকারের সমস্যা হল, ছবি করার সময় টুলস্ অ্যাভেইলেবল্ হতে হবে।
এভাবে ছবি করার সূত্রপাত। এর মধ্যে কোনো তত্ত্বের ব্যাপার তখন ছিল না। তত্ত্বের ব্যাপার যেটা বলছি সেটা আমার আজকের ব্যাপার বা অনেক পরের ব্যাপার। বাষট্টি সাল থেকে আরম্ভ হল আমার তত্ত্বের আগ্রহ। তার আগে তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। অবশ্য তত্ত্ব জানতাম, কারণ ফিল্ম-স্কুলে পড়াশোনা করলে তত্ত্ব জানতেই হয়।
'আউটডোর' নিয়ে অনেকেই নানারকম ক্লেম করে থাকে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় নিমাইবাবুর 'ছিন্নমূল' অনেকটা সফল। ছবিতে 'ক্রাফটস্ম্যানশিপ' যদিও উঁচু পর্যায়ে পৌঁছয়নি তবে ক্যামেরাকে আউটডোরে নিয়ে এসে সমসাময়িক বাস্তবকে ধরবার একটা চেষ্টা করা হয়েছে।

৪

ব্যক্তিগতভাবে আমি অ্যাডাপটেশনের বিরুদ্ধে। ইট ইজ অলমোস্ট এ রি-হিটেড মিল। অনেকেই অ্যাডাপটেশন করেছে। কিন্তু 'পথের পাঁচালি' হ্যাজ এ স্পেশাল প্লেস। ওতে সত্যজিৎবাবুর অনেক নিজের জিনিস আছে।
'পথের পাঁচালি' বাংলা ছবি বা ভারতীয় ছবির একটা ল্যান্ডমার্ক। অত সুষ্ঠুভাবে কেউ ছবি করেনি। কিন্তু এ ছবির কতগুলো ড্র-ব্যাকস্ আছে। প্রচুর কপি করা জিনিস

আছে।* ছবি দেখে, রোসেলিনির ফার্স্ট রিএ্যাকশন হচ্ছে— 'আচ্ছা এর মধ্যে রায় তো নেই ! এতে দনস্কোই আছে, আইজেনস্টাইন আছে, রে ইজ নট দেয়ার।' আর ছবির— ইডিয়মস্ আর নট হিজ ওন থিং। ইট ইজ অলরেডি অ্যান ওল্ড স্কিম। সে জন্য একে মাস্টার-পিস বলা যায় না।

এছাড়া আরও কিছু জিনিসের ওপরে ছবিটা নির্ভরশীল হয়ে আছে যেগুলো হ্যাবিটের ব্যাপার। যেমন হরিহর যখন এল তার আগেই দুর্গা মারা গেছে। হরিহর যখন এল, সর্বজয়া কাঁদল, হঠাৎ ব্রেক-ডাউন করল, তখন ওই তার-সানাইটা কার জন্য ? দর্শকের জন্যই হবে ! কারণ দুর্গা তো আগেই মারা গেছে। হরিহর জানতনা, আর সর্বজয়া কাঁদল। হরিহর বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। দর্শকের জন্য যদি হয় তো হি হ্যাজ আন্ডার-এস্টিমেটেড দ্য অডিয়েন্স। ওখানকার চিত্রগুলো দেখে মনে হয় না ওটা হরিহরের জন্য। সেরকম আইডেনটিফিকেশন-এর স্কোপ নেই। আমি অবশ্য 'পথের পাঁচালি' দেখেছি ইওরোপ থেকে ফিরে। ভুলও হতে পারে। কিন্তু এই তার-সানাইয়ে সবার সঙ্গে আমিও ইনফ্লুয়েন্সড। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুব সস্তার জিনিস। সব জায়গায় যেখানে আন্ডারস্টেটমেন্ট সেখানে হোয়াই মিউজিক শুড বি সো লাউড ? আন্ডারস্টেটমেন্টটাই ভাল লাগছে কারণ নিজেদের ইমোশনটা ওই গ্যাপ-এ দিতে পারছি।

হিউম্যান কনটেক্সট এ ধরলে আমি বলব 'পথের পাঁচালি' ইজ এ ভেরি গুড ফিল্ম। কিন্তু ইনডিয়ান কনটেক্সটে ধরলে অনেক তফাত হয়ে যায়। ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ পেলে মনে হয় এ প্রাইজ ফিল্ম-এর জন্য নয়—ভারতবর্ষের জন্য। আর ভারতবর্ষতো ওই দেখানো হয়েছে !

কিন্তু আমি এও ভেবে দেখেছি যে পথের পাঁচালি না থাকলে বাংলা ছবির কী অবস্থা হত ! ইট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফিল্ম অ্যাজ ফার অ্যাজ বেঙ্গলি ফিল্ম ইজ কনসার্নড। এত সিনেম্যাটিক ছবি আর হয়নি।

৫

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালই ছিল। ল্যাবরেটরিতে যখন 'রাশ' দেখতাম, একদিন আমাকে বললেন, 'অনেককে ছবি দেখাচ্ছেন, আমাকে দেখাচ্ছেন না।' আমি কাউকেই ডেকে দেখাইনি। আমার 'রাশ' দেখার সময় ঋত্বিক যদি ঢুকে পড়েন তো আমি

---

*১। 'ইভান দি টেরিবল'-এর সেই বুড়ির খাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে যায়।

২। 'ডি সিকা'র ছবিতে লাল জামাকাপড় পরা দুজন জার্মান পাদ্রীকে ছেলেটা দেখছে—এর সঙ্গে 'অপরাজিত'-তে চীনেরা ছবিঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—এ দুটো দৃশ্যের মিল আছে।

কী করব ? বের করে দিতে পারি ? ঋত্বিক যেমন ঢুকেছিলেন তেমন অনেক টেকনি-শিয়ানরাও আসতেন। কথাটা সত্যজিতের কানে গিয়েছিল। আর 'রাশ' দেখে 'টেকনিক' ছাড়া আর কোনো বিষয়ে কথা বলা যায় না। আমি সত্যজিৎকে বললাম, 'আপনি বললেই দেখাবো।' সত্যজিতের রাগটা হচ্ছে যে আমি ওঁর কাছে যাইনি। যাঁরা যান, তাঁদের ওপর উনি বিরক্ত হন, কিন্তু যাঁরা কোনোদিনও যাননি তাঁদের সম্পর্কে ওঁর মনে মনে শ্রদ্ধা থাকলেও বাইরে কিন্তু যা তা বলেন। আমাকে একবার একজন বন্ধু বলল, 'বিলেত ঘুরে এলে, সত্যজিতের সঙ্গে দেখা করলে না ?' সত্যজিৎ তখন সাউথ ক্যালকাটার পুরনো বাড়িতে থাকতেন। গেলাম একদিন। বললেন, 'লেটেস্ট কী ছবি দেখেছেন ?' আমি বললাম, 'একটা কমার্শিয়াল ছবি দেখলাম, 'অ্যাক্রস প্যারিস'— খুব ভাল লেগেছে। গল্পটা বললাম। জার্মান অকুপেশনের মধ্যে একজন সাধারণ কৃষক আর একজন দালাল টাইপের লোক—একটা বড় ছাগলকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে রান্না করে খাবে। কী ভাবে তারা ছাগলটাকে সাধারণ লোক, গেস্টাপো, আর্মি এদের হাত এড়িয়ে নিয়ে যাবে—এই নিয়ে হিলারিয়াস একটা ছবি। একজন অভিনেতা (বুভ্রিল) ছিল তার চেহারা একেবারে খাঁটি ফরাসি কৃষকের মতো। আমি বললাম, 'এটা আমার খুব ভাল লেগেছে।' বললেন, 'আর; নিউ ওয়েভ ?' আমি বললাম, 'ওতো আগেকার কথা !'

আমার ছবিটা রিলিজ হওয়ার পর একদিন বললেন, 'একটা কার্ড দিন।' আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে দেবেন ?' বললেন, 'ডেভিড ম্যাককারচেন বলে আমার এক বন্ধুকে দেব।' আমি অ্যাড্রেস জেনে নিয়ে নিজেই কার্ডটা পেঁছে দিয়ে এলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনেকে তো নানারকমভাবে ছবি করেছে. আপনিও তো অমনভাবে করতে পারেন।' আমি বললাম, 'যারা করছে করুক। আর একজন লোক বাড়িয়ে কী লাভ ?'

'তেরো নদীর পারে'-র সমালোচনা করতে গিয়ে প্রায় সবাই খারাপ বলেছিল। ব্যতিক্রম জ্যোতির্ময় দত্ত। চৌষট্টি সালে 'স্টেটস্‌ম্যান'-এ ও লিখেছিল— 'দি ফিল্ম ইজ ওয়েটিং টু ক্র্যাক দি স্ক্রিন।' একবার ওকে খুব রাগিয়ে দিয়েছিলাম। এক জায়গায় বসে কয়েকজনের সঙ্গে মদ খাচ্ছিল। তখনকার দিনের কয়েকজন ইন্টেলেকচুয়াল ওই আড্ডায় ছিল। ওদের মধ্যে বিনয় মজুমদার ছিল, একজন অ্যামেরিকান ভদ্রলোকও ছিল। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিল ওরা। এক বন্ধু আমাকে নিয়ে গেছে— আমি চুপ করে বসেছিলাম। জ্যোতির্ময় দত্ত জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কী করেন ?' বললাম, 'আমি তো ছবি করি, তবে ইদানিং কিছু করতে পারছি না।' 'ছবি করেন ? কী ছবি করেছেন ? আমি তো শুনিনি।' আমি বললাম—'তা শুনবেন কেন ? জার্নালিস্ট, ফিল্ম নিয়ে লেখেন, আমার ছবির কথা আপনি শুনবেন কেন ? কোন কারণ নেই—'। আমার পেটে ততক্ষণে হিউজ পড়েছে। শুনে বলল, 'সেকী কথা ? আমায়

ছবিটা দেখান। আর আমি কাউকে সঙ্গে আনতে পারি?' আমি বললাম— 'যাকে ইচ্ছা আনতে পারেন।' তারপর জ্যোতির্ময় দত্তের লেখা বের হল। পড়ে মনে হল— লোকটা স্পিরিটেড, যা ফিল করে, তা লিখতে পারে।

৬

দেবুদার (দেবব্রত মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে খালাসিটোলায় যেতাম। কমল মজুমদারের সঙ্গে ওখানেই আলাপ। যদি কমল মজুমদারের সামনে অন্য কারো সঙ্গে আপনার আলাপ হয়, তবে আলাপটা ডিসটার্বড হয়ে যেতে বাধ্য। কমলবাবুকে সবাই এমন একটা পেডেস্টালে বসিয়ে দিয়েছিল যে ওর সামনে কেউ মুখই খুলত না। মদ খেয়ে কমলবাবু যা বলতেন তার বেশিরভাগই বাজে কথা। কিন্তু যখন লিখতেন, তখন তিনি আর্টিস্ট।

একটা গল্প বলি। খালাসিটোলা থেকে বেরিয়ে আমরা শিয়ালদা অবধি হাঁটতাম। কমলবাবু আর দেবুদা বেলেঘাটার দিকে যেত, আর আমি একটা বাস ধরে চলে আসতাম। কমলবাবু একদিন হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'বারীনবাবু, আজ আপনাকে একটা সিনারিও বলব।' সেদিন শেষ হল না। বললেন, 'আরেকদিন হবে।' পরের দিন আবার দেখা। বললাম, 'কমলবাবু, ওই সিনারিওটা কমপ্লিট হোক।' উনি বললেন, 'কী বলেছিলাম বলুন তো?' আমি বললাম, 'সে তো সম্পূর্ণ মনে নেই—'। কমলবাবু বললেন, 'থাক, আর একদিন নতুন একটা সিনারিও শোনাব আপনাকে।' সব বানিয়ে বানিয়ে বলতেন। লোকটার বানাবার ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। আমি অ্যালবার্ট হলে কোনোদিনই ওঁর টেবিলে বসতাম না। একদিন কমলবাবু একজনকে দিয়ে বলে পাঠালেন, 'বারীনবাবুকে একবার আমার টেবিলে আসতে বল।' টেবিলের কাছে যেতেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে অন্য একটা খালি টেবিলে উঠে এলেন। বললেন, 'আপনি সেদিন 'টার্কিশ কফি' খাওয়ার গল্প বলছিলেন না— তা আমি যখন আরবদেশে গিয়েছিলুম, একবার সেই উটের পিঠে চড়ে—', ওখানে তৎক্ষণে আর একজন এসে জোর করে বসে পড়েছে। বলল, 'কমলদা, আপনি কবে গিয়েছিলেন?' আমি ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনি থামুন তো মশাই!' কমলবাবু ওঁকে দেখিয়ে বললেন, 'কী বলব বলুন দিকিনি বারীনবাবু? এটা একটা কোনো গপ্পো?' কমলবাবু সিম্পলি বানিয়ে বলে যাচ্ছিলেন। উনি জানতেন, কফিটা ওরাই আবিষ্কার করেছে, ওরাই খেত আড্ডা মারার জন্যে, আর উটের পিঠে চড়ে অনেক দূরে চলে যেত শুধু গল্প করার জন্য। এর মধ্যে বৈষয়িক কোনো ব্যাপার থাকত না। আর কফিও খেত একটুখানি। আসলে ওটা ছিল আরব কফি, পরে 'টার্কিশ কফি' বলে পরিচিত হয়। কমলবাবুর ধরনটাই ছিল এরকম কিন্তু এরা সবাই সিরিয়াসলি নিত। সেদিন যে কটা ফরাসি কথা বলেছিলেন সবই খুব কুতিয়ে

কুড়িয়ে বলেছিলেন। বললেন, 'জানেন, আমি তো আরবি জানতুম না, ওরা অনেকে ফরাসি জানে— আমি তাই বললুম', আমি ফরাসি শুনে বুঝতে পারলাম যে ডায়লগগুলো উনি মুখস্থ করে এসেছেন শুধু ওই গল্পটা বলার জন্য। এক্স-টেম্পো বলতে পারবেন না। অবশ্য উনি ফরাসি বই পড়তে পারতেন। আর উচ্চারণটা বিষ্ণুবাবুর মতো খারাপ ছিল না।

৭

ছবি টি.ভি.-তে দেখানো— তার জন্য তদ্বির করা আমার পছন্দ নয়। তিরিশ বছর ধরে একটা ছবি নিয়ে পড়ে থেকে কেউ যদি সেটাকে নার্স করতে আরম্ভ করে, এ যেন, একজন নিকট আত্মীয়— যে অথর্ব হয়ে গেছে, তুমি তার সেবা করে গেলে, তার জন্য খরচ করে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে— এ রকম একটা ব্যাপার। যা করেছি, করেছি— এখন তো দু-বেলা খেতে পাচ্ছি—

অন্যেরা চেষ্টা করলে অবশ্য আমার আপত্তি নেই। দিল্লিতে একটা প্রিন্ট দিয়েছিলাম। ওরা একজনের মারফং মুখে জানিয়েছে যে ছবিটা নতুন সার্টিফিকেটে চলবে না, তাই এখন ক্লাসিক হিসেবে দেখানো হবে।

আমাকে নিয়ে একজন (গৌতম চ্যাটার্জী) একটা ডকুমেন্টারিও করেছিল। ওতে অভিনয়ের জন্য দু-হাজার টাকা আমাকে দিয়েছিল। আমি এখন মনে করি আমার চার-বছর বিদেশে পড়ার কোনো মানে হয় না। টালিগঞ্জে ঢুকে তখন একজন গুরুর কাছে গিয়ে ছবিটা কীভাবে কাটিং হয়, কীভাবে তুলতে হয়, ইউনিটটা কীভাবে চালাতে হয় এসব শিখে নিলেই চলত।

আমাদের দেশে ডিরেকটারকেই প্রোডাকশন-এর কাজ চালাতে হয়। পয়সাকড়ি কাকে কী দেওয়া হবে এসব হিসাবও করতে হয়। অর্থাৎ কাজ করার সময়ে পিওরলি আর্টিস্টিক ফিল্ড আমরা পাই না। ইউনিটের কথা ভাবতে হয়, টেকনিকের কথা ভাবতে হয়। যেমন, বিভিন্ন সিকোয়েন্সে লাইট কতটা দরকার হতে পারে। বেশির ভাগ সময়ে সায়লেন্ট ক্যামেরা ব্যবহার করেছি। চিন্তা করে রাখতে হয়েছে কখন একটা সাউন্ড ফ্যাকটর দরকার হবে— আর তখন সাউন্ড ভাড়া করে নিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া সিনক্রোনাইজেশনের সমস্যা আছে। এরকম নানা প্রবলেম আমাদের দেশে ডিরেকটারকেই সল্‌ভ করতে হয়, ডিরেকটারই প্রোডিউসার হয়ে যায়। কাকে কত দেবে, খাওয়াতে কত খরচ— প্রায় ম্যানেজারের কাজ। আর ম্যানেজার যে থাকে সে বাজার-সরকারের কাজ করে। □

দেবীপ্রসাদ ঘোষ

তিতাস খুঁড়ে

বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ

তিতাস একটি নদী মাত্র···কিন্তু তাই বলিয়া তার কি সত্যি কোনো ইতিহাস নাই ?[১] চৈতন্যের ঠিক সেখানটায় ইতিহাস-বোধ কাজ করে, জীবন চর্যায় যেখানে ইস্টি-কুটুমের দ্বন্দ্ব প্রায় সবটাই ধন্দের আস্তরণে ঢাকা পড়ে যেতে পারে ইতিহাসের পঙক্তিমালা, ওই ঘোর অমানিশা থেকে তুলে সঠিক ওজনের শব্দকটি প্রবাদ প্রতিম লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ আঘাত হানতে পেরেছেন। যে স্থবিরতার কালে মগজের স্নায়ুগুলি ক্রমশ জটের আকার নিয়ে— শুধুমাত্র ভোঁতা নয়, অন্ধত্বের আর এক আবরণে স্লেজ গাড়ির মতো টেনে নিয়ে গেছে— অক্ষর বিন্যাসের নৈঃশব্দ চেতনা আরও এক ইতিহাস-সন্ধানীর প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। শব্দ দ্যোতনা পালন করে এক অনির্দেশ্য ভূমিকা। ঔপন্যাসিক কখনই ম্যানিফেস্টোর ভূমিকা নিয়ে আসরে নামেন না (তাই রক্ষে), ব্যাখ্যার প্রগলভ-তায় খুলে দেন আরও এক সঞ্জীবনী-কবচ। একই উপন্যাসে দেখা পাওয়া যায়— 'পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বৌ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে আঁকা রহিয়াছে।'[২] লেখক জানিয়েছেন 'সে ইতিহাস সত্য।'

এই সত্যাসত্যপর্বের ইতিহাসটুকু বুঝে নিতে লেখক আমাদের যেটুকু সাহায্য করেছেন সেটিও বিশেষভাবে উল্লেখ্য— 'সত্যের মতো গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ।'[৩] 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে ঔপন্যাসিকের এই দৃষ্টিকোণগুলি যদি সামান্য সামলে নিতে পারি তাহলে উপন্যাসপর্বে ইতিহাসের ধারাটিকে অনেকাংশেই যোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারব। উপন্যাসের এই ব্যাখ্যা অনেকক্ষেত্রেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও, আলোচ্য উপন্যাসটির প্রবহমানতা পাঠকদের, বিশেষভাবে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণমুখী করে তুলেছে। জীবন-আহৃত রচনা দেশ-কাল নিরপেক্ষ হতে পারে না, সে তো বলাই বাহুল্য। অথচ কীভাবে জীবন সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে তার একটি সফল আর সার্থক উদাহরণ 'তিতাস'।

আলোচ্য বিষয় সমগ্র উপন্যাসটির ব্যাখ্যান নয়, একটি খণ্ডিত অংশ। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব 'প্রবাস খণ্ড'-এ ঔপন্যাসিক মাঘমণ্ডল ব্রতকথার বিবরণ দিয়ে আখ্যানভাগ

শুরু করেছেন। যে-সব মানুষজনের কথা অদ্বৈত বলতে চেয়েছেন তিতাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে, তাদেরই প্রারম্ভিক পাঠ ঐ ব্রতের উদ্‌যাপন থেকে উপন্যাসের ক্রমপরিণতিতে। অবশ্য একথা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না 'তিতাস' উপন্যাসের বিষয় মালোদের জীবন। অতি সাধারণ বর্ণনার ভেতর দিয়ে পাঠকদের গ্রামটির সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন লেখক।[৪] কোনো বাহুল্য নেই, সহজ-সরল ভাষায় গ্রামের মানুষজনের পরিচিতি পেয়ে উপন্যাসের পরবর্তী অংশে এগিয়ে যেতে কোনই অসুবিধা ঘটে না। যে কারণে বিষয়টি আমাদের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে, নদীর বাঁক থেকে উপন্যাসের বাঁকটি কত সাবলীল ভঙ্গিমায় একই হাতার মধ্যে চলে আসে। ব্রত অনুষ্ঠান গ্রামে একটি বাৎসরিক উৎসব। জীবন-মৃত্যু এই চক্রের আবর্তনে ব্রত একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে।[৫]

কথকতার ইতিহাস

ছাপা অক্ষর বা দৃশ্য সংযোজন পর্বের চলতি ইতিহাস-ধারণা এ যাবৎ আমাদের কাছে একমাত্র ইতিহাস বর্ণনের চেহারা পেয়ে এসেছে। কিন্তু ইতিহাসের অপরাপর শাখায় মানুষের জীবন-ছন্দের বর্ণনা এতটাই ব্যক্ত হয়েছে, যেখানে সমাজের পূর্ণ অবয়ব ধরা পড়েছে। হামেশাই দেখা গেছে, ছাপা অক্ষরে বা ভিস্যুয়াল ইমেজের মধ্যে দিয়ে অনেক অসত্য কথা প্রতিফলিত হয়েছে, পরবর্তী সময়ে ঐতিহাসিকদের কাছে বিষয়টি হয়ে দাঁড়িয়েছে বিড়ম্বনার। অন্যদিকে অক্ষর জ্ঞানের পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও বংশ পরম্পরায় মৌখিক প্রকরণে যে ইতিহাস চলে আসে— তাতে জীবনযাত্রার যে ছবি ফুটে ওঠে, সেটিও নানাভাবে নির্ভরযোগ্য। চলতি ইতিহাস-বেত্তারা এই ধারাকে প্রথমদিকে বিশেষ আমল দিতে চাননি। অথবা পদ্ধতির ভেতরে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, এ কথা বলা চলে।

'সত্যের মতো গোপন হইয়াও বাতাসের মতো স্পর্শপ্রবণ।' এই বাক্যটির মধ্যে একটি শব্দ 'হইয়াও' যথেষ্ট অনুধাবনযোগ্য। অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর উপন্যাসে সামান্যতম মেদ রাখেননি, বরং বর্জন করেছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দ একেকটি ভিন্নমাত্রা যোগ করে। লোকসাহিত্যের ইতিহাসপর্বে ঐ শব্দের অনুবর্তনে এগিয়ে যাব। তবুও এখান থেকে অন্য-আর-একটি বাঁকের সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশে ওরাল হিস্ট্রি-র চর্চা এখন বহুল পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি এদেশেও। এই ভিন্ন ধারাটিকে 'কথকতার ইতিহাস' বলেই অভিহিত করব।

ইতিহাসের প্রয়োজন তার সামাজিক জীবনের মধ্যেই প্রোথিত থাকে। বিশেষভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস ব্যাপক অর্থে তার চরিত্রের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে। পরিবর্তনের এ-ধারা সাধারণ চোখে অনেক সময় ধরা পড়ে না, বলা

উচিত অনেক উপেক্ষার গ্লানি নিয়ে চলে যায়। কিন্তু অঞ্চলের মানুষের কাছে, ঐ অঞ্চলের নতুন প্রজন্মের কাছে সেটি নানা আকারে নানা প্রকারে বাঁধা থাকে। কথকতার ইতিহাস এই সামাজিক দায়কে স্বীকার করেই, প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।[৬]

সামাজিক বিবর্তনের চিহ্নগুলিকে যদি না ধরে রাখা যায়, জাতির জীবনের সূত্রগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। এসব আমাদের জানা, অচেনা কিছু নয়। তবে কথকতার ইতিহাসটি অন্য দিগদর্শনের বিষয়টি তুলে ধরে, তা হল নির্দিষ্ট সমাজের মানুষকে তাঁর ইতিহাস রচনায় সাহস জুগিয়ে থাকে। ফলে গোষ্ঠী উদ্ভূত ইতিহাসকার যে তথ্য ও তত্ত্বের সন্নিবেশ ঘটান সেটি আর কেউ, তিনি যতই পারদর্শী হন না কেন, পারেন না। 'তিতাস একটি নদীর নাম' আকার-আকৃতি-আয়তন নানাদিক থেকে পাঠকের কাছে যতটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠুক না কেন, উপন্যাসটির অন্যতম সম্পদ হল, গোষ্ঠী উদ্ভূত লেখক। উপন্যাসের শৈলীতে এটি উত্তীর্ণ। অদ্বৈত সম্পর্কে একটি আলোচনা প্রায়শই করা হয়ে থাকে— মালো পরিবারভুক্ত। ব্যাপারটি সত্যিকারের নিন্দনীয়, বর্ণবৈষম্যের শিকার। বর্ণ হিন্দুর ব্যাখ্যাকর্তারা প্রগতিশীলতার যতই ধ্বজা ধরুন না কেন, প্রচ্ছন্নে তাঁরা শ্রেণী প্রবক্তা হয়ে থেকেছেন, অন্তত এই একটি বিষয়ে। কিন্তু কথকতার ইতিহাস-এর প্রবক্তা হয়ে অদ্বৈতকে কখনই নজরের মধ্যে আনেননি। এই সুমেরু ব্যবধান নতুন কোন সন্ধান দেয় না 'তিতাস' সম্পর্কে। উপন্যাসের গতানুগতিক আলোচনা বিশেষ কোন উপলব্ধি ঘটায় না। 'তিতাস' এবং অদ্বৈতকে একই সঙ্গে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোন বিবর্তন যদি না আনা যায় তাহলে উপন্যাসটির গঠন বৈচিত্র্য বহুলাংশে খর্ব হবে। এমনকি উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য।

তাকেই বলি ব্রত

ছড়া নিয়ে এ যাবৎ যত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে, সেগুলির বেশিরভাগ বিশ্লেষণমূলক রচনা। কোনটির উল্লেখ না করেও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ-কৃত ব্যাখ্যাকে আরও বিশদ করে নিবন্ধকারেরা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ১৩০১ সালে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় 'ছেলে ভুলানো ছড়া' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন সেটির প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন, 'বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে সব মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম।'[৭] রবীন্দ্রনাথ যে ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি সাধারণত স্ত্রী সমাজের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আচার আর ধরনের দিক থেকে ছড়াগুলি ছিল মেয়েলি। ১৮৯৪ সালে পূর্ব বাংলার পল্লীঅঞ্চলে বাসকালীন রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রে'র পত্রগুচ্ছ রচনা করেছিলেন, তখন 'ছড়া' নামে একটি প্রবন্ধ (ছিন্নপত্র ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) রচনা

করেন। প্রবন্ধটি ১৩০১ সালের ১৬ আশ্বিন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথ এক সভায় পাঠ করেন। ঐ সময়েই প্রবন্ধটি 'মেয়েলি ছড়া' নামে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনের ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ বিশ্বজ্ঞানের নানা দুরূহ বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্পর্কে লিখেছেন— 'কাল র-র সঙ্গে মেয়েলি ছড়া নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম, তিনি বুঝতে পারেননি।'[৮] এই উদ্ধৃতিগুলিই মালুম দেয় রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ সময় ধরে লোকসংস্কৃতি বিষয়গুলি নিয়ে ভাবিত ছিলেন না, এ বিষয়ে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের আগে খ্রিস্ট-ধর্মপ্রচারকদের কেউ কেউ বাংলাভাষা শিক্ষা লাভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা লোক সাহিত্যের অন্যতম বিষয় 'প্রবাদ' সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছিলেন একথা সত্য। কিন্তু তাঁদের সংগ্রহের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র।

ছড়া যে কেবলমাত্র শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্ট, এগুলির সঙ্গে পরিণত মানুষদের কোন সম্পর্ক নেই তা বলা যায় না। প্রধানত শিশুদের জন্য রচিত হলেও ছড়া রচয়িতা কখনই শিশু নয়। পরিণত মানুষ শিশুর উপযোগী করে শিশু মনস্তত্ত্বের কথা অবহিত হয়ে এগুলি রচনা করেছেন। আবার পরিণত মানুষ তাঁদের নিজেদের প্রয়োজনে, নিজেদের ব্যবহারের জন্যও ছড়া রচনা করেছেন। স্বভাবতই শিশুদের ছড়ার মতো বৈষয়িক ব্যাপার মুক্ত নয়। বরং বিপরীতটাই নির্ভরযোগ্য— অর্থাৎ বৈষয়িক প্রয়োজন সিদ্ধির সহায়ক হিসাবেই এই ছড়াগুলির উৎপত্তি। এগুলিই হল ব্রতের ছড়া।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ছড়ার ক্ষেত্রেই পাঠান্তরের পরিমাণ সব থেকে বেশি দেখা যায়। এই পাঠান্তর বিশেষ বিশেষ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, উপমা বা বর্ণনার ক্ষেত্রেও অবাধ পার্থক্যের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন মূলত বিজ্ঞান সাধক। ১৩০৬ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার সংকলিত 'খুকুমণির ছড়া' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন— 'মনস্তত্ত্ববিদ্ ও সমাজতাত্ত্বিক এই সাহিত্য হইতে বিবিধ সত্যের আবিষ্কার করিতে পারেন। মনুষ্য জীবনের একটি বৃহৎ অংশের দুর্জ্ঞেয় রহস্য এই অনাদৃত সাহিত্যের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।'

ব্রত একান্তভাবে স্ত্রী সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একইভাবে ব্রতের ছড়াও ঐ সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ। এ কারণেই ব্রতের ছড়াগুলি ছেলেভুলানো ছড়ার মতো বহুল প্রচারিত না হবার সম্ভাবনাই বেশি করে থেকে গেছে। এছাড়া রয়েছে ব্রতের আচার অনুষ্ঠান— এর সাহায্য ছাড়া এই ছড়ার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন সুধীরচন্দ্র রায়— 'ছড়াকে লৌকিক সাহিত্য বলা যায় না, লৌকিক সাহিত্য তার কাঠামো। ছড়াকে নিতান্তই মেয়েদের গার্হস্থ্য সাহিত্য বলা যায়। গার্হস্থ্যে যেটুকু মেয়েদের সুকুমার মনটি প্রভাব বিস্তার করেছে সেইটুকুর উপর স্নেহের প্রলেপ ঘটিয়েই এর রচনা।'[৯] অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। 'মাঘমণ্ডল' প্রবন্ধে

তিনি 'ছড়া বা মন্ত্র' এই শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন।[১০]

প্রকারভেদ

প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য-বিচার প্রণালীর সঙ্গে লোকসাহিত্য বিচার প্রণালীর এক মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ লোকসাহিত্য আন্তঃবিদ্যার (Interdisciplinary subject) অপেক্ষা রাখে। শুধুমাত্র সাহিত্য জ্ঞানের দ্বারা লোক সাহিত্যের রস আস্বাদন সম্ভব হলেও এই সাহিত্যের প্রকৃত মূল্য আবিষ্কার করা সম্ভব হয় না।[১১]

মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে এই মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কে বিচারটি যদি স্বচ্ছ করা যায় তাহলে পরম্পরাগত ঐতিহ্যটিকে বুঝতে সাহায্য করে। কেননা বিশুদ্ধ মেয়েলি ব্রতগুলি ঠিক কোন শাস্ত্রীয় দেব-দেবীকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেনি। অনেক পরিমাণে এটি মাটির কাছাকাছি। এই 'মেয়েলি ব্রত' সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব, কতক চিত্রকলা, নাট্যকলা, গীতকলা ইত্যাদি মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া…।' অন্যদিকে এই ব্যাখ্যার পরিধিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন— 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।'[১২]

মাঘমণ্ডল ব্রতে সূর্যের অভ্যুদয়কে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। 'স্থান ভেদে এই ব্রত সূর্যব্রত, লালঠাকুরের ব্রত, সিঁড়ি পূজা' নামেও অভিহিত করা হয়।[১৩] সূর্যের বর্ণনা করে বিভিন্ন কাহিনী ব্রত উপলক্ষে গাওয়া এবং কথকতা করা হয়ে থাকে। যেমন বেহুলা-লখীন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী বহুল প্রচলিত, তেমনি লহনা ও খুল্লনা-র কাহিনী এই ব্রতে শ্রদ্ধার সঙ্গে গাওয়া হয়ে থাকে। রামজীবন এই কাহিনী অবলম্বন করে একটি সূর্যের পাঁচালি রচনা করেন (১৬৩১ শক)। এই পাঁচালি চট্টগ্রামের জীবেন্দ্রকুমার দত্ত সংগ্রহ করে 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় (১৩শ খণ্ড) ছাপেন। পরে শরৎচন্দ্র মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters-এ (১৫শ খণ্ড) ইংরেজিতে অনুবাদ করে ছাপেন। একটিতে সূর্যদেবের বাল্য-লীলা, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' ১ম খণ্ড-এ ছাপেন। এছাড়া বাংলাদেশের ফরিদপুরের কোটালি পাড়া থেকে সূর্যের একটি পাঁচালি সংগ্রহ করেন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী।[১৪] তাঁর প্রকাশিত পাঁচালি থেকে জানা গেছে এই ব্রত শ্রীহট্টে প্রচলিত মাঘব্রতের অনুরূপ। আরও একটি 'শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত'র সন্ধান পাওয়া যায়।[১৫] এটি শ্রীহট্ট জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত। রামপ্রাণ গুপ্ত 'ব্রত বিবরণ'এ (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৯) ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমা ও ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের লৌকিক ব্রতগুলির যে বিবরণ দাখিল করেছেন তাতে 'মাঘমণ্ডলের' কোন

উল্লেখ নেই। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে মাঘমণ্ডল নেই। পরিবর্তে বালিকারা অগ্রহায়ণ মাসে ইতু পুজো করে থাকে। যদিও এটি সূর্য পুজো। মাঘমণ্ডল ব্রত অনুষ্ঠানের সময়কাল একই, অর্থাৎ মাঘ মাস জুড়ে।

'তিতাস' উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রবাস খণ্ডে মালোপাড়ায় প্রবেশের গোড়াতেই লিখছেন, 'মাঘ মাসের শেষ তারিখে সেই মালোপাড়াতে একটা উৎসবের ধুম পড়িল। এটা কেবল কুমারীদের উৎসব। নাম মাঘমণ্ডল ব্রত।' উপন্যাসের এ পর্বে অন্য বিষয়টির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর মুখবন্ধে জানানো হয়েছে— 'প্রথমত মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইতে ছিল— গ্রন্থটির কয়েকটি স্তবক মুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন সময় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি রাস্তায় হারাইয়া যায়।' এই সংবাদ একদিকে পাঠকের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা অদ্বৈত আবার উপন্যাসটি লিখতে বসেন এবং সমাপ্ত করেন। কাজটি যে খুব সহজ নয় সেটি পাঠককে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। এক ধরনের পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়া কখনই লেখা সম্ভব হতে পারে না, অন্তত 'তিতাস' গোত্রের উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের বলার বিষয়টি এখানে, উপন্যাস কাগজে-কলমে লেখার বহু আগেই তিনি একটি উপন্যাসের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে যেটা জরুরি। তিনি বহু আগেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন মালো জীবন আর সেই সঙ্গে লোকসংস্কৃতি সংগ্রহে হয়ে উঠেছিলেন পারদর্শী।[১৬]

কাটা-ছেঁড়ার মধ্যেই জন্ম নেয় মহৎ শিল্পকর্ম। কখনও সম্পূর্ণ বর্জন বা কখনও নতুনভাবে সংযুক্তির ভেতরে থাকে উপন্যাস প্রক্রিয়ার জটিল অধ্যায়গুলি। হয়ত এর ফলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের সংগৃহীত লোকসম্পদে উপন্যাসে সামান্য পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। এ ক্ষেত্রে মাঘমণ্ডল ব্রতে সেটি দেখা গেছে। একটি বিষয়ে জ্ঞাত করানোটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, উপন্যাস-পর্বে প্রবেশ করার আগে মল্লবর্মণ চাকুরি সূত্রে 'নবশক্তি' পত্রিকায় যোগ দিয়েছিলেন। এবং পরবর্তী কালে ঐ পত্রিকায় সম্পাদক রূপে দীর্ঘ চার বছর সেখানে ছিলেন। ঐ পত্রিকায় তিনি লোকসংস্কৃতি নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। পঞ্চাশের বেশি বছর আগে এ জাতীয় একটি পত্রিকায় লোকসংস্কৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করাটা অবশ্যই লক্ষণীয়। আর মল্লবর্মণের রুচির প্রতিভাস সম্পর্কে আশা আরও বাড়িয়ে তোলে, কেননা পত্রিকাটির প্রায় সম্পূর্ণ একক দায়িত্বে ছিলেন তিনি। অভিজ্ঞতা ও চর্চা মিশিয়ে যে উপন্যাস তিনি রচনা করেন তা অন্তত বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রম হিসাবেই চিহ্নিত হয়েই আছে। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় মাঘমণ্ডল ব্রত, সেটি 'নবশক্তি' পত্রিকায় ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয়।

অদ্বৈত অপর যে কারণে স্বতন্ত্রতার দাবি জানাতে পারেন তা হল, তাঁর সংগৃহীত মাঘমণ্ডল ব্রতটি অপরাপর সংগ্রহ থেকে একেবারেই আলাদা। জানি যে সূর্যব্রতের আর একটি রূপ হল মাঘমণ্ডল। অচ্যুতচরণ চৌধুরী 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে ব্রতটির অপর

নির্দেশিকা দেন। তাতে তিনি দেখিয়েছেন— 'অভিভাবকগণ তণ্ডুল, হরিদ্রা, ইষ্টক চূর্ণ এবং আবির দ্বারা প্রত্যহ বেদীর ব্রতস্থান চিহ্নিত করিয়া দেয়।'[১৭] অদ্বৈত যে মাঘমণ্ডলের উল্লেখ করেছেন তাতে অভিভাবকের স্থান নেই, রয়েছে ব্রতচারিণী মেয়েরা। মনে হয় 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে যে সমাজের উল্লেখ রয়েছে সেটি সম্ভবত কোন উচ্চ শ্রেণীর। নিম্নবর্গের মানুষেরা, তাদের ব্রত উদ্‌যাপনে অভিভাবকদের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা থাকলেও, প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকাই থাকে না।

সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত 'শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত'-এর লেখক জানিয়েছেন, 'জেলার সদর মহকুমায় প্রচলিত মাঘব্রতের মন্ত্রগুলি কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া গ্রাম্যভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইল।' এই লিপিবদ্ধ ব্রতগুলি থেকে মল্লবর্মণের সংগৃহীত ব্রতগুলির পার্থক্য কোথায় সেটি দেখবার চেষ্টা করব। প্রথমে সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের ব্রত ও পরে মল্লবর্মণের ব্রতগুলি পরপর সাজিয়ে দেওয়া গেল—

চন্দ্র পূজা—

১. চান্দ আইলা চন্দনে,
সুরুয আইলা বন্দনে
পিড়ত্তিম আইলা আসিয়া
মুই বর্ত্ত করি সিঙ্গাসনে বসিয়া।

২. চান্দ পুজলাম চন্দনে
সুরজ পুজলাম বন্দনে
চান্দ পুজ্যা পাইলাম স্থান
সুরজ পুজ্যা স্বর্গ ধাম।

পৃথিবী পূজা—

১. পিড়ত্তিম পূজি তিনকূণা,
রাজ্য পূজি সম্পূর্ণা।
পিড়ত্তিম পূজি পাইলাম বর,
বিষ্ণুপুরী মর ঘর।

২. তিনকোণা পিরথিবী জলে যায় ভাসিয়া
বর্ত্তি ভইনে বর্ত্ত করে সিংহাসনে বসিয়া।

পুকুরের পূজা—

১. পুকুরির কূল লাঙ্গলের মাটি,
(আমার) বাপ্ ভাই আউকা লুয়ার কাটি।

২. মামা দিছে পুষ্কর্ণি, ভাগনা দিছে পার
শুয়া পক্ষে পানি খায়,
সমুদ্দুর শুকায়া যায়।

মাঘমণ্ডল পূজা—

১. মাঘমণ্ডল সুণার কুণ্ডল, বাপ রাজা ভাই পরজা ;
আপনে বিদ্যাধরী, মাই পটেশ্বরী ;
কবলির গুবর ভিঙ্গার পানি, জন্মে জন্মে আয় রাণী।

২. মাঘমণ্ডল সোনার কুণ্ডল
বাপ রাজা ভাই বাদসা
মা বিদ্যাধরী
বছরে বছরে পূজা করি।

এ ছাড়া অদ্বৈত অপর যে দুটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন— বাজপাখি মন্ত্র ও ঘোড়া মন্ত্র সেগুলি সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংগ্রহে নেই।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কর্তৃক সংগৃহীত 'বঙ্গে সূর্য্য পূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালী'তে সূর্যদেবকে নিবেদন করে 'সূর্য্যের জাগরণ' অংশে ছিল—

ওঠো ওঠো রাউল (রাজা / যোদ্ধা) ঝিকি মিকি দিয়া।
সুবর্ণের পঞ্চম খাড়ু (অলংকার) নিশিরে থুইয়া ॥
নিশিরে থুইয়া না লো ঝাপুর ঝুমুর।
আমাদের রাউলের হাতে তাম্বুল ॥
হাতে তাম্বুল না লো পাছে থুইয়া।
নিয়া গেল বাওন ঝি কোলে করিয়া ॥···

অদ্বৈত কর্তৃক সূর্য বন্দনা অবশ্যই অঞ্চলের প্রভেদগত কারণে পৃথক হতে বাধ্য। প্রাসঙ্গিক ভেবে সেটির উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

লও লও সুরুয ঠাকুর লও তোষের জল
মাপিয়া জুখিয়া দিমু সপ্ত আঁজল
সপ্ত আঁজল নারে এক আঁজল ঊনা
ঊনা দুনা ভইরা দিমু নাইওরের সোনা
নাইওরের সোনা নারে হাঁটুগুটু পানি
তাথে দিয়া আইলাম সূর্য্যের পানি।

শ্রীহট্ট জেলার আর একটি মন্ত্র (সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য)—

ল-ল সুরুযাই সতে কুরু পানি,
লেখিয়া জুকিয়া সাত কুরু পানি।
সাত কুরু পানি মর সাত ডালে যায়,
এক কুরু পানি দিয়া রাইচালি খেলায়।
রাই চালি খেলাইতে খেলাইতে ফুটি আইল কাট,

ঘাইট ঘিলা বাটরে সুরযাইর বেটা
এক হাতে ঘাইট ঘিলা আর হাতে তেল,
নাইবারে সুরযাই কুন ঘাটে গেল।
নাইয়া দুইয়া রদিৎ দিল পিঠ, তাৎতনে
পড়িয়া গেল সৎর ভইনের দিশ।
সৎর ভইন মর সৎর রাণী,
উঠিয়া দেউকা জুকার কিনি।
উঠিতে ঝকমক পড়িতে রাঙ্গা,
মাসাবদি মাঘাইর সেবা
মাঘাইর বর্ত্তি ভইন না খাও গুয়া
আমার বাপ ভাই পাণ্ডহরের সুয়া।
পাণ্ডহরের সুয়া মর ভাই সব রে
চন্দনে লেপিল মর সব গারে।

বিশ্বব্যাপী একটা ব্রত-অনুষ্ঠান

আবার উপন্যাসে ফিরে আসি। দুঃখের বিষয় অদ্বৈত একেবারে ভিন্ন ধারার মানুষ ছিলেন। প্রচারমুখী ছিলেন না। ফলে ঔপন্যাসিককে অনুধাবন করতে এখন উপন্যাস নির্ভর হয়েই চলতে হবে। তাঁর জীবন উপন্যাসে ছায়া ফেলেছে, কিন্তু উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। এই একটি মাত্র কারণে তাঁর উপন্যাস 'তিতাস' আন্তঃবিদ্যার সহায়ক হয়ে ওঠে।[১৮]

উপন্যাসের চারটি খণ্ড। প্রতিটি খণ্ড আবার দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। ১. তিতাস একটি নদীর নাম, প্রবাস খণ্ড। ২. নয়া বসত, জন্ম মৃত্যু বিবাহ। ৩. রামধনু, রাঙানাও। ৪. দুরাঙা প্রজাপতি, ভাসমান। ধ্রুপদী উপন্যাসে জীবন নদীর মতোই বহমান। তাই প্রবাস খণ্ডে দেখি বিবাহের জন্য মালো পাড়ার মেয়েরা দলে দলে মাঘমণ্ডলের পুজো করে। কিন্তু ঔপন্যাসিক চিত্রিত বিষয়টি দেখাবার আগেই এটা বলে নিতে সামান্য দ্বিধা করেন না—'এ পাড়ায় কুমারীরা কোন কালে অরক্ষণীয়া হয় না। তাদের বুকের উপর ঢেউ জাগিবার আগে, মন যখন থাকে খেলার খেয়ালে রঙিন, তখনই একদিন ঢোল সানাই বাজাইয়া তাদের বিবাহ হইয়া যায়।' এই প্রবহমানতাকে খান্-খান করে অদ্বৈত মাঘমণ্ডলের বিবরণ থেকে চলে আসেন—'প্রতি বছর একই রকম তালে তারা ঢোল আর কাঁসি বাজায়। আজও সেই রকমই বাজাইতেছে। সবই একই রকম আছে, পরিবর্তনের মাঝে দুখাইর ঢোলটা আরও পুরানো হইয়াছে, তার ছেলেটা আরও বড় হইয়াছে।' এর পরের অংশেই উপন্যাসের ন্যারেটিভে ঢুকে পড়েন— 'বাসন্তীর মাথায় জবজবে তেল, পরনে মোটা শাড়ি। এই কালকের থেকেই যেন আজ তাকে অনেকখানি

বড় দেখাইতেছে। এখানে সমগ্র উপন্যাস আলোচ্য বিষয় নয়, যে মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনা উপন্যাসের শরীরে লেগে রয়েছে সেখান থেকে এই সূত্র-সন্ধানটি মেলে— উপন্যাস ছাপিয়ে জীবনের সন্ধানেই পাঠকদেরকে ঠেলে দেন। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সাফল্য। অদ্বৈতের পা ডোবানো রয়েছে দেশের মাটিতে। □

১. তিতাস একটি নদীর নাম : অদ্বৈত মল্লবর্মণ / ১৩৯৮ / পৃ. ২৬

২. তিতাস··· / পৃ. ২৬

৩. তিতাস··· / পৃ. ২৭

৪. তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে-বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মটকি, ঘরে ঘরে চরকি, তকলি— সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়াই মালোদের সংসার।— তিতাস··· / পৃ. ৩৩

৫. 'কিছু কামনা ক'রে যে অনুষ্ঠান সমাজে চলে তাকেই বলি ব্রত।' —বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১৩৮৩ / পৃ. ৫

৬. The challange of oral history lies Partly in relation to this essential purpose of history,—The voice of the past : Paul Thomson. / 1978 / p. 2

৭. রবীন্দ্রনাথ ও লোক সাহিত্য : আশুতোষ ভট্টাচার্য / ১৯৭৩ / পৃ. ২০

৮, ঐ / পৃ. ১৭

৯. বাংলা লোক-সাহিত্য চর্চার ইতিহাস : বরুণকুমার চক্রবর্তী / ১৩৮৪ / পৃ. ১৩৩

১০. পূজার সময় মেয়েরা কতকগুলি ছড়া বা মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া থাকে। —মাঘমণ্ডল : অদ্বৈত মল্লবর্মণ / বারমাসী গান ও অন্যান্য— দেবীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত / ১৯৯০ / পৃ. ৫৯

১১. বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি : দুলাল চৌধুরী / ১৩৭৬ / পৃ. ১৭৩

১২. বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১৩৮৩ / পৃ. ৬

১৩. মাঘমণ্ডল / পৃ. ৫৯

১৪. বঙ্গে সূর্য্য পূজা ও সূর্য্যের নূতন পাঁচালি : চিন্তাহরণ চক্রবর্তী / সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / ১৩৪০

১৫. শ্রীহট্টে মাঘ-ব্রত : সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য / সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা / ১৩৪০

১৬. মাঘ মাসের ত্রিশ দিন তিতাসের ঘাটে প্রাতঃ স্নান করিয়াছে; প্রতিদিন স্নানের শেষে বাড়িতে আসিয়া ভাঁট ফুল আর দূর্বাদলে বাঁধা ঝূটার জল দিয়া সিঁড়ি পূজিয়াছে, মন্ত্রপাঠ করিয়াছে: 'লও লও সুরজ ঠাকুর লও ঝূটার জল, মাপিয়া জুখিয়া দিব সপ্ত আঁজল।'—তিতাস··· / পৃ. ৩
মল্লবর্মণ লিখিত মাঘমণ্ডল প্রবন্ধে ভিন্ন পাঠ আছে। 'লও লও সুরুয ঠাকুর লও তোষের জল / মাপিয়া জুখিয়া দিমু সপ্ত-আঁজল'···। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত···তখন কিন্তু পত্রিকায় প্রকাশিত অংশে প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব প্রবাস খণ্ড···সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।—অদ্বৈত মল্লবর্মণ ১৯১৪-১৯৫১ : শান্তনু কায়সার / ঢাকা ১৯৮৭ / পৃ. ৩৩

১৭. শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত : অচ্যুতচরণ চৌধুরী ১ম খণ্ড / ১৩১৭ / পৃ. ৯৩

১৮. মেয়েদের মধ্যে ব্রতগুলি এখন যে ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাকেই ব্রত অনুষ্ঠানের আদর্শ বলে নিতে পারি কি না প্রথমে সেটা দেখা যাক: ···মানুষের এবং সব জীবেরই, বিচিত্র কামনা চরিতার্থ হবার পূর্বে বিচিত্র চেষ্টায় আপনাকে ব্যক্ত করে। ···মানুষ আজীবন কামনা ও তার চরিতার্থতার নানা ক্রিয়া করে চলেছে। কী অনুষ্ঠান করলে যে কী হবে তার কতক মানুষ আপনা হতেই আবিষ্কার করে, কতক দেখে শিখে নেয়, কতক ঠেকে শিখে নেয়···। জীবনের কামনা যতক্ষণ না মরণে গিয়ে থামছে ততক্ষণ···।
—বাংলার ব্রত : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর / ১৩৮৩ / পৃ. ১৩ □

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্মোহন

মোমের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলে— ধীরে জ্বলে আমার টেবিলে;

মণীষার বইগুলো আরো স্থির,— শান্ত— আরাধনাশীল;

...

তারি পাশে তোমারো রুধির কোনো বই— কোনো প্রদীপের মতো আর নয়।

২৮৩ পৃষ্ঠায় বিষয়টি ছিল।

এভাবে মনে পড়ছে স্মৃতিক্ষয়ের দরুন, বইটির নাম (শহিদনামা ?), তার লেখক, প্রকাশকাল ইত্যাদি প্রভৃতি জলের ধারায় মুছে গিয়েছে, যা-যা মনে আছে সেইসব তথ্যাদি পরপর সাজিয়ে গেলে একটি ষড়ভুজের আকার পাওয়া সম্ভব, আবার সেই আকারটি প্রকৃতিতেও আছে, যেমন মৌচাক।

এখন যে জন্য ২৮৩ পৃষ্ঠা, সেখানে আট দশ লাইনে অমরতাপিপাসু এক লেখকের কথা বলা হয়েছে। পলিথিনের একটি প্যাকেটে স্বরচিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যত্নের সঙ্গে মুড়ে নিয়ে ওই লেখক ছ'তলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি ভেবেছিলেন এতে মানুষ এমন তড়িদাহত হবে যে তাঁর বইটি প্রভূত যত্নের সঙ্গে ছাপা হবে। লোকজন গভীরভাবে মনোযোগী হবে বইটি সম্পর্কে। লেখার গুণমান নিয়ে তাঁর কোনও সংশয় ছিল না। তিনি জানতেন শুধু মানুষের নিবিষ্ট, গাঢ় দৃষ্টি না-পাওয়ায় কত না মূল্যবান পাণ্ডুলিপি অন্ধ থেকেছে। উইয়ে কেটেছে। নিজের মৃত্যুই তাঁর রচনার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান, সেরা উপহার হতে পারে বলে মনে করেছিলেন। এবং আছড়ে পড়েছিলেন মৃত্যুর বুকে। বা, এই মৃত্যু ছিল একপ্রকার জীবনদান। মুঘল বাদশা যেমন তাঁর ছেলের জন্য করেছিলেন। 'ভালবাসা' শব্দটি শূন্য, অনুভূতি তাকে বিস্ফোরক করে তুলতে পারে— এই জাতীয় কোনও কথা বলেছিলেন পাতিপুকুরের ফুল মেসো। মৃতদের জীবন আমরা বয়ে বেড়াই, স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে থাকে তারা। অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় ফুল মেসো শুধু সেই কারণেই মাটি ফুঁড়ে জেগে ওঠেন এমন নয়। জীবনের শেষ ক'টা বছর তিনি বাড়ির বাইরে পা দেননি তবে শুতেন দরজা খুলে রেখে, ব্যক্তিগত বলেও কিছু ছিল না। তাঁর ছেলে মৃগাঙ্কদা বলেছিল 'বাবা নিষ্ক্রিয়তার চর্চা করতেন।' মৃগাঙ্কদার ভাষা ব্যবহার গোলমেলে, ঠিক নিষ্ক্রিয়তা নয়, ফুলমেসো আর সামনের টানে চলতে চাইছিলেন না। এই অনীহা তাঁকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে। অঘোষিত, এক মন্থর হনন তাঁকে তিল তিল করে শেষ করছিল আর ফুলমেসোর কাছে ওই মৃত্যু যেন এক দুর্লভ উপহার।

কিংবদন্তী

ফুলমেসোকে সাকুল্যে ২৩ বছর আমি দেখেছি, সম্পর্ক একটা ছিল কিন্তু তা প্রান্তিক হওয়ার দরুন জানি খুব কম, যতটুকু যা জানতাম সবই বাইরে-বাইরে, পাড়ার লোককে জানার মতো। আর ওই ২৩ বছর হল ফুলমেসোর জীবনের প্রৌঢ়ত্ব-বার্ধক্য পর্যায়, জীবনের এই পর্যায়ে থাকা মানুষজন সম্পর্কে যুবাদের উৎসাহ কম থাকে দেখেছি, আমার ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই বয়সে মানুষ যেন খুনের আসামী হয়ে পড়ে, সাধারণ, অসফল মানুষ। ফুলমেসোও বলতেন 'কী করে যে জীবনটা কাটালাম' যেন অতীত জীবন দৃশ্যের পর দৃশ্যে দেখছেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। মৃগাঙ্কদা এইরকম মুহূর্তে প্রশ্ন করতেন 'কীভাবে কাটাতে চেয়েছিলে?' বেখাপ্পা, রুক্ষ এই প্রশ্নের সামনে নয়নবাবু অর্থাৎ ফুলমেসো গুটিয়ে যেতেন, 'জানিনারে' একথাটাও বলতে পারতেন না। এষা বৌদি আমাকে বলেছিলেন 'বাবা ভয়ঙ্কর টেনশনে রয়েছেন' কিন্তু কখনও বলেননি কী সেই টেনশন, বা এষা বৌদি নিজেও জানতেন না। এখানে একটা কথা প্রকাশ থাকা দরকার, ফুলমেসোর টেনশন কিংবা তার উদ্ভট উদ্বেগকে কেউই বিশেষ পাত্তা দেয়নি। বরং চুটিয়ে সংসার করা, গেরস্থ স্কুল মাস্টারটি বড় বড় ব্যাপার নিয়ে প্রকৃতই চিন্তিত দেখে তার নিকট আত্মীয়রা বেশ ঘাবড়ে যায়। যার যা করার কথা নয় সে তাই করতে শুরু করলে সেটা এক তো বিশ্বাস করা কঠিন, অন্যদিকে তাকে ঘিরে একটা দুশ্চিন্তা দানা বাঁধবেই। ফুলমেসোর এক বাল্যবন্ধুই শুধু ভিন্ন সুরে কথা বলেছিল 'ভ্যাবল চিরকালই এরকম।' এখন 'এরকম' মানে কী? বাল্যবন্ধু সে কথা খোলসা করে বলেনি। অনেক খোঁচাখুচির পর জানায় 'মারাত্মক অতৃপ্ত ছিল।' এই তথ্যটুকু কোনও কাজে লাগেনি। তারা বলাবলি করেছে: 'হুঁ', 'অতৃপ্ত!', 'কার নেই?', 'অতৃপ্ত!!', 'যত্তোসব'। এর মধ্যে একটা কথা আছে, দু-একটি ক্ষেত্রে কিছু সম্ভাবনা অর্থাৎ সাফল্য অর্জন অসম্ভব ছিল না ফুলমেসোর পক্ষে। নিজের বিটকেল স্বভাবের জন্যই শেষপর্যন্ত সে সব হয়ে ওঠেনি। এ বিষয়েও দু-রকম মত চালু আছে, একদল বলে ছবি আঁকা এবং কাঠপুতুল বানানোয় ওর খুব দক্ষতা ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু লেগে-থাকতে পারত না। আর এটা একটা টেস্টেড ট্রুথ যে লেগে থাকতেই হবে। অন্য মতটি হল: আসলে ক্ষমতাই ছিল না, কিছুদূর এগোনোর পরই নিঃশেষিত হয়ে পড়ত। 'মৃন্ময়ীর অকাল মৃত্যু নয়নকে জগতসংসার সম্পর্কে নিস্পৃহ করে তোলে'— বাল্যবন্ধুর মত। মৃগাঙ্ক শৈশব স্মৃতি নিংড়ে এই মন্তব্যের কোনও সমর্থন খুঁজে পায়নি, সে বলেছে, 'না, বাবা আর মা ছিল দ্বীপের মতো', সুখী দাম্পত্য জীবন বলতে যা বোঝায় ফুলমেসোর তা ছিল না, মা'র মুখে শুনেছি 'টুনু ছিল খুব শৌখিন, বেড়াতে, গপ্পো করতে, হোটেলে খেতে ভালবাসত' মা কিন্তু ফুলমেসোর কোনও দোষের কথা বলেনি। তবে স্ফূর্তিবাজ ও একটু উড়ুক্কু

স্বভাবের টুনুর কথা বলতে গিয়ে ফুলমেসো সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত-ইসারা রেখে যেত। ফেলে যাওয়া সেই চিহ্ন ধরে এগিয়ে গেলে এরকম একটা ধারণা হতে পারে : নয়নবাবু যেন আধখানা জীবন পেয়েছিলেন। বা তার জীবন যেন শিলাখণ্ডের মতো, মৃত্যুর স্রোত ছুঁয়ে ছিল সেই পাথর!

অবিশ্বাস্য একটি ঘটনার, গল্পের উল্লেখ করব এখানে, যদিও সেই গল্পে আমার আস্থা নেই, গ্রামদেশে, অরণ্যচারী উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার কদর থাকতে পারে কিন্তু কলকাতায়… !!

ফুলমেসো রক্ত বমি করে মারা যায়, জানলার পাশে এক চিলতে খোলা জমিতে ছিটকে পড়েছিল ফুলমেসোর রক্ত সেখানে পরের দিনই একটি প্রাচীন গাছ দেখা যায়, পাড়ার লোকেরা বলেছে 'মা কালীর দিব্যি, এখানটা আগে ন্যাড়া ছিল।' কালীর দিব্যিকে তারা একটা অকাট্য প্রমাণ বলে চালাতে চাইছে, যেন যুক্তির বাপ এই দিব্যি। একটু জেরা করতে জানা গেল : যদি মিথ্যে বলে থাকি কালী আমার সর্বনাশ করবে। যুক্তিটুক্তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম আমিও, তারা সর্বনাশের ঝুঁকি নিচ্ছে এরপর আর কথা চলে না। কালী কোথায়, খড়্গ নিয়ে সে সত্যিই কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না ইত্যাদি জিজ্ঞেস করা অর্থহীন। বরং এই যে রূপকথা, তার বংশবৃদ্ধি, সেখানে নয়নবাবুর স্থান পেয়ে যাওয়া এইসবে মিথ্যার এক সৌন্দর্য রচিত হতে দেখি। রূপকথার সমান্তরাল যে ইতিহাস তা লেখাপড়া জানা লোকের সংস্কার, তারা বলেছিল।

ইতিহাস কিংবদন্তী দাহ করে চলেছে, এই দাহ অন্তহীন। এ দুয়ের মধ্যে কে যে প্রকৃতই অমর সেই মীমাংসায় পৌঁছতে হাজার বছর কেটে গেল, ইতিহাসের দেবদেবী কতবার কাদায় স্নান করল। কিংবদন্তী মরতে-মরতে বেঁচে উঠছে, সময়ের শিকল কাটতে গিয়ে তার অঙ্গচ্ছেদ ঘটছে, মেদমজ্জা হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ক্ষত শুকিয়ে যায়, নরম ত্বক এসে ঢেকে দেয় ক্ষতচিহ্ন। জলজ্যান্ত একটা মানুষ গাছ হয়ে গেল, পাতিপুকুরের লোকজন নিজেদের চোখে দেখেছে। মানুষের এই দৃষ্টি এক জটিল রসায়ন, সেখানে কী নেই! এই দৃষ্টির সামনে বাস্তব যেন খড়কুটো। সামান্য মানুষ ফুলমেসো এখন এক অমর সন্ত।

'আত্মহত্যা নয়', 'আবার ঠিক অতর্কিত মৃত্যুও নয়' ছেলে-বৌ বলাবলি করেছে। মৃত্যুকে রহস্যময় করে তোলার কোনও অভিপ্রায় তাদের ছিল না, বরং তারা উল্টোরকম ভেবে থাকে। ভিন্ন প্রসঙ্গে মৃগাঙ্কদা বলেওছে 'রহস্য মানুষকে টানে যেমন অন্ধকার,' এষা বৌদির সংযোজন 'আমরা ভয় পেতে ভালবাসি, একটা নেশার মতো।' ফুলমেসোর জীবনযাপন ছিল খুব সাদাসিধে, বাহুল্য পছন্দ করতেন না একেবারে, নিজের চারদিকে রহস্যের বলয় তৈরির চেষ্টা কখনও করেননি। একবার বলেছিলেন, 'আধখানা সত্যের জন্য লড়ছি আর ভাবছি মিথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছি।' এষা বৌদি এই উক্তির এরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিল :

'আরামের জন্যই হাত-পা ছুঁড়ে মরছি, ব্যক্তিগত আরাম, এর একটা গালভরা নামও দিয়েছি। এই ছিল বাবার মত। আমার কেমন শক্ত-শক্ত লাগত এসব কথা। বাবা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এই স্বাধীনতা— প্রগতি একটা মস্ত ধাপ্পা।'
বড় বড় বুলির এ হল একটা নমুনামাত্র। এইসব বুলি যে আরও বড় ধাপ্পা মৃগাঙ্কের তাতে কোনও সংশয় ছিল না। যখনই পৃথিবীর কোনও না কোনও প্রান্তে এ ধরনের বুলির কুশপুতুল দাহ করা হয়েছে আনন্দে টেবিল চাপড়েছে মৃগাঙ্ক। মানুষের এগিয়ে চলার বহির্মুখী রূপটিই সে চেনে, তার প্রতিই মৃগাঙ্কের যা কিছু আস্থা, বিশ্বাস। 'অন্ধ যাত্রা' ফুলমেসো বলতেন। এই ধরনের বায়বীয় কথাবার্তার কেন্দ্রে ছিল একটি জীর্ণ বাড়ি, ৩/৪ পুরুষের ভিটে। মৃগাঙ্ক-এষা বাড়িটিকে দেয়াল বলে মনে করত, তারা সন্তানের ভবিষ্যত, নীলের ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটাত। এই বাড়িটির দেয়াল নীলকে খাঁচার পাখি বানাবে, মৃত্যুদণ্ড দেবে, তারা ভাবত। আর ফুলমেসো বলতেন 'শুধু দেয়ালই দেখলি, দরজা দেখলি না।' এতে নবীন-প্রাচীন দ্বন্দ্বের একটা চিরকেলে বাসি গল্প দানা বাঁধতে চায়, ফুলমেসোর উদাসীনতা তার ঠাণ্ডা জীবনধারা ওই গল্পটিকে ধুয়ে দেয়, তাকে অস্পষ্ট করে তোলে।
ফুলমেসো একটি বাক্যও লিখে রেখে যাননি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী লেখকের মতো পাণ্ডুলিপিকে জীবন দান করতে আত্মহত্যা করেননি। এখন, তাঁর অন্তর্জীবন সম্পর্কে আত্মীয়বন্ধুরা নানাবিধ মন্তব্য করে, তাদের কণ্ঠস্বর ছুঁয়ে থাকে একপ্রকার বিপন্নতা 'সুইসাইড নোটের মতোও দু-লাইন লিখে যেতে পারতেন।' জীবনে গভীরভাবে আসক্ত, সংসারী লোকজন এক বৃদ্ধের অনীহাকেও সহ্য করতে পারছে না। এইটিই রয়েছে তাদের বিপন্নতার কেন্দ্রে। এবং ওই মানুষটি যেন শহিদনামার বিপরীতে ছিলেন, ২৮৩ পৃষ্ঠার বৃত্তান্তটিকে হাস্যকর করে তোলেন একটিও শব্দ না লিখে, তিনি একটি সম্ভাব্য গ্রন্থকেই শহিদ হওয়ার প্ররোচনা দেন। এবং এটি দৃষ্টান্ত হিসাবে গৃহীত হলে, প্রভাব বিস্তার করতে পারলে, সাদা পাতায় অক্ষর আঁকতে হাত কেঁপে উঠবে অনেকেরই।

কাহিনী

বেলগাছিয়ার কোনও একটি সেন বাড়িতে এই মুহূর্তে সব থেকে জরুরি হয়ে উঠেছে নোনাধরা ইঁট ও থামের বাহুল্য চিহ্নিত উত্তর কলকাতার একটি খাঁচা তথা বাসস্থান জলের দামে বেচে দেওয়া নিয়ে কড়াগণ্ডার হিসেব। দু-জন পুরুষ মুখ্য আলোচক, ছত্রিশের জনৈকা যুবতী মূক কিন্তু মনোযোগী শ্রোতা। আর এক কিশোর কথোপকথনের এই বৃত্তটি ছুঁয়ে থাকলেও সে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতো ঠিক এই সময়সীমায় নেই। তবে সম্পত্তি ও জীবনযাপন মেলানো-মেশানো যে কথাবার্তা চলেছে তাতে মাঝেমধ্যে ভবিষ্যতের দিন, সময় প্রসঙ্গে এই কিশোরের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। আলোচকরা

পিতাপুত্র কিন্তু আলোচনার ধরন বীমা কোম্পানির দালাল ও তার মক্কেলের মতো হওয়ায় সম্পর্কটা চাপা পড়ে গেছে। অতীতের জন্য বৃদ্ধের এক দুরারোগ্য ব্যাধি রয়েছে, এই ব্যাধিতে আক্রান্ত বলেই তিনি একপ্রকার স্থান দাসত্বে আর স্বাভাবিক নেই, সুস্থ নেই— এমনটা হলে গ্রামবাসীর ভিটের টানের সঙ্গে যেমন এর তুলনা চলত তেমনি পরিস্থিতিও কিছুটা সাদামাটা হতে পারত। বা, একালের চল্লিশের পুরুষ বুড়ো বাপকে আবর্জনা ভেবে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে অনির্দিষ্ট ভিড়ে, বিস্মৃতিতে— যদি এমন হতো তাহলেও বেশ একটা মূর্ত বাস্তব থাকত নির্দয়তার নখরাঘাত সমেত। এই কাহিনীতে বৃদ্ধের অর্থহীন গোয়ার্তুমি ছাড়া প্রথমটায় আর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ভবিষ্যত জীবনযাপন, বংশপালন ও সামনে যে সংকটকাল রয়েছে কী ভাবে সেই বিপন্ন সময়ে কিশোর নীল সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে, প্রতিযোগিতার প্রকৃত যোগ্য হয়ে সবলে বেঁচে থাকতে পারে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত হিসাবে, সে সবের বিশদ বিবরণ, জীবনের সেই ব্লুপ্রিন্ট এই বৃদ্ধকে বহুবার দেখিয়েছে মৃগাঙ্ক। এখন তার মনে হতেই পারে নয়নবাবু এদের কাউকে নিয়ে, তাঁর বংশধরদের নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন, উদ্বিগ্ন নন। মৃত্যুর বয়স হয়েছে তাঁর, আর সেটা টের পেয়ে তিনি এমন স্বার্থপর হয়ে উঠেছেন যে নয়নবাবুর মৃত্যুর পর কার কী হল, কার কী হবে তাতে তাঁর কিছুই যায় আসে না। বাকি দিনগুলো অতিপরিচিত দেয়াল, সিঁড়ি, কলতলা, রক, দোতলার লম্বাটে ঘরটির বিশাল জানলার ধার, গলি, ম্লান আলো আর ভেজা ভেজা গন্ধের অন্তহীন নিশ্চয়তার মধ্যে কাটিয়ে দিতে চান। বলেনও 'চাকচিক্যের মধ্যে কেমন একটা প্রতারণা আছে।' 'ঠকতে খুব ভয় পাও ?' মৃগাঙ্ক নয় হাসিহাসি মুখে এষা এই বাক্যটি টেনে টেনে বলেছিল। বৃদ্ধের এক মারণাস্ত্র আছে, বড় কম কথা বলেন, আর সেই শূন্যস্থান ভরে দেয় নিজের মনে অন্তহীন ভেবে চলা, মীমাংসার পর মীমাংসা খোঁজা। 'আমার বাবা একটি চিন্তাজীব' মৃগাঙ্ক আড়ালে নয়নবাবু সম্পর্কে এই মন্তব্যটি আকছার করে থাকে। চিন্তাজীবটি কিন্তু ক্বচিৎ নিজের কথা খুলে বলেন, হয়ত তিনি জানেন মৃগাঙ্ক-এষা সেসব কথার কদর বুঝবে না. বা তিনি যা-যা ভাবেন, যেভাবে ভাবেন এদের মন সে পথে চলেই না, সুতরাং অনর্থক বাক্যব্যয়ে বিড়ম্বনাই বেড়ে যাবে শুধু।

তুমি, আমি

'শুয়োরের আর্তনাদে উৎসব' শুরু হয়েছিল কবে। 'অগণন মানুষের শব শস্য' হয়ে আছে এইখানে, আমরা এই উৎসব, শুয়োর ও শবের স্তূপের কাছে আছি এবং এই স্থানটিকে কী নোংরাই না করলাম !

মাফ করো।

মাফ ! কীসের !

কত ভুল করলাম, অন্যায় করলাম···

আমি কে ? মাফ করার !

তুমি জন্ম । তুমিই তো সব ।

মানবজন্ম ! আমি ! ধ্যাত !

সাবানের ফেনায় ঢাকা তাঁর মুখটি আয়নায় এখন । সেই মুখটির বয়স যেন হাজার বছর । হাতে ধারালো রেজর, রেজর সমেত নয়নবাবুর হাতটি গলার কাছে এসে থেমে আছে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন । এইভাবে দেখার সময় কতক্ষণ, হতে পারে দু-দশ মিনিট, হতে পারে দু-দশ বছর, হতে পারে এইভাবে দেখতে-দেখতে নয়ন আর থাকবে না, আয়না তাঁকে মুছে ফেলবে । ধ্যান ভেঙেছিল সহসা, তবে কিছু চিহ্ন আগাম জানান ছিল : এবার দৃশ্যটি ভেঙে যাবে । নয়ন তোমাকে সকলের কাছে যেতে হবে, তারা সবাই তোমাকে দেখে থুঃ থুঃ করলে তবেই তোমার মুক্তি । এখানে মুক্তির কথা কোত্থেকে এল নয়ন জানেন না । তবে মুক্তির পিছুপিছু 'অভিশাপ' শব্দটিও এল এবং তিনি বুঝতে পারলেন পাষাণ অহল্যার রূপকথাটি তাঁকে তাড়া করছে ।

মৃগাঙ্ককে ডেকে বললেন : 'হ্যাঁরে, ব্যর্থ মানুষই চটপট সন্ত হতে চায়, তাই না ? (মৃগাঙ্ক চুপচাপ) হাদাগোবা হয়ে যাচ্ছি । কী সব··· গুচ্ছের বাজে কথা ভিড় করে আসে ।

বিড়বিড় করে চলেন : শৈশবের শিক্ষার কলুষ, বিদ্যার্জনের চেষ্টা আমার একমাত্র ক্রিয়াপদ । কে বা নেই সেখানে, বিজ্ঞান যুক্তিটুক্তি কত কী···

মাতৃতান্ত্রিক

মৃগাঙ্ক জন্মাবধি দেখে আসছে তাদের পরিবারের ধরন মাতৃতান্ত্রিক । আরও আশ্চর্যের ব্যাপার তার মায়ের নাম মৃন্ময়ী । রূপকথা মনে হয়— মা, মাতৃতান্ত্রিক, মৃন্ময়ী । পরিবারে হালকা টুকরো মেঘের মতো, অন্যমনস্কভাবে, থাকা আর না-থাকার অন্তর্বর্তী এক স্তর ছুঁয়ে বাবা থেকে গিয়েছিল । কেউ মনে করতেই পারত মানুষটা এ পরিবারে এক অতিথি মাত্র । বা এমন কেউ যে দীর্ঘদিন পরবাসে ছিল, এখন ফিরে এলেও ঠিক ধাতস্থ হতে পারেনি । 'একদিন ঘরদোরে আগুন লাগিয়ে একবস্ত্রে চলে যাব যেদিকে দুচোখ যায়' মৃন্ময়ীর এই অগ্নি উদ্গীরণ, এই বিকারের দিকে নির্বাক দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকাত নয়নবাবু যেন রাস্তাঘাটের কোনও নাটকীয় দৃশ্য দেখছে । বা মৃন্ময়ীর জীবনটা যে এইভাবে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সে জন্য এক গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছে নয়নবাবু । আবার মানুষটা সম্পূর্ণ অপদার্থ নয়, মৃন্ময়ীকে সে কিছু মারাত্মক অভাবে রাখেনি, তবু কী যেন নেই, কোথায় যেন অভাবের বিশাল গহ্বর, যখন-যখন মৃন্ময়ী তা

টের পেত, জমাট অন্ধকারের সেই গহ্বর স্পষ্ট হয়ে উঠত সাধারণ নারী মৃন্ময়ীর মাথার ঠিক থাকত না, দপ্ করে জ্বলে উঠত আগুন।

'উৎসাহী, আমুদে লোকের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হতো মৃন্ময়ী…' এই জাতীয় বাক্য মাঝেমধ্যে উন্মুক্ত রেখে মুহূর্তের মধ্যে ঢুকে পড়তেন সেই ভয়ংকর অসম্পৃক্ত একাবোকার খোল বা খোলসটির মধ্যে। নয়নবাবুর নির্বাক, নিশ্চেষ্ট থাকাটা আদতে কোনও স্বাতন্ত্র গড়ে তুলত না, এ ছিল জমাট কঠিন এক বোরডম। মৃন্ময়ী-মৃগাঙ্ক আক্রোশে ফুঁসে উঠত। মৃন্ময়ীর মৃত্যু হলেও রয়ে গেছে সেই আক্রোশ, অবিনশ্বর এক জ্বলন। মৃত্যুর সময় মৃন্ময়ীর মুখ বেঁকে গিয়েছিল, মৃগাঙ্ক তখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিচ্ছে, ফিজিক্স পরীক্ষা দিয়ে এসে মৃত মায়ের মুখ দেখে সে আঁতকে উঠেছিল। কী অপরিসীম ঘৃণা মৃন্ময়ীর চোখে! সেই ক্ষণ চিরন্তন, এক সর্বনাশা ভোজবাজি। মৃগাঙ্ক ঝুঁকে পড়েছিল অতি সরলীকৃত একটি মতের দিকে, নয়নবাবুর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ খাড়া করেছিল মনে মনে।

মৃগাঙ্কর হয়ত মনে নেই, তুতুন অর্থাৎ নীলের জন্মের পর মিতভাষী নয়নবাবু একদিন নিজে থেকে কথা শুরু করেছিলেন 'তাহলে বাবা হলে'— একথার কোনও জবাব অনাবশ্যক ছিল।

এই সম্পর্কটা, বাবা-ছেলে, কী মনে হয়, মানে সম্পর্কটার ধরন…

কী জানি।

তুমি অবশ্য নবীন পিতা।

বাবাকে, মাকে শুষে, নিংড়ে নিয়ে সন্তান বেড়ে ওঠে, একটি জীবন স্থিতি পায়, যতই সে সবল হতে থাকে বাপমা কি ততটাই দীর্ণজীর্ণ, মৃত্যুমুখি হয়ে পড়ে না? এবং এই মৃত্যুরোধে, অমোঘ ধ্বংস ব্যর্থ করতেই শিশুটির পরিচর্যায়, তার ভবিষ্যত দৃঢ় করতে, নিজেদের মুখে রক্ত তোলে না? এই জীবনমৃত্যুর, দিবসরাত্রির মধ্যে নিজেদের খুঁজতে যাওয়া, অন্বেষণ যেন আর নয়নবাবুর মনশ্চিত্রের কোথাও নেই। আর যারা বাপ-মা হয়নি? তাদেরও বাৎসল্য আছে, কিছু-না-কিছু একটা আঁকড়ে ধরবেই।

—জীর্ণ বাড়িটি কি নয়নবাবুর সেই অবলম্বন, তিনি কি এই বাড়িটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন?

মৌচাকের বেশি কিছু নয়, তিনি বলে থাকেন। অজন বনে এটি মৌচাকের নামান্তর। এই রকম গূঢ়, অবেদ্য কথা বলে থাকেন। বেশ একটি ন্যালাক্ষ্যাপাভাব থাকে এতে, নিজের চারপাশে গড়ে তোলা যায় একটি বলয়, মানুষটা তাতে স্পর্শসীমা এড়াতে পারে। চরিত্রচিত্রণ বেজায় সুবিধাজনক এক্ষেত্রে কিন্তু এই যে একটা টাইপ গড়ে ওঠে, আধুনিক মানুষের অভ্যাসে, বৃদ্ধের তাতেও প্রবল আপত্তি। 'ওটা মৃত্যুদণ্ড!' প্রায় আঁতকে ওঠেন, বেঁকে যায় ঠোঁটের মাংস, দাঁত দেখা যায় তখন। তিন জন পুরুষ ও একমাত্র নারীর এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রটির মধ্যে তথ্য ও ইতিহাসভোজী সময়ের অস্তিত্বে

তিন প্রজন্ম কাহিনীর যে সম্ভাবনা, তাকে নস্যাৎ করে দিতে এমনামন আচরণ নির্বাচন করেন যে নিমেষে সময় বিভ্রাট ঘটে যায়। যেন তারা সত্যিসত্যি কালস্রোতে ভেসে এসেছে, জীবনের সন্তানমাত্র, রিক্তে- সম্পর্ক কিছু নেই তাদের মধ্যে, শহুরে এক ন্যাড়া দ্বীপে বিভিন্ন বয়সের চারজন মানব-মানবী, বড় বেশি নাটুকেপনা, মৃগাঙ্কের মনে হয়। কিন্তু উপস্থাপনা উগ্র নয় বলে, চড়া রং না-রাখার কারণেও ঠিক তা বলা যাবে না। অস্ফুট, অস্পষ্ট এক দূরসঙ্গীতের মতো হওয়ায় সাতবাসি, ক্লিশে গোত্রের এইসব বাণী-মার্কা কথাও কেমন পাত্ত পেয়ে যায়। 'ইতিহাস ঘাঁটলে দেখব আমরা যাযাবর ছিলাম' নয়নবাবুর স্বগতোক্তি, এষা এই উক্তি, এই আঁচড়টির উপর আরও কিছু দাগ কাটে, বসিয়ে দেয় একটি মুণ্ড, হাত-পা এঁকে ফেলে : বন্য ছিলাম, মহাদেশ হেঁটে শেষ করেছি। তাই না বাবা? (নীরবতা) হাজার বছর। (নীরবতা)।

ব্যক্তিজীবন থেকে, পারিবারিক জীবন থেকে হঠাৎ হঠাৎ মানবজাতির একটি মোটা কম্বলের মধ্যে ঢুকে পড়া ও সেখান থেকে চাপা খসখসে গলায় সহজিয়া কথা বলাটা এষা-মৃগাঙ্কের পছন্দ নয়। সবুজপ্রেমী, পরমাণু অস্ত্র বিরোধী, প্রবল গতির বিরোধী, আধুনিক সমাজের বিরোধী একজন সুন্দরলাল, একজন বাবা আমতের সামনে যেন বসে আছে তারা। খবরের কাগজ ও টি' ভি-র খাদ্য হতে পারত এই মানুষটা যদি আরও সাহসী, আরও খোলামেলা হতো, আরও জীবন থাকত। সে কথা স্বতন্ত্র। বীরত্বগাথা। নয়নবাবু সেরকমটি হয়ে ওঠেননি, তার চলা-পথ কিছুটা অবিলক্ষ্যও বটে। সাধারণের সাধারণ তিনি। যে জন্য এটি ঘোড়াব্যাধি ছাড়া কিছু নয়। আবার এ কথাটাও তারা জানে বলে চেষ্টা করে কিছুটা সংযত থাকতে, আরও চেষ্টা করে বৃদ্ধকে একপ্রকার নিশ্চয়তা দিতে। যেন তিনি বোঝেন তাঁর ছেলে-বৌ বৃদ্ধের আজগুবি স্বাতন্ত্র্যটুকু (!) স্বীকার করে। বোঝে যে বৃদ্ধেরও একটা পয়েন্ট আছে।* প্রাকৃতিক জীবনকে আরামপ্রদ করে তোলার নিরন্তর চেষ্টা, অর্থহীন রক্তপাত, বীভৎস শব্দ ও গতির আধুনিক বর্বরতার দিকে পিঠ ফিরে দাঁড়ানোর মতো কঠিন কাজ মনে মনে বেছে নিয়েছেন বলে নয়নবাবুকে তারা সমীহ করে। যদিও তাদের অল্প বয়সের শতমুখ জীবনের শোষকবৃত্তির বিরুদ্ধে যেতে পারছে না। মৃগাঙ্ক, এষা। বয়স! বয়স! শুধুই কি বয়স? সময়শরীর!

চরিত্রটরিত্র কিছু নয়, সবই এক, বিকট মাংসপিণ্ডে এক ফোঁটা চেতনায় ধুকধুক। সবুজপ্রেমী কে নয়? কে চায় যুদ্ধ? হিংসা? মরণগতিরও কট্টর সমালোচক তারা। যতদিন না স্বপ্নের ঢেউ ধুয়ে দিচ্ছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্থূল, কদর্য বাস্তব, তত দিন? মানুষ তো বাঁচবে স্বপ্নযুগের আগেও, উত্তরণের আগে? আর সেই বাঁচাকে

---

* সারাটা জীবন চুটিয়ে চাকরি করে বুড়ো বয়সে মহৎ কিছু করার জন্য অস্থির হয়ে ওঠা অনেক হাস্যকর চরিত্র তারা দেখেছে। বৃদ্ধশহিদ! ফুঃ!

পাকাপোক্ত করতেই এখনকার হিংসা তরঙ্গ, মাংস খুবলে নেওয়া, পরস্পরের। বৃদ্ধের সুবিধা অনেক। সমাগত মৃত্যুই তাঁর শৃংখলমোচনে তৎপর হয়েছে, নয়নবাবুকে কিছুই করতে হচ্ছে না, যেন এক খোলা মাঠে, ধু-ধু প্রান্তরে পড়ে আছেন। ভূমিক্ষয়ের মতো একদিন অবলুপ্ত হবেন বলে। এইরকম অশক্ত জীবন, ভঙ্গুর হাড়, দুর্বল প্রাণেরই থাকে সেই শক্তি, মরতে-মরতে বেঁচে আছে যারা, জীবনের প্রান্তটুকু ছুঁয়ে, তাদের পক্ষে গতি রুদ্ধ করা, প্রসারমান হাতটি টেনে নেওয়া, প্রায় নেই হয়ে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। মৃগাঙ্ক এইরকম ভেবে থাকে, এষার বিবেচনায় এর মধ্যে অবিচার আছে, নেহাতই যান্ত্রিক এই চিন্তা। সাধারণের জন্য মৃগাঙ্ক ছিটেফোঁটা জমি ছাড়তেও রাজি নয় বলেই তার দৃষ্টি ঘোলাটে হয়েছে। শিকারীবাজের দৃষ্টি পেয়েছে মৃগাঙ্ক। সে রয়েছে শূন্যে, আকাশ মিনার থেকে দেখছে, ওই দৃষ্টি নয়নবাবুকে গেঁথে নিচ্ছে, পিঁপড়ের মতো তখন নয়নবাবু। আকাশ মিনার তাকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর করে।

লিটিল ম্যান।

দ্য গ্রেট লিটিল ম্যান।

ছেলে বাপকে খুন করবেই যেন। বাপ একটি মহাভুল, পুত্রের সংশোধনের জেদের মুখে খড়কুটো, তার মূল্যায়ন প্রবৃত্তির কাছে অসহায়, শুকনো তথ্য মাত্র।* পাছে মুখ ফস্‌কে অবাঞ্ছিত শব্দ বেরিয়ে আসে, এই টেনশন রয়ে গেছে। পারতপক্ষে সে বৃদ্ধের সঙ্গে তর্কে, আলোচনায় যেতে চায় না। 'শরীর কেমন', 'ঘুম হয়েছে', 'ন-পিসির ওখানে গিয়েছিলে', 'মর্নিংওয়াক ভাল তবে বাগবাজার ঘাট অবধি কেন'··· নয়নবাবু যখন এ-জাতীয় প্রতিটি কথার জবাব দিচ্ছেন, তখন তিনিও জানেন এসব কোনও কথা নয়, কথা বলার এক দায় মাত্র। মৃগাঙ্কের অসুবিধা হচ্ছে, তার বোর লাগছে এই এক গতের কথা আউড়ে যেতে, ভাবছে কখন এই বিচ্ছিরি অস্বস্তি থেকে, ধেড়ে ছেলের রোল প্লে থেকে মুক্তি পাবে। বেঁচেবর্তে থাকার দরকারি কিছু তথ্যের আদানপ্রদান, দু-চারটে সামাজিক কথা, খবরের কাগজে গণশবের ভিতর থেকে টেনে আনা একটা দুটো লাশ, ভয়ংকর চোখা কিছু উক্তি এইসবেই কি মৃগাঙ্ক-এষার জগত পরিপূর্ণ ? আর কি কিছুই নেই !! মানুষ যাকে গভীর সত্যটত্য বলে থাকে সেসব কি বুজরুকি ?

নয়নবাবু দেখলেন মৃগাঙ্ক ঘাড় নিচু করে কোলাপসিবল গেটটা টেনে ঢুকল, সবুজ পাল্লা ঠেলে দিল, সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে উঠে আসছে সে, ভাড়াটেদের নেড়িকুত্তা তার জুতো শুঁকে গেল, মৃগাঙ্কের ঠোঁট থেকে অব্যক্ত কথারা ঝরে পড়ছে, তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, হৃৎপিণ্ডের মতো স্পন্দিত হচ্ছে, যেন বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছে সে, এখন কোণের ঘরে বিশাল আয়নার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আয়নার মৃগাঙ্কের হাতে পিস্তল···

---

* 'নকশালরা বিদ্যেসাগরকে অব্দি ছাড়েনি, ভাবা যায় দাদা !'

বহুদূর, বহুদূরের ও দূর থেকে প্রায় শব্দহীন অতি অস্পষ্ট শিস ধ্বনির মতো কী একটা শব্দ ভেসে এল তা সংগীত নয়, গোঙানিও নয় কিন্তু সেইরকমই, যেন সংগীত আর গোঙানি ছুঁয়ে দিয়েছে পরস্পরকে। এই অস্পষ্ট সুরে নয়নবাবুর দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য ঝাপসা হয়ে থাকবে, মুহূর্তের জন্য তিনি খুন হলেন, মুছে গেলেন (…হি ডাইজ আপন হিজ মোশন ; সাইলেন্স দ্যাট ড্রেডফুল বেল,…)। এরকম কি কখনও ঘটেছিল ? ঘটবে ? আবার যা তিনি স্পষ্ট, একেবারে জলজ্যান্ত দেখলেন সেটি ভুলেরই এক অপারমহিমা, মিথ্যার প্রতিভা বলে জানেন। গ্রন্থিচ্যুত সময়ে চলে গিয়েছিলেন, মুহূর্তের জন্য হয়ে উঠেছিলেন সময়হীন। এই আজগুবি, উদ্ভট নাটক সমস্ত নির্দিষ্টতা, সমস্ত বিশেষের উপর মোটা তুলির রঙ টেনে দিয়েছিল, সমস্তই ন্যাড়া মাঠ, ধু ধু প্রান্তর তখন আর ওই সংগীতরেশ বা পিস্তলের শিস—

'দ্যাখ তোকে সত্যি বলি, অনেকদিন চেপে রেখেছি, মরার আগে বলেই ফেলি, কী চাই, কীভাবে বাঁচতে ভাল লাগে, মনে হয় হ্যাঁ কিছু একটা করছি— সেসব ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই বিয়ে থা করে সংসারচাকরি নিয়ে এমন ফেঁসে গেলাম, (সেই যে একটা কথা আছে না, অমুক মশাই ছিলেন খাসা, বে-থা করেই গেলেন গেঁজে।) অর্থহীন একটা স্তূপের নীচে চাপা পড়ে গেলাম। অ্যাতো ভয় কীসের বল দেখি, এখন তো হাল্কা হতে পারি, মুক্ত হতে পারি কিন্তু কোথায় ! যা প্রাণ চায় করব ভাবি আর ঠিক তখনই কারা যেন, কী যেন হাঁ-করে গিলতে আসে। মানুষের জীবনে ফালতুর, ছাতানাতার যে কী অপরিসীম ভূমিকা ! যাচ্ছেতাই ! যাচ্ছেতাই ! পোষা কুকুরের মতো। হাজার লাথিঝাঁটা হজম করবে শুধু মাঝেমধ্যে একটু লাই পেলে (লোকটা হড়হড় করে বমি করছে)।

গুলির শব্দ কী করে সংগীত হয়ে ওঠে, নিহত মানুষই বা বেঁচে থাকে কী ভাবে ? এখানে, এই বাড়িতে নয়নবাবু একা, তিনি তীব্রভাবে টের পান আর কেউ নেই। যখনই ওরা চলে যাবে ঠিক করেছে বস্তুত সেইদিন, সেই মুহূর্তেই গিয়েছে চলে। 'কথার ডিম ফুটেই ঘটনারা জন্মায়' নয়নবাবুর ভাবনা 'কথাই আদি'।

সংস্কার আর দেশাচারের সাইলেন্সার বসানো আছে মৃগাঙ্কের মুখে, নয়নবাবু জানেন, নাহলে মৃগাঙ্ক মুখের উপর বলে দিত, 'তোমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না আমি যৌন সম্পর্কের কথাও বলছি, যেখানেই হাত বাড়িয়েছ কিছুই পাওনি, এই ব্যর্থতা থেকেই যত সব জোলো কথা বলছ। আসলে তুমি একটি কাঙাল।'*

বাংলা ভাষার অন্তিম শব্দ যেন, এই পর্যন্ত ভাষার বিস্তার, এরপর আর কিছু নেই, নয়নবাবু বিড়বিড় করতে থাকেন, 'কাঙাল, কাঙাল।' সত্যিসত্যি মৃগাঙ্কের সঙ্গে কথা বলেছিল কিনা স্মরণ নেই, তবে এইসব সত্যিমিথ্যে মামুলি, সংলাপধর্মী চিন্তা ভাবা থাক,

---

* ঠিক এই বাক্যটি মৃগাঙ্ককে বলতে শুনেছেন নয়নবাবু, এক ডিভোর্সি বন্ধুকেই বলেছিল সম্ভবত, আলটপকা সেই কথাটিই মনে পড়ে গেল এখন।

চরিত্ররা আছে সংলাপের খাতিরে।
কাঙাল কে নয় মৃগাঙ্ক !
যার শক্তি আছে, যোগ্যতা আছে।
হ্যাঁ, তাই।
সভ্যতা ! সেখানেও এই এক নিয়ম ?
এটা থাকবেই।
তাই আমাদের ভাড়াটেরা মরবে ? ওদের হাবাগোবা ছেলেটা রাস্তায় পড়ে থাকবে।
পপুলেশন এক্সপ্লোশনে এমনটিই হয়, অনেকগুলো জাত হয়ে যায় আর একেবারে তলায় যারা থাকবে তারা মরবেই, তুমি মাথা কুটেও কিছু করতে পারবে না।
ওদের তাহলে শান্তিতে মরতে দেওয়া উচিত। কার্যকারণ অন্তত তাই বলে…
শহরে মতামতের যে আবহাওয়া রয়েছে মৃগাঙ্ক কী করে তার বাইরে থাকে। জন্ম এই দেশে এখন বিষ, একথা সে বলে না। কিন্তু তাকে মনে করিয়ে দিলে মৃগাঙ্ক বলবে, 'তোমাকে সত্যি কথা বলি আগে সচেতন হলে আমি নিঃসন্তান থাকতাম, কলকাতায় এখন এরকম দম্পতির সংখ্যা একেবারে নগণ্য নয়, এরা আগেই ঠিক করে রেখেছে,— ভুলেও বাচ্চা নয়।' অশিক্ষিত, যৌনোন্মাদ নারীপুরুষের কৃতকর্ম রাস্তায়, ডাস্টবিনে সাদা ন্যাকড়ার পুঁটলির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছেন নয়নবাবু। সস্তার নাটক-নভেল লেখা হয়েছে ওই পুঁটলিকে সম্বল করে। পরিত্যক্ত সেই শিশুদের কেউ-কেউ বেঁচেও গিয়েছে (অন্য কেউ তাদের উপহার ভেবেছিল বলে)। ব্যক্তি বিশেষের সন্তান নয় তারা, জীবন-প্রবাহের এক নির্দয় উপমা। সেই সব রক্তফলের দিকে অন্ধকার পথে ছুটে যাচ্ছে ছুরি, কাঁচি, সুঁচ, তুলো, ডেটলজলে স্নান সেরে নিচ্ছে ছুরি কাঁচি, ডেটলে তুলো ভিজছে। 'ভুলেও নয়, ভুলেও বাচ্চা নয়'— এরকম ভুল তাহলে এখনও হতে পারে, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়নি। পৃথিবীর চামড়ায় জন্ম চিহ্নের মতো একটি জড়ুল থেকে গেছে। হয়ত একদিন সেও আর থাকবে না, রাক্ষুসে পরিবর্তন গিলে খাবে তার কালচে মাংস, বড় বড় লোম ও চামড়ার গোটগুলি।
জন্ম শেষ হবে সেইদিন।

মহাত্মার ছদ্মবেশে এক বাচাল

ইংরেজি এল অক্ষরের ছাঁদে নিচের তলায় যে ৬-৭টি ঘর, ২টি বাথরুম, শ্যাওলার কার্পেটটি রয়েছে সেখানে ৩০-৪০ বছর ধরে টানা বসবাস করছে গুটিকয় পরিবার, এখানেই তাদের কেউ না কেউ জন্মেছে, মরেছে। সমস্ত পরিবর্তন উজিয়ে, দুর্ভিক্ষ-দাঙ্গা আর্থিক সংকটের উল্কি এঁকে নিয়ে বেঁচে আছে তারা। একতলা আর দোতলার মধ্যে দুস্তর ফারাক, ভাষা, খাদ্যাভাস, আচরণবিধি সমস্তই এতখানি আলাদা যেন তারা

বিশাল পৃথিবীর দুই প্রান্তে লেপ্টে থাকা দুটি পৃথক জনগোষ্ঠী, রয়েছেও যেন সভ্যতার দুটি ভিন্ন স্তরে, তাদের মধ্যে হাজার বছরের ব্যবধান।
'টাইম-স্পেস ডিফারেন্স বলা যেতে পারে' মৃগাঙ্ক যেন এক বিত্তবান ট্যুরিস্ট; নিস্পৃহ, নিরপেক্ষ, এক পর্যবেক্ষক। বাঁচার অধিকার যে অর্জন করতে হয় রক্তবমি করে, মানুষের মাথাটিকে হিসেবের নির্ভুল যন্ত্রে পরিণত করে, এই কথা সে এখন চীৎকার করে বলছে। ঘোষণা করছে। ফ্যাসফেসে গলায় তীব্র ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। আর প্রতিটি শব্দকে বিশ্বাস করছে এক গোঁড়া ধার্মিকের মতো।
শব্দ ও ধ্বনির সঙ্গে মানবদেহের কী এক সূক্ষ্ম জৈব সম্পর্ক রয়ে গেছে। খসখসে মেঝেয় কাগজ ঘষটালে একপ্রকার শব্দ হয়, নয়নবাবু সেই শব্দ সহ্য করতে পারেন না; অস্থির-অস্থির লাগে। মনে হয় এই শব্দে তিনি ফেটে যাবেন। আবার ভাড়াটেদের ওঠাবসা, নড়াচড়া, বাঁচা-বৃত্তান্তের শব্দ তরঙ্গে বড় নিরাপদ লাগে। জীবনের এই বলয়ে নিজেকে সুরক্ষিত বোধ করেন। মৃগাঙ্ক চেতনার কথা বলে, বড় বেশি সচেতন সে, আর নয়নবাবু যেন নিদ্রা, স্রোতে ভাসা শুধু, জলজীব, যেমনটি ছিলেন গর্ভে। এও এক কল্পনামাত্র। কোথায় গর্ভ আর কোথায়ই বা তিনি। তবু সবাইকে শুনিয়ে তিনি একথা বলবেনই : অলৌকিক, অবিশ্বাস্য ব্যাপার, শ্যামাসঙ্গীতে যেমন 'আমি মা তোর সঙ্গে যাব' কতবার এই ইচ্ছে দমন করলাম, খুন করলাম, কোনটা যে মুক্তি! মা'র পেটে ফিরে যাওয়া নাকি গ্রামশহর তোলপাড় করে বাঁচা, তারপর নেতিয়ে ঘাড় কাত করে মরে পড়ে থাকা?
এইটি পাতি লেকচার ভাবা সম্ভব ছিল যদি না নয়নবাবুর মুখচোখের দিকে কেউ তাকাত, নয়ন তখন ঘোরে আছেন, ভর হয়েছে তাঁর! মৃগাঙ্ক আর এষা দেখেছে শান্ত মানুষটা কী গভীরভাবে নাড়া খেয়েছে। তারা অভিভূত হয়ে পড়ে, যদিও শক্ত কাঠকাঠ হয়ে থাকে, না, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, তারা একে হিস্টেরিয়া বলে জেনে ফেলেছে, বাস্তব এখানে খড়কুটো। নয়নবাবুর যন্ত্রণা সত্যি, তার কণ্ঠস্বর সত্যি, তার উৎকণ্ঠা ও ব্যর্থতা সত্যি, নিজের প্রতি ঘৃণা ও এইসব সত্য ঘটনায় নয়নবাবুর ওই আকুতি সন্দেহ-সীমা পেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে। আর তখনই ভেবে ফেলা হয়, এই পরিবেশে এভাবে কথা বলা এক উদ্ভট কাণ্ড, বেমানান, যেন দেড়-দুশো বছর একসঙ্গে কথা বলে উঠছে। এক বহু হয়েছে, সহস্র স্বর আলোড়িত করছে বাতাস। এটা কী করে হয়! আর এই 'প্রলাপ' থেকেই পাগলামির কথাটা মনে এসেছিল মৃগাঙ্কের। 'পাগল হলে বাবা!' গাঢ় স্বরে উচ্চারণ করেছে মৃগাঙ্ক, নয়নবাবু মৃগাঙ্কের মুখের উপর নিজের দৃষ্টির বিস্তার ঘটতে দিয়েছিলেন। তার সেই দৃষ্টি যেন গভীর সংবেদনশীল হাত, মৃগাঙ্কের মুখে-চোখে যার নরম স্পর্শ, তালুর উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে 'কী যে বলিস!' পাগল কে এইটি সনাক্ত করা নয়নবাবুর উদ্দেশ্য নয়, তিনি যেন ভাবতেই পারছেন না কথাটা, 'এটা কোনও প্রশ্ন হল!!' জগতে সবাই ক্ষ্যাপা গোছের এক জলোদর্শন (হাড়-হাভাতে এই দেশে কেন যে এত কবি! এত দার্শনিক!) পাছে টেনে আনেন সেইজন্য মৃগাঙ্ক মরিয়া

হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, 'আলবাৎ, যা-তা বললেই হল।' নয়নবাবু কথা থামিয়ে দিলেন, স্তব্ধ হলেন, সেই দিনটি ওই স্তব্ধতায় ভেসে গেল। বলবার মতো ঘটনা আর ঘটেনি। স্তব্ধতার ঠোঁট নড়েনি একবারের জন্য। বিপুল এক জৈব জীবনের কোথায় যে ঠোঁট, তারা তা খুঁজেও পায়নি।

গারদখানার সঙ্গে একতলার ঘরগুলির তুলনা করাটা মোটেই বেখাপ্পা কিছু নয়। আব্রু আর আলোর মধ্যে আপোস করে ওঠাটা সম্ভব হয়নি। লখনউর এক রাজমিস্ত্রি কলকাতায় বনেদি বাড়িগুলির নকল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল, নয়নবাবুর বাবা তাকে খুব উৎসাহ দেন কিন্তু অঢেল টাকা না থাকায় শেষপর্যন্ত পরিকল্পনায় অনেক কাটছাঁট করতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় একতলার ঘরগুলির ভিতরের দেয়াল থেকে অন্ধকার মূর্তিমান হয়।

জন্ম নষ্ট হবে জেনেও যারা বেঁচে আছে এইরকম আঁধারজীবী খোপে, যারা খবরের কাগজ না দুধ কোনটা বন্ধ করবে সাশ্রয়ের জন্য এই নিয়ে সারা মাস তর্ক করে, পুনঃপ্রবাহের মধ্যে পৃথিবীর পাতালে এমনই তলিয়ে থাকে তারা, যেন কেউ কোনওদিন তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না। কলকাতার পুরনো বাড়ির দেয়াল, কোণ ও কপাটের ফাঁক থেকে অন্ধকার উড়ে আসে এই নষ্ট জীবন রক্ষা করতে।

দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ভাড়াটেরা মৃগাঙ্কের অগ্রগতি রোধ করছে, অগ্রগতির প্রতিবন্ধক এইসব সামান্য মানুষ। জীবনে বড় হওয়ার, দৃষ্টান্ত স্থাপনের, সাফল্যের, জয়ের স্বপ্ন নেই তাদের চোখে। বেঁচে থাকাটুকুই তাদের একমাত্র সম্বল। এই পতিত জমিতে পা ছড়িয়ে কেমন থেবড়ে বসে আছে পল্টু, মেঝে থেকে মুড়ি খুঁটে নিচ্ছে। একদানা মুড়ি তুলে সেই মুড়িটি ঠেলেঠুলে মুখের ভিতর চালান দিতে দশ-পনেরো মিনিট লেগে যায় তার, পিঁপড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দিচ্ছে পা, পল্টু পা টেনে নিতে পারছে না টিপে মেরে ফেলতে পারছে না ডেয়ো পিঁপড়ে। পল্টু 'আ-আ' করছে তো করছেই, দুপুর সেই স্বর, 'আ-আ আ— আ আ আ…'

দুপুর এক জবলন্ত শূন্যতা, মৃগাঙ্ক আর এষা চলে ঘড়ির কাঁটার খোঁচায়, নীলও, বাড়িটিতে দুপুর খা খা করে, দুপুরের দুর্দান্ত আলো কোণা-খুপচি আর আসবাবপত্রকে জীবনদান করে, এই স্তূপের মধ্যে, দাহ্য পদার্থের মধ্যে থেকে যান নয়নবাবু। তিনি নাকি বেশ কয়েকবার ভেবেছেন, দিব্য দেখেছেন, আসবাবপত্র কীভাবে গড়ে ওঠে মানুষের জীবন শুষে। একে পুঞ্জীভূত সময় বলে ভাবা সম্ভব ছিল।

নীল আর পল্টু সমবয়সী কিন্তু সময় দুজনের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত হয়নি, তাদের শক্তি ও সঞ্চয় সমান নয়। নরম একতাল মাংসের মধ্যে একরত্তি জীবন নিয়ে দুজনই জন্মেছিল, সেই অপরিণত জীবন পল্টুর ক্ষেত্রে আর শক্তপোক্ত হল না, সে এখনও মুড়ি খুঁটে খায়, ডেয়ো পিঁপড়ে তার পা ফুলিয়ে দেয় আর ছেলেটা 'আ-আ' করতে থাকে।

নীল! নীল!

নিঃশব্দে এই ডাক উঠে আসছে বুকের ভেতর থেকে, ন্যাড়া মাঠ, হাড়ের স্তূপ, কাদার মতো নরম মাংসপিণ্ডের ভিতর থেকে। এখনকার নীল নয়, ভবিষ্যতের নীলকে ডাকছেন নয়নবাবু। আর ডাকতে-ডাকতে রূপকথার সেই দৈত্যের স্মৃতি জেগে উঠল এমনভাবে যেন তা সত্যিই স্মৃতি, রূপকথা নয়। বাস্তবেই এক দৈত্য ছিল, সে অতীত মানুষ, দৈত্য হয়েছিল, যেন বর্তমান-ভবিষ্যতেও আছে সেই এক দৈত্য মানুষ। কাজ পিপাসায় যার গলা শুকিয়ে কাঠ, ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কাজের হুকুম মুহূর্তে তামিল করে আরও আরও কাজ চায় সে, এই ক্রীতদাস কর্মী কাজ না পেলে খুন করবে, সৃষ্টি ধ্বংস করবে।*

ফুলমেসোর ধারণা হয়েছিল জীবনে তিনি নিজেও কিছু কম পাপ করেননি। কাজ এবং পাপের একটি সহজ সমীকরণে বিশ্বাস করতে শুরু করেন বলেই এরকম ভেবেছিলেন। একতাল নরম মাংসের পূর্ণবয়স্ক মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে তিনি কোনও পূর্ণতা দেখেননি। সময় ফল ভাবতেন, যা পোকায় কেটে দেবে, পচে-গলে যাবে শেষপর্যন্ত। এবং তিনি যেন এই শেষটুকু দেখে ফেলেছেন, এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েও বেঁচে আছেন। এখন ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন শেষের পর কী আছে।

তাঁর গলার স্বর ফেঁসে গিয়ে কেমন ভৌতিক হয়ে উঠেছিল, এমন এক প্রান্ত থেকে শব্দরা উঠে আসত, বা সেইসব শব্দে ফুলমেসো যে ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাইতেন এষা, মৃগাঙ্করা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত, ফলে তাঁর সমস্ত কথাই হয়ে উঠতে থাকে স্বগতোক্তি।

সময় তো থাকবে না গো মা,
কেবল কথা রবে।
কথা রবে, কথা রবে
মা গো জগতে কলঙ্ক রবে।

উনুনের ধোঁয়াও অস্পষ্ট কোলাহলের মধ্যেও পাতিপুকুরে এক শান্ত সকাল উড়ে এল, 'কথা রবে, কথা রবে মা' এই গীতটির সুরের দানা উড়ছিল। দূরে জং ধরা লোহা ও পরিত্যক্ত, অকেজো যন্ত্রপাতির স্তূপের উপর বসে ফেলু নামের ছেলেটা বুদবুদ ভাসিয়ে দিচ্ছে, সাত বাড়ি ঠিকে কাজ করা তার মা 'ফেলু ! ফেলু !' বলে চীৎকার করছে। বুদবুদের খেলায় ফেলু এমন ডুবে আছে, মরে আছে যে তার পক্ষে সাড়া দেওয়া সম্ভব নয়। যেন সাবান জলের প্রতিটি বুদবুদ ফুঁ দিয়ে ফোলানোর সঙ্গে-সঙ্গে ফেলুও সেই বুদবুদে ঢুকে পড়েছে, উড়ছে তারই প্রাণ, আর জলজ্যান্ত শিশুটি মাটির পুতুল হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

* মৃগাঙ্কদা বলেছিল 'কর্ম ভীতি ! একটা মানসিক ব্যাধিতে বাবা ভুগছিলেন।' এষা বৌদি এই ভীতির মধ্যে জ্ঞানাঙ্কুর দেখেছিলেন, 'ধ্বংসের কথাটা ভাবুন'। মানুষের শিয়রের বালিশ এখন মারণাস্ত্র, এষা বৌদি পারমাণবিক ধ্বংসের কথা বোঝাতে চাইছিলেন যা আদতে এক বীভৎস কর্মময়তা।

ফেলুকে বুদবুদ ওড়াতে কে না দেখেছে ! ফুলমেসোর দৃষ্টি তাদের সকলের থেকে আলাদা। মামুলি শিশুসুলভ ঘটনাকে নাটকীয় করে তুলছে সেই দৃষ্টি। এবং খেতে বসে এই পর্যবেক্ষণের কথা তিনি বলবেনই। মৃগাঙ্ক, এষা এইরকম সব উদ্ভট কাণ্ডে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার এখন চেষ্টা করে অগ্রাহ্য করতে। যেমন একবার ফুলমেসো বলেছিলেন, 'গড়ের মাঠের কামানের নলের মধ্যে নেংটি ইঁদুর বাসা বানিয়েছে দেখলাম।' নেংটি ইঁদুরের শোভাযাত্রার বর্ণনা দিতে থাকেন। বর্ণনার ঝোঁকে তাল হারিয়ে ফেলেন, যা দেখতে পারতেন সেসবও বলে চলেন। গুদোমে, সরকারি অফিসে, সিঙ্গাপুর এয়ার-লাইন্সের হোর্ডিঙের মাথাতেও নাকি নেংটি ইঁদুর দেখেছেন। তারা কেটে ফেলেছে ধাতু, পলিথিন ও ফাইবার।

এ এক মারাত্মক অত্যাচার, এক নির্দয় পীড়ন। বিশেষ করে তাদের কাছে যারা বেঁচে আছে মৃত্যু ভুলে, যারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করে, সন্তানকে ঘিরে স্বপ্ন দেখে। জানে একদিন মরবে কিন্তু তার আগে স্নেহ-মায়া-যত্নে কিছু কাজ সেরে ফেলতে চায়, নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চায়। সেই তাদের মধ্যে ফুলমেসো এক জাগ্রত মৃত্যুর মতো, চূড়ান্ত এক অবাস্তব। মৃগাঙ্ক-এষা কী করে সহ্য করে তাঁকে ! তাই শেষ পর্যন্ত তারা চলে গিয়েছিল নিজেদের পরিকল্পিত পথে। সামান্য চাকুরিজীবী মৃগাঙ্ক চেয়েছিল বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে ফ্ল্যাট কিনবে, বৃদ্ধ রাজি হয়নি। জীর্ণ বাড়িটি সারানো যেত, প্রমোটাররা এগিয়ে এসেছিল, ফুলমেসো তাতেও রাজি নন, 'ভাড়াটেরা যাবে কোথায় ?'

তুমি কি ত্রাতা ?

না, তবে খুনিও নই।

তিক্ততা বেড়েই চলেছে, এর মধ্যে নীলের সঙ্গে ফুলমেসোর গল্প, দাদু-নাতির জমাটি আড্ডা চলাকালীন একদিন এষা নীলকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে নয়নবাবুর সঙ্গে নীলেরই ভবিষ্যত নিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে। সে ভেবেছিল, যদি নীলের কথা ভেবে বৃদ্ধ একটু নরম হন। নীল সফল হবে, জীবনে উন্নতি করবে একথা ভেবে হয়ত নয়নবাবু রাজি হয়ে যাবেন এ পাড়া ছেড়ে আরও ভদ্র এলাকায় চলে যেতে, বাড়িটা না হয় কম দামেই ভাড়াটে সমেত বেচে দেওয়া যাবে।

এষার কথা শুনে কিছুক্ষণ ঠায় তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এ ভুল করো না।'

ভুল !

হ্যাঁ।

কীসের ভুল ?

দ্যাখো উন্নতি মানে তো বাড়ি-গাড়ি, বিদেশযাত্রা, ব্যাভিচার আর মদ্যপান।

মৃগাঙ্ক যা বুঝেছিল

এষার মুখে এই ঘটনা শুনে রাতে ঘুমোতে পারেনি মৃগাঙ্ক, এক প্যাকেট সিগারেট শেষ করেছে।

এখানে উল্লেখ করা দরকার এষার বিবরণ ভাষার দরুন একটু-আধটু বদলে গিয়েছিল, আবার সে মা বলে, নয়নবাবুর কথায় খুব আঘাত পেয়েছিল সেই দুঃখ ও অভিমান বিবরণটিতে ঢুকে পড়ে। ফলে যা ঘটেছিল হুবহু সেই বিবরণ এষার কথায় ছিল না। এষার কথা এরকমভাবে ভেঙে ভেঙে যায় :

বাবা বলেছে নীল মাতাল হবে
বলেছে লম্পট হবে
ফূর্তি করবে
তেরো বছরের নীল

বাবা যে ১২।১৩ বছরের এক কিশোর সম্পর্কে, তার ভবিষ্যত সম্পর্কে এ কথা বলেনি, এষা তা বুঝতে পারছে না। মৃগাঙ্ক এষার ভুল ভেঙে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করে শেষতক হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিল 'সব কিছু এমন পার্সোনাল করে ফেল…'। সাফল্য, উন্নতি সমান সমান এইসব, বাবা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন। বাবা যদি বলতেন, সাফল্য আর উন্নতি মানে হল ক্ষমতা, তাহলেও তো এষা বুঝতে পারত না। তবু ভাল বাবা লাম্পট্য ও মদ্যপান বলে ছেড়ে দিয়েছে। এষা চাকরি করা মহিলা, তার তো বুঝতে পারার কথা, অফিসে বস গোছের লোকও আছে, তবু সে গ্রাম্য মা থেকে গেল। সেই এক আদি বাঙালি মধ্যবিত্ত মা, ছেলের বিলেতযাত্রার স্বপ্ন দেখছে যে প্রায় দুশো বছর যাবৎ। মৃগাঙ্কও সংসার জীবনের এই লক্ষ্য, এই ধ্রুব সত্য সম্পর্কে কিছু কম সন্দিহান নয়। তার যেটা আশ্চর্য লাগছে নৈতিকতা নিয়ে বাবাকে খুব একটা পীড়িত হতে দেখেনি কখনও তাহলে 'ব্যাভিচার' কথাটা এল কেন? এ কি বুড়োমি, স্রেফ বুড়ো হচ্ছে বলেই। বাকি কথাটা নিজেই জবরদস্তি জিভের ডগায় চেপে বসে— বাবা বলতে চেয়েছিলেন সার্থকতার কথা— আশ্চর্য একবারও কেন সার্থকতা কথাটা বাবার মনে পড়ল না। মৃগাঙ্কের শৈশবে নয়ন ছিল আজকের মৃগাঙ্ক। আর একথা ভাবলেই বাবার ইমেজ তার চোখে কেমন বিবর্ণ হয়ে পড়ে, যতদিন তারও ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ছিল, মৃগাঙ্ককে বড় করার দায় ছিল, কই ততদিন তো বাবা এ নিয়ে বিশেষ মাতামাতি করেনি। বরং এক নির্দয়, অমোঘ সত্যের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত, ঠিক এখন মৃগাঙ্ক যা করে চলেছে। এরকম লুকোচুরির দরুন মৃগাঙ্কের যে কোনও কুণ্ঠা আছে তা নয়। সে ভুলেও নিজেকে সামান্য জ্ঞান করেনি এ জন্য বরং সত্যের প্রতি বাবার এই আসক্তিকে ভীমরতি, বুড়ো বয়সের একটা বাতিক বলেই

মনে করে। ওই ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জনের কথা মৃগাঙ্ক কল্পনাও করতে পারে না। জীবনের সীমার বাইরে সে ভাবে না, বিশ্বাস করে না। তার বৃদ্ধ বাপের উচিত ছিল চাকরি ফুরিয়ে যাওয়ার পর খবরের কাগজে নিয়মিত চিঠি লেখা, বা খাস্তা কাগজের স্তূপ থেকে নিজেরই পুরনো লেখাগুলো কপি করে পত্রিকার সম্পাদকদের পাঠানো, নজরুল-রবীন্দ্র জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি হয়ে অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা (জীবনের পর্বগুলির জন্য সুন্দর সব ব্যবস্থা রয়েছে) করা। তিনি এসব (পাতি) কাজে নিজেকে জড়াননি। অবসরপ্রাপ্ত, পেনশনভোগী এক বৃদ্ধকে জন্মাতে দেননি নিজের মধ্যে।

মুখে কখনও বলেননি, ইঙ্গিতইশারায়ও জানতে দেননি এক গূঢ় পরিকল্পনার কথা। ব্যাপক কোলাহলের মধ্যে যা ছিল একটি রশ্মি, এক স্থায়ী সুর। এই সুর, এই রশ্মি আত্ম-আবিষ্কার। দুর্ঘটনায় যেন স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিলেন। নার্সের, ডাক্তারের সাদা ইউনিফর্মের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন একযুগ :

মনে পড়ছে ?

না।

কিছু মনে পড়ছে না ?

কিছু না।

বিস্মৃতির, অসুখের অভিজ্ঞতার কথা মৃগাঙ্ককে পরে নিজেই বলেছিলেন। আর এই কথাটা বলবার জন্য এক ভিন্ন পরিবেশ, মৃগাঙ্কের সঙ্গে নতুন এক ধরনের সম্পর্কের প্রয়োজন ছিল। একদিন সেই পরিবেশ গড়ে উঠবে, দু-জন পুরুষ পারিবারিকতার বাইরে পরস্পরকে চিনতে পারবে— এ ব্যাপারে নয়নবাবুর কোনও সংশয় ছিল না। বা, তিনি সেই ভবিষ্যত দেখে ফেলেছিলেন বলে দৃঢ়চিত্তে অপেক্ষা করতে পেরেছিলেন : জানতাম বাপছেলের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে তোর সঙ্গে জমিয়ে কথা হবে একদিন।

সময়জট খুলে গেল, একদিন মৃগাঙ্ক দেখেছিল দুঃস্বপ্ন থেকে উদ্ধারের স্মৃতি জেগে ওঠায় বাবা আশ্চর্য মুগ্ধ হয়ে আছে, তার পাশমুখ আলোকিত বলে কেমন রহস্যময় লাগছিল। শিরার বাঁধন ছিঁড়ে যেন জেগে উঠছে আত্মা। মৃগাঙ্ক রহস্যবিলাসী নয়, শরীরমনে পূর্ণ মানুষের বাইরে কোনওরকম আত্মাটাত্মায় সে বিশ্বাস করে না। এ হেন মৃগাঙ্কের কাছে দূরপাল্লার ট্রেনের এক সহযাত্রীর মতো যেন শুধু কালক্ষয় করতেই নয়নবাবু এক আজগুবি গল্প ফেঁদে বসেছিল (মৃগাঙ্ক ভেবেছে)। তবে তার কথনভঙ্গির দরুন, চাপা গাম্ভীর্যপূর্ণ কণ্ঠস্বর ও মুখের উপর হালকা মেঘের পরতের মতো ভেসে ওঠা ভাবানুভূতির জন্য খুব সিরিয়াস লাগছিল। গোপনীয়তার, গুহ্যকথার এক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

তাতেই বা কী ! জিনিসটা ধোপে টিকছিল না, অন্তঃসারহীন, জলো কথা মনে হচ্ছিল। বাজে কথার বাহুল্য, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল।

আমি হিন্দুটিন্দু নই।
তো ?
জন্মজন্মান্তরে বিশ্বাস করি না।
(ধর্ম সংস্কার মানিনা বলে, ভগবান কিংবা ভূত মানিনা বলে তারপর দিব্যদৃষ্টি লাভের গল্প, ভূত যে সত্যিই আছে তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ দেবার লোভ মৃগাঙ্ক এর আগে অনেকের মধ্যে দেখেছে, তাই সে সতর্ক ছিল।)
তবু দেখলে···
না, কিছু দেখিনি।
তাহলে কী !
সেদিন এর বেশি কথা এগোয়নি, আবার সেই সাদা দেয়াল, সেই আকস্মিক নীরবতা। হঠাৎ-ই স্তব্ধ হয়ে যান নয়নবাবু। এবং এজন্যে তাঁকে কোনও চেষ্টা করতে হয়নি, 'কী' এই প্রশ্নটিই মারণাস্ত্রের কাজ করেছিল কি-না মৃগাঙ্ক জানে না, তবে ওই বোকা বোকা গোপনীয়তা, অর্থহীন রহস্য শেষ হল জেনে সে বেশ স্বস্তি পেয়েছিল।
আহ !

ভাষাটাষা

আত্মবিস্মরণ ও আত্ম-আবিষ্কারের গল্পটি অকথিত থেকে গিয়েছে, নয়নবাবু এ প্রসঙ্গে ছেলের কাছে আর কোনওদিন একটিও কথা বলেনি। এই নির্বাকতা যদিও তার ভাষা কেড়ে নিতে পারে না, তার দৃষ্টি, কিছু সূক্ষ্ম আচরণ ও নানাবিধ মুদ্রার মধ্যে ধরা ছিল আত্ম-আবিষ্কারের এক অকথিত কাহিনী। এবং সেই কাহিনীটি একেবারে নিজস্ব ভাষা ছাড়া কিছুতেই বলা যাবে না আর সে ভাষা অন্যে বুঝবে এমন সম্ভাবনাও নেই। বা, সাধারণের বোধগম্য ভাষায় কাহিনীটি উপস্থাপনার সমস্যাই এখানে নয়নবাবুর গোপনীয়তার উৎস। যদিও মৃগাঙ্ক জানে বাবা এটাকে ভাষার সমস্যা হিসাবে দেখেনি।
মানুষ কি আবিষ্কার ছাড়া, সত্যসন্ধান ছাড়া, বাঁচতেই পারে না ?
আহার-নিদ্রা-মৈথুনের সমান্তরাল এই বাস্তবতা নয়নবাবুকে, মৃগাঙ্কের বাবাকে খাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

পৃ : ২৮৩

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে শিক কাবাবের একটি দোকান ও তার পিছনের খালিকুঠি* লাগোয়া এক

* সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় মৃগাঙ্ক এই কুঠিতে দালালের সঙ্গে একবার গিয়েছিল। ৪০ টাকা খরচ করে একটি অ্যাংলো মেয়ের সঙ্গে শোয়, মেয়েটি তাকে বুকে টানা মাত্র মৃগাঙ্কের হয়ে যায়। যাচ্ছেতাই অবস্থা, শরীর নোংরা করায় মেয়েটি মা-মাসি তুলে গাল দিয়েছিল।

লম্বা ফালি ঠাসা ছিল পুরনো, দুষ্প্রাপ্য কেতাবে। পুরনো বইয়ের দোকানটি চালাত সুলেমান নামে লম্বাটে মুখের পেটানো জবরদস্ত চেহারার এক প্রবীণ, সাদা চাপ দাড়ি আর সাদা মেঘের টুকরোর মতো ভুরুই সুলেমানের মুখ। দোকানটির দুদিকের দেয়ালে ইট সিমেন্ট ইত্যাদি নেই, অজস্র, অসংখ্য বই প্রসব করে দেয়াল অন্তর্হিত হয়েছে, মেঝে নেই— সেখানেও বইয়ের স্তূপ, স্তূপের ফাঁক আছে ৮/১০টি, একমাত্র সুলেমানই সেই ফাঁকগুলিতে নির্ভুল পা ফেলে ফেলে একটি স্তূপ থেকে অন্য স্তূপের কাছে, একটি তাক থেকে অন্য তাকের কাছে চলে যেতে পারে, টর্চের আলোয় খুঁজে নিতে পারে নির্দিষ্ট কোনও বই। এই অন্ধকারে, পুরনো, খাস্তা কাগজের গন্ধে, সংকীর্ণ পরিসরে জোনাকির মতো জ্বলন্ত সুলেমানের চোখ, ক্রেতার চাহিদা মাফিক বইটি খোঁজার সময় সুলেমান কেমন যেন অশরীরী হয়ে উঠত, অদৃশ্য হয়ে যেত পুস্তকস্তূপে, টর্চের আলোই শুধু বলে দিত 'এইখানে সুলেমান আছে, সুলেমান এইমাত্র ডানদিকে চলে গেল।'

মৃগাঙ্কের বাবা ১৯৭৮ সালে সুলেমানের কাছ থেকে 'শহিদনামা' কিনেছিল, সোনার জলে লেখা সেই কেতাবটিতে কোম্পানির আমলে যাঁরা শহিদ হন তাঁদের সম্পর্কে বহু তথ্য ছিল। বাবা হঠাৎ কেন বিদ্রোহবিপ্লবে আগ্রহী হল মৃগাঙ্ক বোঝেনি, সে এটাকে খামখেয়ালিপনা বলে ধরে নিয়েছিল, ভেবেছিল ভীতু, গেরস্থ লোকেরা বীরত্বের গল্প ভালবাসে বলেই··· 'ফাঁসির মঞ্চে' নামে একটি নভেল যে কারণে বছরে ২০ হাজার কপি বিক্রি হয়, বাংলা বইয়ের এরকম বিক্রি দেখে প্রকাশকরা পর্যন্ত তাজ্জব!

বই বেচাকেনার একটি রেখচিত্র ছিল শূন্যে, মৃগাঙ্কের মনে আছে সেই শূন্যের দিকে কিছুক্ষণ ঠায় চেয়ে থেকে তার বাবা সাধারণের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছিল আর যেমন-যেমন বুঝছিল সেইমতো দু-চারটে কথা বলছিল। মৃগাঙ্ক বাক্যের সেই টুকরো-গুলো সাজিয়ে নিয়েছিল:

স্বপ্নে মৃত্যুটিত্যুতে ভয় নেই, আমি তো কতবার স্বপ্নে মরেছি, এমনকি তারপর বিশ্বাস করতে পারিনি শরীর আছে বলে, মনে হয়েছে 'এ তো আমি নই।' একবারও কি আঁতকে উঠেছি? কই, মনে পড়ছে না তো।

প্রহ্লাদের মতো, কৃষ্ণের মতো··· পাহাড় থেকে ছুঁড়ে দিলে, আগুনের বন্যার মধ্যে ফেলে দিলেও বেঁচে উঠব। তবু একটা ভয় তো থাকেই অদ্ভুত এক শিহরণ। এই ভয়শিহরণ নেতির, কিছু নেই, সজ্ঞানে একথা ভাবি কী করে।

শিহরণ কী করে শক্ত মলাটবন্দী হবে?* কী করে একটি কেতাবের মধ্যে, অক্ষরমালায় গেঁথে নেওয়া যায়!! 'শহিদনামার মধ্যে বিশ্বের একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক খোঁজার চেষ্টা করেছিল আমার বাবা', মৃগাঙ্কের ধারণা।

---

* পুনশ্চ: মলাটবন্দী করার মধ্যে এক ধরনের সিরিয়াসনেস থাকে, সত্যিমিথ্যে নিয়ে মুগুরভাঁজা, অনুভূতি জিনিসটা তো ঠিক সেরকম নয়।

এশীয় এই ভূখণ্ডে, ভারত নামের দেশটিতে ফকির বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের শহিদরা আদর্শায়িত হয়েছেন, অম্লান ও জ্যোতির্ময়ভাবে ভাবমূর্তি হয়ে উঠেছেন তাঁরা, রক্তমাংসের মানুষ এইভাবে 'স্বাধীনতা', 'ন্যায়', 'মুক্তি' ইত্যাদি হয়েছেন।

আদর্শের জন্য প্রাণ দান!

তুমি বিশ্বাস করো না?

সেকথা নয়।

তবে?

বড় অবাক লাগে।

এইভাবে দেহপ্রাণকে অস্ত্র করে তোলা, অর্ঘ করে তোলার মধ্যে বাবা দুটি প্রক্রিয়া দেখেছিল বলে মৃগাঙ্ক মনে করে, মানুষ নিজের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে ফেলছে, সে আর তখন মানুষমাত্র থাকছে না, সহজিয়ারা যাকে বলে 'পুজোর ফুল' (খুবই ক্লিশে কিন্তু বাবার ধারণা ক্লিশে হল এক রকম সত্যসঞ্চয়, যতই বোকাবোকা শোনাক সেটি সত্য) হয়ে উঠছে তাই। এরপর আসছে নিবেদন, দান, বা ত্যাগের কথা।

কোথাও হননের কথা নেই। আমাদের ইতিহাসে হত্যার কোনও রেকর্ড রাখা হয় না। এই যে নিশ্চিহ্নকরণ একে বলা যেতে পারে হত্যার হত্যা; বা এমন খুন যেখানে শুধু লাশ নয় নিহতের গোটা ইতিহাসই লোপাট করে ফেলা হয়, যারপর সে যে কোনওদিন ছিল এইটেই প্রমাণ করা যাবে না। আর যে কোনওদিন ছিলই না সে খুন হয় কেমন করে, হাঃ!!

অথচ সে নির্যাতিত হয়েছে সর্বপ্রকারে

কঠিনতম শাস্তি পেয়েছে

ল্যাংটো করে চাবকানো হয়েছে ধর্মের নামে

এশিয়ার বনাঞ্চলে, যুদ্ধে, তার রক্ত ঝরেছে

মাটি এখনও গরম, জায়গায়-জায়গায় লাল হয়ে আছে তবু শহিদনামায় তারা নেই।

রাইটার্সে পাবি।

কেরানিরা!

নাক সেঁটকানোর কিছু নেই।

তাই বলে?

হ্যাঁ তারাই, কেমন ভয়ে গুটিয়ে থাকে দেখেছিস।

এইসব পাগলামি। মৃগাঙ্ক জানে। তার বাবা ভারসাম্য হারাচ্ছে এবং সে নিজেও সচেতন এ ব্যাপারে, যদিও পাত্তা দিচ্ছে না, মনে করছে এই যে সারাজীবন ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টায় কেবলই আত্মপীড়ন করলাম তাতে কী লাভ হল, কে বাঁচছে এতে। কেউ কি সত্যি বাঁচছে?

বাবা যে ঠিক রাইটার্সের কেরানিদেরই মিন করছে এমন নয়। এখন কেউ যদি বিড়বিড়

করে চিন্তা করে এবং সেভাবেই মানুষের সঙ্গে কথা বলে চলে, চিন্তার সুবিধার জন্য ভাষা ভেঙেচুরে এগোতে চেষ্টা করে, শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্যন্ত না মানে বা নতুন অর্থ আরোপের চেষ্টা করে, মৃগাঙ্ক বুঝতে পারে না কেন সে কথা বলে, কী দরকার।

লেখাটা আর এগোবে না ভেবেছিলাম, এইখানেই 'শেষ' বলছি না, 'শেষ' এই শব্দের মধ্যে পরিণতি, পূর্ণতার ইঙ্গিত থাকতে পারে। সম্ভাবনার কুঁড়ি। দম ফুরিয়ে যাওয়া তো ঠিক তা নয়, নয়নের ভাষা স্তব্ধ হোক যদি ভাবি, তাহলে এই আঁচড়কাটা, এই পণ্ডশ্রমও শেষ হোক— এই রকম আর-কি।

---

৪. ৭. ৮০.

মৃগাঙ্ক একদিন অফিস থেকে যাচ্ছেতাই রকম ব্যাজার হয়ে ফেরে (৪. ৭. ৮০) (— নিজেকে ছিবড়ে মনে হচ্ছিল, এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, প্রায়ই এরকম হয় এবং বেশিরভাগ দিনই মৃগাঙ্ক এই তিক্ততা পেটের মধ্যেই হজম করে ফেলতে পারে, তাঁর ধারণা এ জাতীয় পদার্থ হজমের বিশেষ ক্ষমতা আছে মানুষের হজমযন্ত্রের কিন্তু এক-আধদিন সে হেরে যায় পেটের ভেতর ক্ষয়ের ভ্রূণ রাক্ষসের মতো অতিকায় হয়ে ওঠে এইরকম দিনে মৃগাঙ্ক উৎসে ফিরে যেতে চায়, গর্ভাবাসের স্মৃতি কেন থাকে না এই কথা ভেবে আরও মুষড়ে পড়ে।) বাবার বইয়ের তাক থেকে এ-বই সে-বই টেনে নামায়, কোনও বইয়ের পেছন পড়ে ফেলে, হাটকাতে-হাটকাতে বেলগাছিয়ার একটি লন্ড্রির বিল পেল মৃগাঙ্ক। তাং ৫/৯/৬৯, ২টি ফতুয়া, ১টি পাঞ্জাবি, ডেলিভারি ডেট ১৪/৯/৬৯, মোট ১ টাকা ২০ পয়সা। সে ভাবছিল বাবা কি লন্ড্রি থেকে এগুলো আনায়নি, তাহলে তো গেল। ১০ বছরে হয়ত লন্ড্রির মালিকই টেঁসে গেছে, বা ওখানে হয়ত স্ন্যাকবার হয়েছে। এখন ওই ফতুয়া পাঞ্জাবির পচা সুতো ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। সে ভাবছিল, বেড়ে অ্যাডভেঞ্চার হবে। আর ঠিক তখনই বিলের পিছনে বাবার হাতে লেখা বাক্যটি দেখতে পায় মৃগাঙ্ক। বাক্যটি কথা বলে ওঠে :

কেন নিজেকে ইম্পর্ট্যান্ট ভাবতেই হয়, খুঁজতে হয়, হাতড়াতে হয় এমন কিছু যাতে লোকে আমাকে পাত্তা দেয়!

'পাত্তা' এই শব্দটি বেজে চলেছে, যেন ডোরবেল, সেইরকম ডিং ডং, ডিং ডং। চায়ের গ্লাসে চামচের ঠুনঠান, টেবিলে তাল ঠোকা, ট্রামের ঘণ্টি, চটির ঘসটানি, শিস, 'পাত্তা' হল কীভাবে, বাংলায় তো বলার কথা 'গুরুত্ব', গুরুত্বপূর্ণ', মৃগাঙ্ক শব্দটির

আওয়াজ ধরে রাখতে রাখতে ভাবে, গুরুত্ব কি এতে হ্রাস পেল, না কি সে দরবার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জোব্বার বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ল, পাবলিক হল, সবাই মেনে নিল, 'হ্যাঁ ভাই আমরা কিঞ্চিৎ গুরুত্ব পিপাসু আছি' / 'ওই রিকগনাইজ করার ব্যাপারটা' / 'কালোয়ারও সাহিত্য সম্রাটের আড্ডায় ঠাঁই চায় হে।'
ওই দিনই লন্ড্রির বিলটিকে পাসপোর্ট করে মৃগাঙ্ক পেটের ভেতরে ফেঁপে ওঠা বায়ু ও তিক্ততার ফাঁপা একটি নল থেকে ছাড়া পেয়ে খড়কুটো আঁকড়ে, কিছুটা বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে এক সময় হালকা হওয়ার পর বইয়ের তাকটিতে আরও খোঁজাখুঁজি চালাল। আর তখন তার মনোভাব শিশুর, যেন সত্যিই সে এক মজাদার অভিযান, চমৎকার গোয়েন্দাগিরি চালাচ্ছে এবং তার বিশ্বাস এখুনি আর একটা কোনও আশ্চর্য জিনিস, সূত্র পেয়ে যাবে।
খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ
সন্ধানবেগ যেমন বমন ও অন্যান্য বেগ
তামাকের একটা খালি প্যাকেট পেল সে, প্যাকেটটিতে নোঙর ছাপ রয়েছে, এই ছাপ একটি বিশেষ ব্র্যান্ডের, ক্যাপস্টান, নোঙর চিহ্নটি থেকে যেন সেই বিশেষ ব্র্যান্ডের তামাকের ধোঁয়া আসছিল। তাকটির এক কোণে রক্তের দাগ মৃগাঙ্কের নজর এড়ায়নি, তবে কি না দাগটা লাল রঙের, রক্তফক্ত না-ও হতে পারে। দু চার দানা বালি লাগা গুটিকয় ঝিনুক, ময়ূরপালক এবং জং-ধরা একটা ব্লেডের পাশে কেতরে পড়েছিল 'শহিদনামা' যার কিছু পৃষ্ঠায় আলপনা আঁকা হয়েছে অজস্র সূক্ষ্ম ছিদ্রে, আঁকার ধরনে পরিসীমা রচনার চেষ্টা ধরা পড়ে। এসব উইপোকার কীর্তি। প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপার···গোয়েন্দা গপ্পো, উইপোকা··· সময়সেনা···
এইরকম ভাবছিল, বলছিল, শুনছিলও। কোনটা যে মৃগাঙ্কের বলা আর কোনটা তার বাবার সেসব এখন আলাদা করে ঠিকঠাক সংলাপের মতো সাজানো যাবে না। বোঝাই যাচ্ছে এক ধরনের ছেলেমানুষি থেকে তাকের পর তাক হাতড়াতে-হাতড়াতে মৃগাঙ্ক যখন তার ব্যাজার ভাবটি হারিয়ে ফেলেছিল, 'খোঁজা' নামের অর্থহীন অথচ আনন্দদায়ক একটা খেলায় মেতে কিছুটা আত্মভোলা হয়ে পড়ে সেইসময় কখন যে নয়নবাবু ঘরে ঢুকেছে মৃগাঙ্ক জানতেও পারেনি। বা মৃগাঙ্ক কার্যকারণ বুঝতে পারছিল না, তাই অগ্রপশ্চাৎ-ও ভুলেছিল আর আগে-পরে না থাকলে সময়ও থাকে না। সময় ছিল না। নয়নবাবু ঘরটিতে—এভাবে বলা যায়, মৃগাঙ্কও সেখানে, দুজন মানুষ জাস্ট কথা বলছিল। হয়ত বিদ্রোহ ও প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকর্মকে বোঝার চেষ্টা করছিল। এরকম মজা তারা খুব করত, বেশ একটা আজগুবি গড়ে ওঠে এতে। এখন চেষ্টা করা যেতে পারে '৭৯ সালের গ্রীষ্ম সন্ধ্যায় ফিরে যাওয়ার। সংলাপ কুড়িয়ে নিয়ে দুজনের মুখে ঠিকঠাক বসালে কী রকম চিত্রনাট্য হয় দেখা যাক :
নয়ন ॥ চিরন্তন, শাশ্বত·· এসব কল্পনা।

মৃগাঙ্ক ।। এইমাত্র তাকে নারী বলেছ।
নয়ন ।। বলেছি কি রে! তার সঙ্গে ঘর করেছি, শুয়েছি!
মৃগাঙ্ক ।। অমৃতের সন্তান, হাঃ।
নয়ন ।। তাই প্রত্নতত্ত্ব বাজে, শাহিদ-ফাহিদও…
মৃগাঙ্ক ।। চিরন্তন!
নয়ন ।। সমুদ্রগর্জন।
মৃগাঙ্ক ।। একটা কথা মনে পড়ছে।
নয়ন ।। বলে ফেল, আড় কীসের, ধ্যাত, দে, আরেকটু ঢাল।
মৃগাঙ্ক ।। ব্যাড পোয়েট্রি।
নয়ন ।। বাট গুড পর্নোগ্রাফি।

পোয়েট্রি আর পর্নোগ্রাফির মধ্যে কয়েক পাত্তর মদ চলকে পড়ায় সব জেবরে যায়, মৃগাঙ্ক ক্যাপস্টান সিম্বল নোঙরের কথা তুলেছিল, নয়নবাবু খ্যাক-খ্যাক করে হেসে ওঠেন, 'ওটা ইতিহাস।'

'তাহলে সমুদ্র নিয়ে লড়া যাক' মৃগাঙ্ক বলে, 'বিশেষ যখন নোঙর পেয়েছিস'— নয়নবাবু।

নোঙর
সমুদ্র
ইতিহাস
পোয়েট্রি
পর্নোগ্রাফি
পর্নোগ্রাফি পোয়েট্রি ইতিহাস—নোঙর
'মেড়া নড়ে খুঁটির জোরে।'
কে বলেছিল? মৃগাঙ্ক? নাকি নয়ন?

অক্ষরগ্রাস

পিঁপড়ে অক্ষর আমাদের খেয়ে শেষ করেছে, কেতাব শুষে নিয়েছে আমাদের মেধা, একটা নতুন শব্দ পর্যন্ত আর কেউ কোনওদিন লিখতে পারবে না, সবকিছু সম্ভব, চামড়ার কাগজ থেকে টিস্যু পেপার পর্যন্ত এক সীমাহীন সাদা জমিতে সমস্তই লিখে ফেলা হয়েছে। এইসব লেখা থেকে ঘাতকরা ছুটে আসছে, বিচিত্র কোলাহলে। নয়ন মনে মনে কথা বলেন, 'আর আমরা রয়ে গেছি ওই সব বইয়ের টীকা হিসেবে, ধ্যাত…'

উর্দু ভাষায় লেখা একটি ধর্মীয় পুস্তককে রোজ সকালে মাথায় ঠেকাত লখনউয়ের রাজমিস্ত্রি, সে কিন্তু পড়তে জানত না, লিখতেও না। মৃন্ময়ীর সঙ্গে রাজমিস্ত্রির মিল

এই পর্যন্ত যে, সেও বেশ শ্রদ্ধাটদ্ধা করে তাক থেকে গাদা গাদা বই নামিয়ে নিজের কোলটিতে রাখত, নয়নবাবু দেখেছেন মৃন্ময়ী শাড়ির আঁচল দিয়ে বইয়ের কোণ, মেরুদণ্ড, মলাট পরিষ্কার করছে, তার মুখে তখন এক অলৌকিক প্রশান্তি। যেন সে এখন বিশুদ্ধ একা এবং তার হাতে রয়েছে পৃথিবীর অন্তর্বস্তুসমূহ।

ঘটনার বিবরণ সত্যের বিচারে বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য, গল্পের মতোই তা হাজার রকমভাবে বলা যায়। সত্য সেখানে ধ্রুব নয়। এই ধরনের বিবরণমূলক সমস্ত রচনাই ভ্রমণকাহিনী গোত্রের, টানটান করে লিখলে গোয়েন্দাকাহিনী। সেখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল পাঠ, পড়া। পঠিত হবে, লোকজন পড়বে, পড়তে-পড়তে বইটিকে, রচনাটিকে নিজেরা সৃষ্টি করবে, এ কথা আগাম ভাবলে একটি বর্ণও লেখা সম্ভব নয়।

তুচ্ছ একটি শব্দ, দমকা বাতাস, রঙের কোনও মিশ্রণ, অর্থহীন যন্ত্রণা, জ্বর……জীবনানন্দের একটি পংক্তির থেকে মহত্তর কোনও বাস্তব আমার কল্পনাতীত।

কিন্তু এই গদ্য রচনাটি সারল্যকে মেরুদণ্ড করতে পারছে না, দালির ছবির মতো খুলির ভিতরে খুলি আবিষ্কারের এক দুর্দমনীয় প্রমত্ততায় সে আমাকে, লেখককে সম্মোহিত করে কেবলই সাহিত্য হয়ে উঠতে চায়। আমি তো জানি বুড়ো নয়নের গপ্পোটি এক লাইনের : মৃগাঙ্ক-এষা নীল চলে যাবে, নয়নের বাড়ি তখন খা-খা শূন্য, নিজেকে নিয়ে তার বিচিত্র বামনাইপনা তখন কে দেখবে, কেইবা শুনবে! খেলা ভেঙে যাবে।

তখন শেষ হবে এই অসম্পূর্ণ পুস্তক রচনা আর এক অন্ধভ্রমণ, ত্রুটির কারু কাজ।

নিজের ছায়ার কাছে উৎসর্গিত বলেই হয়ত টের পাচ্ছি এই রচনাটিরও ছায়া, সেই ছায়া ভিন্ন এক রচনা, আর একটি গ্রন্থ।

মৃন্ময়ী এবং সেই রাজমিস্ত্রি (যে ছাপা অক্ষরকে আলতোভাবে চুমো খেত) যেন একই ব্যক্তি। রাজমিস্ত্রি বলেছিল 'আল্লার বাণী ফুটে উঠেছে এই বইটিতে।'

'অন্ধকারে কেটে গেল এই জীবন' মৃন্ময়ী বিড়বিড় করেছিল 'অন্ধকার জেলখানায় অজস্র বছর…'

'আমার চুল সাদা হল…'

'চামড়ায় দাগ পড়ল'

এবং আরও কত স্বগতোক্তি ! কিন্তু সে কখনও বলেনি এইসব দাগে তার চামড়ায় ফুটে উঠছে অক্ষর, কোনও বাণী খোদাই হয়ে যাচ্ছে ; 'আল্লা' শব্দটি ফিকে নীল রঙে উল্কির দাগে গড়ে উঠেছিল অন্যত্র, রাজমিস্ত্রির হাতে, সে বলেছিল, ব্যাটারি চার্জের শব্দে, আহ্বানে আমার এই হাতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ফুটে উঠছিল।

মৃন্ময়ী অশিক্ষিত কিন্তু নিরক্ষর নয়, হারানো সামগ্রী অন্বেষণ করত প্রত্নতাত্ত্বিকের নিষ্ঠায়। সোনার চিরুনি খুঁজে খুঁজে একবার সে প্রায় পাগল হওয়ার উপক্রম, মৃন্ময়ীকে কিছুতেই বোঝানো যায়নি ষোড়শ শতকের ওই ধরনের কোনও জিনিস নয়নবাবুদের বাড়িতে কোনও দিনই ছিল না। নয়নবাবুর বাবার আমলেই তাদের অবস্থা একটু ফিরেছিল, তার আগের তিন-চার পুরুষের ইতিহাস হল হাড়-হাভাতের গল্প। আসলে নানান অদ্ভুত ধ্যান-ধারণা-কল্পনার জগতে বিচরণ করত মৃন্ময়ী, এ একটি ব্যাধি, বাস্তবকে সে এমন রঙে চুবিয়ে নিয়েছিল যে সামান্য একটি হাতির দাঁতের চিরুনিকে সোনার ভেবে তুলকালাম করেছিল। মজা হল মৃন্ময়ীই সঠিক ছিল। বিভিন্ন বস্তুর বিবর্তনের কথা ভাবলে তাই মনে হয়. সত্যিই তো এই সবের কতটুকুই বা আদিতে ছিল, বা এ সবই কি চিন্তা-কল্পনার, ফাঁপা এক পরিমণ্ডল থেকে, শূন্য থেকে নেমে আসেনি ? খুনির মুখের বর্ণনা শুনে-শুনে লালবাজারের শিল্পী সাদা ক্যানভাসের ভিতর থেকে জাগিয়ে তোলে একটি মুখ (ফটোগ্রাফ নয়) সেই মুখচ্ছবি কণ্ঠার হাড়ের বেদীর উপর বসিয়ে মেট্রো ধরতে গিয়ে, বিমান বন্দরে রিপোর্টিং করতে গিয়ে, পিটার ক্যাট বারে হুইস্কির গ্লাস টানতে গিয়ে, বা দশটা-পাঁচটার অফিস যাত্রীর মাংসস্রোতে ভাসতে-ভাসতে নৃশংস খুনি তো কতবার ধরা পড়ল !

নয়নবাবু এই গল্পটি বলে মৃন্ময়ীকে ভয় পাইয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, 'ঠিক তোমার মতো চাপা নাক আর ভিটকপালি একটা মেয়ের ছবি হাতে গোয়েন্দারা ঘুরছে, তোমাকে খুঁজছে।'

মৃন্ময়ী হেসেই খুন, 'আমি ! আরশোলা দেখলে ভয় পাই।'

কোনও দিন খুন করোনি !

ধ্যাত।

সত্যি !!

যেন এর থেকে অসম্ভব কিছু হয় না। ঠিক যেমন এখন নয়নবাবু কল্পনাও করতে পারে না : মৃন্ময়ীর সঙ্গে এরকম ছেলেমানুষিও হয়েছে !

পাঠোৎসব

'এমন গপ্পো, এমন লেখা, বেশ ফিরে ফিরে পড়া যাবে, চেটে-চেটে পড়া যাবে, হই হই করে পড়া যাবে, যে কোনও পৃষ্ঠা, যে কোনও লাইন থেকে পড়া যাবে, পড়াটা ছবি দেখা, মজা দেখার মতো, গোগ্রাসে গেলা গল্পের মতো কামোত্তেজক হলুদ মলাটের চটি বইয়ের মতো হবে, এমন হবে যেন পড়ছি না তবু পড়াটা হয়ে যাচ্ছে শরীর সুখের মতো হবে...'

কফি হাউসের আড্ডায় কার গলার শিরা ডেলা পাকিয়ে যাচ্ছিল এই সব শব্দে?

পারিবারিক অ্যালবামে শিশু-যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এলোমেলো অথচ ঠাসবুনট হয়েছিল, যেন ছবির ফ্রেমটির মধ্যে যাতে তারা ষাট-সত্তর জন এঁটে যায় সে জন্য যথেষ্ট কসরত করতে হয়েছিল! এই ছবিটির মানুষজনের হাতেও অজস্র ফটোগ্রাফ এসেছিল নিশ্চয়ই, সেইসব ছবির মানুষ অন্য কোনও সূত্রে, ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক গ্রুপ ছবিতে, অফিসে, ক্লাবে, স্কুল-কলেজের পুনর্মিলন উৎসবের ছবিতে শস্য বিন্দুর মতো রয়ে গেছে। নয়নবাবু ছবির মানুষজনের মধ্যে, শস্যবিন্দুর মধ্যে মৃন্ময়ীর মুখ সহজেই পেয়ে গেলেন। ছবির এই জাদুঘরে মৃত, অবলুপ্ত, হারিয়ে যাওয়া মানুষের মুণ্ড থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের যেন-বা শিকার করা হয়েছিল।

বিশাল মোটা অ্যালবামটির আরও মোটা, শক্ত পাল্লা দুটি খুলে নয়নবাবু কতবার নীলকে ডেকেছেন, 'দেখবি আয়, নীল।'

ছবির অজস্র মুখের অনেককে নয়নবাবু নিজেও চেনেন না, 'কে যেন দাঁড়া।' অনেক ভেবেও এক কিশোরীর নাম ও তার সঙ্গে নয়নবাবুর কী সম্পর্ক ছিল মনে করতে পারেননি! হয়ত ওই কিশোরী মৃন্ময়ী, তিনি একবার বিড়বিড় করেছিলেন, 'তোর দিদা নয় তো! মৃন্ময়ী! না, মনে পড়ছে না।'

লাজুক, স্পর্শাতুর এক রূপকথা বহন করত মৃন্ময়ী, বড় অসুখী ছিল সে, রূপকথার প্রেম তার জীবনে কোনও দিন ডানা মেলেনি।

শিল্পপ্রতিমার থেকেও গভীর এক প্রেমের গল্প বলত মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ীর কাছে সেই প্রেমিকযুগল ছিল রাধাকৃষ্ণের মতো-।

আদি মানবমানবী।

মৃন্ময়ী তাদের কথা বলত।

তার গায়ে কাঁটা দিত।

জ্বর এসে যেত।

মৃন্ময়ী বলেছিল :
ওদের নাম উচ্চারণ করা মাত্র মার মুখে আশ্চর্য আলো এসে পড়ত, আমি দেখেছি।
হয়ত এই গল্পে এক দানা বাস্তব নেই। মুখ-ফেরতা এই গপ্পো মৃন্ময়ীর কাছে এসেছিল। হাজার-হাজার বছর কাহিনীকে জীর্ণ করতে পারেনি, মৃন্ময়ীর মতোই কেউ হয়ত এই মুহূর্তে কাহিনীটিতে ঢেলে দিচ্ছে নিজেদের বুকের উষ্ণতা আর সেই জীবনদানে কাহিনীটির যৌবনে কোনোদিন ভাটার টান লাগবে না।
এতদিনে কাহিনীটি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে নির্ঘাৎ। আর গ্রন্থভুক্ত হওয়ায় তার শ্রোতার (বা পাঠকের) সংখ্যাও বেড়ে চলেছে হু হু করে। গ্রন্থে আলো আছে। নিউজপ্রিন্টের ম্যাড়ম্যাড়ে রঙের ভিতর থেকে সেই আলোর ত্বক সহজে দেখা যায় না। গাঢ় এক হেঁয়ালি, এরকম এক সূত্রের সামনে কবে যেন মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন নয়নবাবু। প্রাচীন ভাষায় সূত্রটি আঁকা ছিল। আর সেখান থেকে ঘর্ঘর শব্দে প্রচারিত হচ্ছিল একটি নির্দেশ, 'এখানে নয়, এখানে নয়…'
এই মিস্টিসিজম শৈশব ; রহস্য ও মুগ্ধতা।
তখন তার দেহ নমনীয়, ভঙ্গুর, জীবনের দ্যোতক।
মুগ্ধ শৈশব তার নমনীয়, ভঙ্গুর দেহ, সোনালি বিন্দু বিন্দু রোঁয়া জাগা হাত পা-সমেত এইখানে হাঁটুমুড়ে বসে আছে। নীল নয়, বিশেষ কেউ নয়, বিমূর্ত শৈশব এক। নয়নবাবু এষা, মৃগাঙ্কের পরিচিত গণ্ডী ভেঙে সে চলে গেছে অনেক দূর মানব শৈশবে।
মানব যখন শিশু ছিল। জ্ঞানের অভাব যখন তার অনুভবকে ত্রাসে বিস্ময়ে দোলাত। মাতৃগর্ভের দুলুনি, সেই হৃদস্পন্দন। সে ধীরে পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে, অজস্র স্তর পেরিয়ে জাগতে থাকত কিন্তু কখনওই খাড়া সটান উঠে দাঁড়াতে, সম্পূর্ণ জাগতে পারত না। তার আগেই অমোঘ নেশায়, ঘুমে ঢলে পড়ত। ভাড়াটেদের পল্টুর মতো, হয়ত,
হয়ত বা পৃথিবীর জন্মের মতো কোনও ঘটনার কথা স্বপ্নে ভেবেছে সে। তখন তার যে আত্মচেতনা হয়ত সেখানে গ্রহ-নক্ষত্রাদির ছায়া পড়েছে। পলকপাতে ঘটে গেছে এই সব।
শুধু ভুগতে ?
শুধু ভুগতাম।
ইস। রোগা ছিলে খুব ?
কাঠির মতো।
রেখার মতো ? প্রায় মরে যেতে ?
কতবার মরতে-মরতে বেঁচেছি।
কষ্ট হতো ?

খুব। আবার কেমন একটা টান ছিল, জানতাম যেন মরব না, মৃত্যুর খুব কাছ থেকে বরফ ছুঁয়ে ফিরে আসব।

কবে নীলকে এই সব গল্প বলেছিলেন স্মরণ (হা স্মরণ !) নেই, কত চট করে সব কিছু গল্প হয়ে যায় !!

এরকমই গল্প হয়ে যাওয়া একটি দৃশ্য, ঘটনা গ্রাম বাংলার ন্যাড়ামাঠে পড়েছিল। হাজার চেষ্টা করেও নয়নবাবু গল্পের হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারেনি, নয়নবাবুর মা-ই মৃগাঙ্ককে ঘুম পাড়াতে-পাড়াতে বলেছিলেন, 'তখন তোর বাবা তোর থেকে একটু বড়, এই আট-ন বছর হবে।'

১৯৩০ সালের ঘটনা। গরমের ছুটিতে বাবার সঙ্গে বলাগড় গিয়েছিলেন নয়নবাবু। সেখানে হই হই করে দিন কাটছিল আমবাগানে। ১৬ দিনের মাথায়, রাতে নয়নবাবুর চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে মা বলেছিলেন, 'কাল তুই আমি বেড়াভাঙা মাঠে যাব কেমন।'

বেড়াভাঙা কী মা ?

মাঠ।

না, বেড়াভাঙা কেন ?

নামটা ? কোনও শেষ নেই বলে।

তাহলে ফিরব কী করে !

ফিরব না।

কেন ?

কী হবে ফিরে ? কী আছে এখানে ?

নয়নবাবুর মা যেন অনন্ত পর্যটক, অনেক দেখেছেন তিনি কিন্তু বেড়াভাঙা মাঠের কাছে কোনও কিছুই কিছু নয়, আতঙ্কে ঘুমিয়ে পড়ার সময় ন-বছরের বালকের কানে সরু শব্দে বেজে চলেছিল : কী আছে এখানে···কী আছে এখানে···

ফসল কাটা, দলিত দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ শুয়ে আছে শিথিলভাবে, কাটা শস্যের গোড়ায় ঝকঝক করছে জলের দানা, হিম।

হুঁ / হ্যাঁ / কী সুন্দর / ওই দিকে / দ্যাখ-দ্যাখ / অত জোরে ছুটিস না / শোন / থাম / নয়ন / নয়ন।

এ ছাড়া ভূপৃষ্ঠে আর কোনও শব্দ নেই। সামান্য দূরে, বাঁ-দিকে খাদের মতো, সেখানে কলকল শব্দ হচ্ছে। দূরে কৃষকমূর্তি, লাঙল দিচ্ছে। লাঙলের ফলা মাটি আলগা করে একটি সরলরেখা এঁকে চলেছে, ওই রেখাটি পর্যন্ত মা আর ছেলে হেঁটে যাবে। রেখাটিও যেন খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল নয়ন আর তার মায়ের দিকে। আকাশ আর ভূপৃষ্ঠের ব্যবধান ঘুচে গেছে ওই রেখা বরাবর। অন্ধকার নামবে কিছু পরেই। সারাদিন কী করে যে মাঠ ভিজে থাকল সেইটি রহস্য। মা বলেছিল, অন্ধকার গাঢ় হলে, রাতের

শাসন নেমে এলে, আকাশ আরও জাগবে। অনন্ত নক্ষত্ররাজি এই শুকনো পৃথিবীতে তখন পরীর মতো উড়ে উড়ে নেমে আসবে। কেবল নামতেই থাকবে।

আমাদের ঠিকানা।

একটাই ?

হ্যাঁ, একটাই।

এই পৃথিবী।

পৃথিবী। এই…।

তবু কেন প্রাণ ঢেলে ভালবাসে না লোকে।

কত কাজ থাকে না লোকের।

কী এত কাজ !

কাজ মানে কাজ, কাজের কাজ

ধ্যার বাবা !

হ্যাঁ রে, সত্যি ! কী এত কাজ রে !!

তুমি জানো না ?

না, জানিনা।

মাঠের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল তারা। সূর্য তখন রঙের শোভাযাত্রা-সহ মহাপ্রয়াণে চলেছে, প্রান্তর, সবুজ ও আকাশ উদ্ভাসিত, প্রসারিত; সেই উদ্ভাসন ও প্রসার সম্ভাবনার একটি ঝিলিক মাত্র, বিপুল ও শেষহীন এক বিস্তার ও উদ্ভাসনের ইঙ্গিত। বিশ্ব। সে দেখে ফেলেছিল। বালক নয়নকে তার মা দেখিয়েছিলেন। মাকে আজ শিল্পী মনে হয় নয়নবাবুর। এবং তিনি ভাবেন আকাশ আর ন্যাড়া মাঠ ছিল প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ একটি বইয়ের দুটি পৃষ্ঠা, দিগন্তরেখা তাদের ভাঁজ, মেরুদণ্ড।

এই ঘটনাটির কথা নয়নবাবু মৃন্ময়ীকে বলেননি, এষাকেও নয় বসুধা তার মা-ই ডেকে ডেকে ফিসফিস করে বলেছিল, কী ভাবে বলেছিল ? সেইটি বিস্ময়। কেননা বলবার মতো, কাউকে জানানো সম্ভব বেড়া ভাঙার মাঠে এমন কিছুই ছিল না, সেখানে 'না' এই একাক্ষর শব্দটি লেখা ছিল, পূর্ণ হয়ে ছিল।

আমি শূন্য দেখেছি, শূন্যকে বিকশিত হতে দেখেছি, চারদিক ভাসিয়েও শূন্য অন্তহীন হয়ে আছে দেখেছি— একথা কি বলা যায়।

রামকৃষ্ণের বাল্যে নাকি এরকম কিছু একটা ঘটেছিল, বালক নয়নেরও ঘটেছে, আরও কেউ, অন্যান্য বালকদেরও ঘটবে… … … [হাসাহাসি করছে সকলে, এখন বস্তু-জগতের মাংসপিণ্ড থেকে আরাম চুষে নেওয়ার, সুখ ঘাটাঘাটির শরীরী ক্ষমতা হারিয়ে বুড়ো বয়সে নয়ন আমাদের যোগী হচ্ছে।] এখন তার অনেক কিছুই অর্থহীন মনে হয়, খাঁচা মনে হয়, অভ্যাসের দাসত্ব বলে অনুভব করে আর তখন তখন ন্যাড়া মাঠ ছুটে আসে সমস্ত আকার ভাঙতে ভাঙতে।

যুক্তি তক্কো আর গপ্পো

একটি গল্প তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে।

গল্পটির চরিত্ররা শব্দ ও শ্বাসাঘাতের রক্তমাংসে গড়া, এইমাত্র তারা হাঁটতে-হাঁটতে-হাঁটতে চলে গেল :

বস্তারের জঙ্গল ভেঙে চলেছে এক আদিবাসী বাপ। তার পিছনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে সাত-আট বছরের ছেলেটা। জঙ্গলে প্রতিধ্বনি তুলছে তাদের শ্বাস। হন্ হন্ শব্দ।

সেই বাপবেটা চোখের মণি (নয়নবাবুর) দখল করে নিয়েছে। এই জঙ্গল গভীর। এখানে বাপবেটা হেঁটে চলেছে এক গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়ে। সরে যাচ্ছে দূরে। সবুজ তাদের গ্রাস করছে। তখন তারা নেই। মশালের দাউ দাউ নেই। দুটি আলোক বিন্দু শুধু।

আবার চড়াই ভেঙে জেগে ওঠে দুটি মানব দেহ। পরিণত ও অপরিণত দুটি মানবদেহ।

এখন তারা প্রকৃতই চোখের সামনে, ঘামছে দরদর করে, স্নান করছে যেন। এর শেষটুকু (গল্পের, ঘটনার শেষ থাকা বাধ্যতামূলক।) জানে নীল, জানেন নয়নবাবু। তবু তারা অজস্রবার এই গল্পটি পরপর সাজিয়েছে, শেষ থেকে শুরু করেছে।

এখন ভাঙা মন্দিরটি দেখা যাচ্ছে। আবার শুরু হয়ে যায় বাপবেটার ওই মন্দিরযাত্রা। বারবার ঘটতে থাকে একটিই ঘটনা। অস্ত্রের ঝলসানি। বাপের গালে, চোখে ছিটকে লাগে ছেলের গরম রক্ত, কালো রুক্ষ, বয়স্ক চামড়ায় লাল রক্তের কোপ।

ওখানে একফোঁটা জল নেই।

বৃষ্টির উপাসনা, একে খুন ভাবা ঠিক নয়।

কঠোর আত্মত্যাগ।

মানবিকতার বিলাস এই জঙ্গল পেরোতে পারেনি।

গপ্পো শেষ। এবার যুক্তি তক্কো। এই আত্মদান বা হত্যার কিনারা করবে কে? শহিদনামায় এই ঘটনাটির উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আর গল্পটি নিজে এসবের তোয়াক্কাই করে না, তার ভাষায়, তার ভুবনে এসব নেই। গল্পের ভুবনটি আজব, নাকি যুক্তি তক্কোই আজব!

বস্তারের জঙ্গলপথ চলে গেছে সীতার বনবাস পেরিয়ে পুরাণ পেরিয়ে···

পৃথিবীর পিঠের খাদ কিংবা হিমবাহে গিয়ে থেমে যায়নি চলেছে তো চলেছেই, সামনে পিছনে দূরত্বের কোনও সীমা নেই বলে তাকে দূরত্ব বলা ঠিক হবে না। ডানা ভাঙা এরোপ্লেন, রকেটের টুকরো, লোহার মস্ত চাঁই, সুবিশাল রাডার কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। সামরিক উর্দির ছেঁড়া টুকরো, শিশুর খেলনা আর মানুষের, কুকুরের, পাখির

পচা মাংস...

মৃগাঙ্ক নীলকে উৎসাহিত করছে ভবিষ্যতের জন্য, বলছে দেশ বিদেশের মনীষীর কথা, 'কেতাব পড় নীল' / 'জানো' / 'বোঝো' / 'একদিন তোর শ্রম, তোর মেধায় বিশ্ব হাঁ হয়ে যাবে।'

সাফল্য! সাফল্য !!

নয়নবাবুর উপর এখন কোনও চাপ নেই আর, অনেকদিনই নেই, তাঁর আর কোনও আশা নেই। তিনি আর কিছু হতে পারবেন না (নীল বলে, 'আমিও হতে চাই না'। আশ্চর্য! যেন জন্মাতেই চায়নি!), যখন পল্টুর সঙ্গে গপ্পো করেন, রোদে পড়ে থাকেন বস্তুর মতো, সে যেন নিজেকে ছেড়ে দেওয়া পল্টুর কাছে, রোদের কাছে, পল্টু তাঁর গালে ওইভাবে কিছু লিখতে চায়। ঠিক যেমন 'শাহিদনামা' বইটির মার্জিনে ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরের পিন ফুটিয়ে ছাইভস্ম লিখে রেখেছেন নয়নবাবু।

স্বনামে কেতাব লেখার কী দরকার?

মানুষ তাহলে লেখে কেন?

আগের দিনে কত লোকে আবার লেখেনি, বইয়ের মার্জিনে একটা দুটো কথা লিখেছে। মহান ব্যক্তিদের রচনার সঙ্গে নিজের কথা জুড়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

শুধু দু-চারখানা বই ছিল?

হ্যাঁ।

নাকি একখানা?

ধর একখানাই।

স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ নিয়ে লেখকরা বিস্তর ভেবেছেন, মাথার চুল ছিঁড়েছেন, বর্ণগুলিকে পৃথক করে, সেসবের নির্যাস টেনে বের করার চেষ্টায় দুচোখের পাতা এক করেননি, অ এই বর্ণটি সাদা না কালো, রক্ত না নীল ভাবতে ভাবতে উন্মাদ হয়ে গেছে তারা।

যেন একটি পবিত্র পুরাণ লেখা হবে, মানুষের নির্ভরতার জন্য, তাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে সময়ের কূটকচাল বুঝে নিরপরাধ, সাধারণ, শিশুর মতো মানুষরা ফিরে পেতে পারে এক পবিত্র আতঙ্ক, তারা নতুনের অ্যাসিড আগুনে পুড়ে মরতে নিজেদের পতঙ্গ করে না তোলে।

সেই পুরাণের মধ্যে আছে এক গভীর গোপনীয়তা, সেইটিই ঐক্যসূত্র, সময়ের শেষ পেরিয়ে মানব একই থেকে যাবে গূঢ় ঐক্য ও গোপনীয়তার দরুন। আর তাতে কী নেই! পৃথিবীর শৈশব স্মৃতি, মাতৃগর্ভের স্মৃতিও আছে।

মৃগাঙ্ক-এষা-নীল ভবিষ্যতের যে বাড়ীটিতে (ফ্ল্যাট) যাবে বলে কথা ছিল এখন তা আর ভবিষ্যত নেই। তারা এখন সেখানেই আছে। নয়নবাবুর ধারণা মৃগাঙ্ক আবার কোনও ভবিষ্যতের খোঁজ পেয়েছে।

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় মৃগাঙ্ক এসে নয়নবাবুকে প্রায় জোর করে তার ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়। ফ্ল্যাটটির সর্বত্র এক ধরনের চৌকো আকার দেখে নয়নবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন 'হ্যাঁরে এরকম চৌকো কেন ? ছোট-বড়-মাঝারি কফিন বাক্সের মতো ?'

মৃগাঙ্ক ॥ তোমার মুখেই বা এত মৃত্যুর কথা কেন ?

নয়ন ॥ সত্যি এই 'কেন'-গুলো একেবারে যাচ্ছে তাই, খেতে দে।

ভাড়াটেরা মনে মনে আশা করছে নয়নবাবুর মৃত্যু হলে আর কোনও ওয়ারিশান থাকবে না। কেউ আসবে না তাদের উচ্ছেদ করতে। নাকি তারা আশা করছে নয়নবাবু বাড়িটা তাদের দান করে দেবে। পাড়া প্রতিবেশীরা ভালমন্দ নানান পরামর্শ দিয়েছে তার মধ্যে একটিতে নয়ন খুব মজা পেয়েছিলেন, 'আপনি সেবাসংঘে দান করে দিন, অমর হয়ে যাবেন ম'শয়।' নয়ন কিচ্ছুটি বলেননি, তাঁর ঠোঁটে একটি রেখা জেগেই মিলিয়ে গিয়েছিল।

'উনি কি পাগল হয়ে গেছেন' কেউ ভেবেছে, পাতিপুকুরের সাটার পেনসিলার টুটু বলেছিল 'দিব্যি একা-একা আছেন, পাগল হবেন কেন।'

পেনসিলার টুটু খুব অবাক হয়েছিল : আচ্ছা একটা মানুষ বিলকুল একা-একা থাকলে, বাচালপানা না থাকলে, এক জায়গাতেই দিনের পর দিন ঘুরঘুর করলে লোকে কেন তাকে পাগল ভাবে বলুন তো স্যার !

নয়ন টুটুর কথাটা শুনছেন, ধীরে বোঝার চেষ্টা করছেন, টুটুর মুখে উদ্বেগের রেখাগুলো পড়তে চেষ্টা করছেন। টুটু কি এতে কষ্ট পাচ্ছে, ওর চোখের কোণে চেরা সরু সরু দাগগুলিতে কী ও ? ঘাম না রক্ত ?* □

---

* 'উনি কি আর কথা বলেন না ?' কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, পাতিপুকুরের পুরনো বাসিন্দাদের একজন তার দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকে যেন সে বধির কিংবা এরকম অদ্ভুত প্রশ্ন সে জীবনে কখনও শোনেইনি।

কথা ?

হ্যাঁ।

বলেন তো। তবে খুব কম বলেন, এই ধরুন ৫০/৬০টি শব্দ বড় জোর। এতেই কুলিয়ে যায়।

এত সংক্ষিপ্ত, সংহত হয়ে আসছিল নয়নবাবুর শব্দকোষ, শেষের দিনটিতে তার মৃত চোখে একটি শব্দ আঁকা ছিল কেউ তা পড়তে পারেনি।

পুনশ্চ

২০০৯/১০ সাল, পূর্ণ বয়স্ক নীল সামুদ্রিক তরঙ্গের সামনে, বালির উপর পা ছড়িয়ে বসে আছে, মেয়েটি নীল জলরাশিকেই যেন জিজ্ঞেস করছে : ···বেশি জানলে দুঃখ বেড়ে যায়, বেড়ে যায়···

সমুদ্র গর্জন।

জলের বুক থেকে গোঙানির মতো, বাঁশির শব্দ ও সুরে পুরুষটি কী যেন বলল, তরঙ্গের শিখরে তখন বিদ্যুৎ কেঁপে উঠছে 'ছাখো, ছাখো!'

অন্ধকারে যেন নক্ষত্রস্নান, অন্ধকারে কে এক পুরুষ, কে এক নারী বিড়বিড় করছিল গর্জন স্তব্ধতা স্তব্ধতাই গর্জন

পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছে নীল, কে যেন বলছে, 'কী দরকার ছিল মুখে রক্ত তুলে পড়ার? নীল! জানার? কী দরকার! তবু···

তুমি খুশি? নীল!

খুশি খুশি।

এবং সে মেয়েটিকে বলতে শুরু করে নয়নবাবুর গল্প, 'জানো'··· □

সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

সম্রাটের নতুন মন বনাম সম্রাটের পুরোনো মন

["...'FEEL LIKE ? Oh, ...a most interesting question, my lad... er...Ultronic says...it can't even understand what you're getting at !'...
Adam felt acutely embarrassed. Whatever they should have done, they should not have laughed."

— Roger Penrose, *The Emperor's New Mind*, Vintage, 1990.]

মন ও বস্তু, বা আরো সাধারণভাবে চেতনা ও জড়, এ-দুয়ের সম্পর্কের সমস্যাটা বেশ পুরোনো। দর্শনচিন্তার বিভিন্ন প্রধান স্রোত খুব সম্ভব এই সমস্যা থেকেই বেরিয়ে এসেছে। রজার পেনরোজের *The Emperor's New Mind* বইটি এই সমস্যারই এক আধুনিক পর্যায়ের পটভূমিকায় লেখা। ঐ বইটিই এখানে আলোচ্য।

একটা কথা। আলোচনায় কিছু সাংকেতিক চিহ্নের দরকার হবে। তাদের মানেও সাধ্যমতো বুঝিয়ে বলা হবে। তবু কোনো কোনো পাঠক যদি এতে অসুবিধে বোধ করেন, তাঁদের প্রতি অনুরোধ যে তাঁরা যেন চিহ্নগুলো উপেক্ষা করে লেখাটার সংগে এগিয়ে চলেন।

ওপর ওপর বললে, বইটিতে পেনরোজের উদ্দেশ্য হল কৃত্রিম ধীমত্তার (Artificial Intelligence) প্রবক্তাদের এই মত খণ্ডন করা যে অনতিদূর ভবিষ্যতে (বা কখনও) সম্ভব হবে আমাদের চেতনার **প্রধান সব** কাজই কম্পিউটার দিয়ে করানো। পেনরোজ মতটির নাম দিয়েছেন "strong AI"— যার বাংলা করা যায় "জোরালো কৃত্রিম ধীমত্তা", সংক্ষেপে জো· কৃ· ধী·। তাই এখানে 'জোকৃধী' বলেই আমরা মতটির উল্লেখ করব।

জোকৃধী, কম্পিউটার ও অ্যাল্‌গরিদ্‌ম্‌

জোকৃধীবাদীদের মোদ্দা কথা এই যে ওসব চেতনা-ফেতনা ফালতু ব্যাপার (— এক

ধরনের একগুঁয়ে জড়বাদও যা ভজিয়ে থাকে !—), আসলে প্রযুক্তিগত কিছু পদক্ষেপ ঠিকঠাক নেওয়া হলে কম্পিউটারকে দিয়ে মানবচেতনার প্রধান কাজগুলো করাতে পারা অসম্ভব কিছুই নয় !

নেহাৎ মন্দ নয় এঁদের যুক্তি ! একটি লোক যখন ২ আর ২ যোগ করে বলে ৪, আর একটা কম্পিউটার যখন ঐ একই কাজ করে— এঁদের মতে উভয়েই তখন একটা বিশেষ কার্যক্রম (algorithm) অনুযায়ীই কাজটা করে। ফলে, এঁরা বোঝান, চেতনার থাকা বা না-থাকা ঐ অংকটা ঠিকভাবে করার কাজকে কোনোভাবেই প্রভাবিত করে না। কেননা, এখানে ঐ কার্যক্রমটাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ! আরেকটু তাত্ত্বিকভাবে বললে, এঁদের বক্তব্য হল প্রকৃতির মধ্যে যান্ত্রিক কার্যক্রমগুলির জটিলতার বৃদ্ধি একটা বিশেষ মাত্রা পার হলেই প্রকৃতিতে চেতনার উন্মেষ ঘটে। অর্থাৎ, চেতনার কাজগুলি শুধু যে কার্যক্রমভিত্তিক তাই নয়, বরং প্রকৃতির মধ্যে সবচেয়ে বেশি জটিলভাবে কার্যক্রম-ভিত্তিক ! আর, চেতনার মূলে ক্রিয়াশীল এই অতিজটিল কার্যক্রমগুলোকে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তে আনা তত্ত্বগতভাবে অসম্ভব কিছু নয় !

পেনরোজ এই মতবাদের বিরোধিতা করেছেন। এছাড়াও দেখিয়েছেন কীভাবে এর বিরোধিতা করেও কেউ কেউ জোকুধীবাদের (—নাকি এক ধরনের অন্ধ জড়বাদের ?—) ফাঁদ এড়াতে পারেননি। উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেছেন এমন মতের কথা যা বলে যে নিয়মনিয়ন্ত্রিত যে-কোনো কিছুকেই যেহেতু এক ধরনের কম্পিউটার হিসেবে ভাবা যায়, অতএব আমাদের মস্তিষ্ককেও ঐভাবে ভাবা যেতে পারা উচিত ! এখানে পেনরোজের বক্তব্য, কোনো কিছু নিয়মনিয়ন্ত্রিত হলেই তাকে যে কম্পিউটার হিসেবে ভাবা চলবে এমন কথা ঠিক নয়। কেন নয়, সে-কথাই বুঝিয়েছেন তিনি বইটিতে।

একটা কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে ? এককথায় বললে, আগে থেকে নির্দিষ্ট কোনো-না-কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে। এখানে 'কার্যক্রম' মানে কার্যের ক্রম— অর্থাৎ, সুবিন্যস্ত ও সুসংজ্ঞাত কিছু কাজ— যেগুলি একটার পর একটা করা হয়— কাজগুলির নির্দিষ্ট ক্রম বা বিন্যাস ঠিক রেখে। এবার প্রশ্ন : মানুষ তার চেতনার সাহায্যে যেসব 'কাজ' করে থাকে, সবসময়েই কি তাদের ভিত্তি হিসেবে কোনো কার্যক্রম থাকে ? পেনরোজ বলছেন, না ! এবং জানাচ্ছেন যে এমনকি গণিত, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রেও — এবং প্রাণহীন জড়প্রকৃতিতেও— এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ 'কাজ' আছে, যাদের গোড়ায় কোনো কার্যক্রম নেই !

ব্যাপারটা প্রথমে যত সোজা মনে হতে পারে ততই সোজা কিন্তু নয় ! এ-কথা বোঝা খুব সোজা নয় যে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত মানবচেতনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই কোনো

কার্যক্রমের বাঁধাধরা ছকের বাইরে সাধিত হয়ে থাকে! আরো শক্ত একথা বোঝা যে এমনকি গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রে-বাঁধা জগতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই কোনো কার্যক্রমের নাগালের বাইরে! তবে একটা যুক্তি-পরম্পরা হয়তো এর মধ্যেই উঠে আসছে! আমাদের চেতনার অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অ-কার্যক্রমভিত্তিক। কম্পিউটারের সব কাজই কিন্তু আবশ্যিকভাবে কার্যক্রমভিত্তিক। অতএব···

ট্যুরিং যন্ত্র

যেকোনো কার্যক্রমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা কেমন হবে? এমন একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছিল ১৯৩০-এর দশকে। 'ট্যুরিং যন্ত্র' এই গবেষণারই একটি প্রধান, এবং পেন্‌রোজের মতে প্রধানতম, ফল। অবশ্য ট্যুরিং যন্ত্র সত্যিসত্যিই কোনো যন্ত্র নয় (—কথাটা যদিও 'ট্যাশগরু গরু নয়'-গোছের শোনায়)! আসলে এটি একটি ধারণা, একটুকরো বিমূর্ত গণিত— যেটি ইংরেজ গণিতবিদ্‌ অ্যালান্‌ ট্যুরিং নির্মাণ করেন ১৯৩৫-৩৬ সাল নাগাদ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গণিতের একটি বিরাট সমস্যার সমাধান বার করা। সমস্যাটির উদ্ভাবক জার্মান্‌ গণিতবিদ্‌ ডেভিড্‌ হিল্‌বার্ট্‌ এবং হিল্‌বার্টের স্থিরীকরণ সমস্যা (Enscheidungsproblem) নামে সমস্যাটি গণিতের দুনিয়ায় বিখ্যাত।

হিল্‌বার্ট্‌ খুঁজছিলেন এমন এক সামান্য বা সার্বিক (universal) কার্যক্রম যা সাধারণভাবে গণিতের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। তিনি ভেবেছিলেন, অমন একটি কার্যক্রম তৈরী করা গেলে গণিতকে এক অলঙ্ঘ্য অবশ্যম্ভাবিতার ভিতের ওপর দাঁড় করানো যাবে। ফলে যেকোনো গাণিতিক অবধারণের (সহজ বাংলায়, জাজ্‌মেন্টের) সত্যিমিথ্যে যাচাই করা যাবে ঐ ভিত্তিভূমির সাহায্যে। আসলে হিল্‌বার্ট্‌ চেয়েছিলেন এভাবে গাণিতিক সত্যকে পদ্ধতির এক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শক্তপোক্ত কাঠামোর ওপর দাঁড় করাতে— যে কাঠামো হবে স্ববিরোধমুক্ত— এবং কোনো গাণিতিক সত্য কখনোই যার বাইরে থাকতে পারবে না। এভাবেই ট্যুরিং খুঁজেছিলেন এমন কোনো যান্ত্রিক কার্যক্রম— যা গণিতের অন্ততঃ কোনো একটি শাখার সব সমস্যাগুলোরই একের পর এক সমাধান দিয়ে যেতে পারে। অবশেষে ট্যুরিং যন্ত্রেই এরকম এক যান্ত্রিক পদ্ধতির খোঁজ পান তিনি।

কাল্পনিক এই যন্ত্রের আসল বৈশিষ্ট্য এই যে এটিকে দিয়ে বিবিধ সাংকেতিক লিপি পড়ানো ও লেখানো যায়। আবার এটিকে দিয়ে কোনো গণনাক্রিয়ার জন্য দরকারী কার্যক্রমের নির্দেশগুলোও পড়ানো যায়। কোনো গণনাক্রিয়ার সময়ে যন্ত্রটি বিভিন্ন সাংকেতিক

লিপি পড়তে থাকে— এবং কোনো কার্যক্রম অনুযায়ী ওগুলির ওপর কাজ করে চলতে থাকে— যতক্ষণ না পুরো কাজটা শেষ হয়। তারপর যন্ত্রটি থামে এবং গণনার উত্তর সংলগ্ন কোনো মাধ্যমের ওপর লিখে দেয়।

পেনরোজ দেখিয়েছেন যে ছোট ছোট পাটিগাণিতিক গণনা থেকে শুরু করে অনেক বেশি জটিল সব ক্রিয়ার জন্যেও বিশেষ বিশেষ কার্যক্রমের উপযোগী ট্যুরিং যন্ত্র তৈরী করা যায়। লক্ষ্য করুন, এখানে একটা কার্যক্রমকে একটা ট্যুরিং যন্ত্রের প্রধানতম অংগ বলে ধরা হচ্ছে! এক কথায়, যে-কোনো ক্রিয়া যার ক্ষেত্রে কার্যক্রম (algorithm) এই বিশেষ্যটি, অথবা, যান্ত্রিক (mechanical), গণনীয় (computable), পুনর্নির্দেশক (recursive), কার্যকরী (effective) প্রভৃতি বিশেষণগুলি প্রযোজ্য— সেই সমস্ত ক্রিয়াকেই কোনো বিশেষ ট্যুরিং যন্ত্রের ক্রিয়া বলে ভাবা যায়। আর, পেনরোজের মতে, যেকোনো কম্পিউটার আসলে এক ধরণের সার্বিক (universal) ট্যুরিং যন্ত্র— মানে, এমন এক ট্যুরিং যন্ত্র যাকে দিয়ে যেকোনো বিশেষ ট্যুরিং যন্ত্রের কাজ করানো যায়।

'যেকোনো ট্যুরিং যন্ত্রের কাজ করানো যায়'? কিন্তু কতগুলো ট্যুরিং যন্ত্র তৈরী করতে পারি আমরা? তালিকাটা যে মস্ত লম্বা হবে তা বোঝা সহজ। মজা এই যে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে তালিকাটা বানাতে গেলে দেখা যায় যে বিশাল-সংখ্যক এই ট্যুরিং যন্ত্রগুলোর অধিকাংশই নিতান্ত 'অকেজো'! অকেজো এ-অর্থে যে ঐসব ট্যুরিং যন্ত্রগুলি হয় কখনো না থেমে অনর্থক কাজ করে যেতে থাকে, নইলে কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ আটকে পড়ে!

তালিকাটা ঐ অকেজো যন্ত্রগুলোকে বাদ দিয়ে বানানো যায় না? একটু ঘুরিয়ে বললে, প্রশ্ন হল এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি না যার সাহায্যে আগে থেকেই বলা যাবে কোনো একটি ট্যুরিং যন্ত্র থামবে, না থামবে না। পেনরোজ প্রশ্নটির নাম দিয়েছেন 'ট্যুরিং যন্ত্রের সমাপন-সমস্যা'। আর, তাঁর মতে, অমন কোনো কার্যক্রম থাকতে পারে না!

সমাপন-সমস্যা ও হিলবার্ট-সমস্যা

আমরা জানলাম যে যেকোনো কার্যক্রমকেই কোনো ট্যুরিং যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। উল্টোভাবে, যেকোনো ট্যুরিং যন্ত্রকে কার্যক্রম বলে ভাবা যেতে পারে। তাই ট্যুরিং যন্ত্রের সমাপন-সমস্যাকে কার্যক্রমের সমাপন-সমস্যা হিসেবেও ভাবা

যায়। ফলে, সহজেই বোঝা যায় যে সমস্যাটির সমাধান সমস্ত গাণিতিক সমস্যার কার্যক্রমভিত্তিক সমাধানযোগ্যতার প্রশ্নের সংগে— অর্থাৎ হিল্‌বার্টের স্থিরীকরণসমস্যার সংগে— খুব সরাসরি জড়িত। তাই সমস্যাটির আলোচনায় 'ট্যুরিং যন্ত্র' শব্দটার বদলে আমরা 'কার্যক্রম' শব্দটাই ব্যবহার করব। আর, ট্যুরিং যন্ত্রের ঐ তালিকাকে আমরা ভাবব কার্যক্রমের তালিকা হিসেবে।

এবার কিছু প্রতীক কাজে লাগবে আমাদের। যেমন, কার্যক্রমগুলোকে আমরা বোঝাব **কাজ, কাঁচাকাজ, পাকাকাজ** প্রভৃতি নাম দিয়ে। ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে বোঝানো হবে বিভিন্ন সংখ্যা। আমাদের তালিকার 'ক'-তম কার্যক্রমটিকে বোঝানো হবে **কাজ** [(ক)···] প্রতীকটি দিয়ে। অর্থাৎ, এখানে 'ক'-এর জায়গায় ১ বসালে প্রতীকটা বোঝাবে আমাদের তালিকার প্রথম কার্যক্রম, ২ বসালে দ্বিতীয় কার্যক্রম ইত্যাদি।

বেশ! এবার ধরুন, ক-তম কার্যক্রম কোনো বাস্তব সংখ্যা 'স'-এর ওপর ক্রিয়া করে যে ফলটা দেয় সেটা আরেকটা বাস্তব সংখ্যা 'ফ'। এই লম্বা বাক্যটা আমরা বোঝাব স্রেফ এইভাবে :

কাজ [(ক) স] = ফ

মনে রাখবেন, এখানে 'স'-এর জায়গায় 'ক' বসালে পাওয়া যেতো 'ক'-সংখ্যাটির ওপরই ক-তম কার্যক্রমের ক্রিয়ার ফল। কিন্তু ক-তম কার্যক্রম যদি 'অকেজো' হয়? তখন অবশ্যই কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না! তখন আমরা লিখব :

কাজ [(ক)···] = ?

প্রশ্নচিহ্নটা এখানে বোঝাবে যে ক-তম কার্যক্রমের কোনো উত্তর নেই। আর সবশেষে, প্রতীকটার চৌকো ব্র্যাকেটের (বা বন্ধনীর) ভেতর ঐ গোল ব্র্যাকেট্‌টা না থাকলে বুঝতে হবে আমাদের তালিকায় কার্যক্রমটার ক্রমিক সংখ্যাটা নিয়ে আমরা ভাবছি না। যেমন ধরুন, **পাকাকাজ** [স] বোঝাবে 'স'-এর ওপর ঐ কার্যক্রমের ক্রিয়ার ফল, কার্যক্রমটার ক্রমিক সংখ্যা যাই হোক না কেন।

এবার ফেরা যাক সমাপন-সমস্যায়। এখানে প্রশ্ন হল এমন কোনো কার্যক্রম আছে কি না যা ঠিকঠিক বলতে পারবে কোনো একটা কার্যক্রম অকেজো কি না। ধরুন, অমন একটি কার্যক্রম সত্যিই আছে। ধরা যাক সেটির নাম **কাঁচাকাজ**। (নামকরণের

সার্থকতাটা এখুনি বোঝা যাবে !) ধরা যাক, আমাদের 'ক'-তম কার্যক্রম যদি অকেজো হয় তাহলে 'ক'-এর ওপর কাজ করে কাঁচাকাজ উত্তর দেয় ০, আর, অন্যথা, উত্তর দেয় ১। সংক্ষেপে :

কাঁচাকাজ [ক]=০, যখন কাজ [(ক)···]= ?
এবং কাঁচাকাজ [ক]=১, অন্যথা।

ভালো কথা ! কিন্তু পেনরোজের অনুসরণে এবার আমরা আরেকটি কার্যক্রম গল্পটার ভেতর নিয়ে আসব। এটির নাম হবে পাকাকাজ, আর সংজ্ঞাটা হবে এরকম :

পাকাকাজ [ক]=কাজ [(ক) ক]×কাঁচাকাজ [ক]

পরিষ্কার বাংলায় বললে, 'ক'-এর ওপর পাকাকাজ-এর ক্রিয়ার ফল হল 'ক'-এর ওপর "যথাক্রমে" কাঁচাকাজ ও কাজ [(ক)···]-এর ক্রিয়ার ফল দুটির গুণফল। স্পষ্টতঃই এ একটা কার্যক্রম। আর তাই, 'ক'-এর ওপর এর ক্রিয়ার ফলের সংগে ১ যোগ করলেও আমরা পাব কোনো একটা কার্যক্রমের ফল ! ধরা যাক সেটা হল 'ক'-এর ওপর আমাদের তালিকার খ-তম কার্যক্রমের ক্রিয়ার ফল। সাংকেতিক ভাষায় :

কাজ [(খ) ক] = ১+পাকাকাজ [ক]

এখানে 'ক'-এর জায়গায় 'খ' বসালে নিয়ম অনুযায়ী আমাদের পাওয়া উচিত 'খ'-এর ওপর খ-তম কার্যক্রমেরই ক্রিয়ার ফল।

কিন্তু গল্পটা জমে ওঠে এখানেই ! যদি আমরা ধরে নিই যে খ-তম কার্যক্রম অকেজো নয়, তাহলে 'ক'-এর জায়গায় 'খ' বসালে পাই :

কাজ [(খ) খ] = ১+কাজ [(খ) খ]

যা অসম্ভব ! তাহলে ধরা যাক কার্যক্রমটা অকেজো। সেক্ষেত্রে 'ক'-এর জায়গায় 'খ' বসালে আমরা পাব :

? = ১+০

যা কিছু কম অসম্ভব নয় !

দেখা যাচ্ছে যে সমাপন-সমস্যার ঈপ্সিত কার্যক্রমের অস্তিত্ব ধরে নিলে আমরা এমন কিছু ফলের সম্মুখীন হই যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। এর মানে অবশ্যই এই যে ঐ কার্যক্রমের অস্তিত্ব অসম্ভব! অর্থাৎ সাধারণভাবে কখনোই কোনো কার্যক্রমের সাহায্যে স্থির করা সম্ভব নয় কোনো গাণিতিক কার্যক্রম আদৌ কার্যকরী হবে কি না। এভাবেই বোঝা যায় যে হিল্‌বার্টের স্বপ্নের সার্বিক অ্যাল্‌গরিদ্‌ম্‌ আসলে একটি আকাশকুসুম!

গ্যোয়েডেল্‌ উপপাদ্য এবং...

হিল্‌বার্টের স্থিরীকরণসমস্যার ওপর সবচেয়ে বিধ্বংসী আঘাতটি হানেন অস্ট্রিয় গণিতবিদ্‌ কুর্ট্‌ গ্যোয়েডেল্‌ তাঁর একটি উপপাদ্যের মাধ্যমে। আমাদের আলোচনার মূল বিষয়ের দিক থেকেও সুদূরপ্রসারী এই উপপাদ্যের তাৎপর্য।

হিল্‌বার্ট্‌ আসলে চেয়েছিলেন এমন একটি সম্পূর্ণ ও স্ববিরোধমুক্ত আকারাত্মক (formal) গাণিতিক ব্যবস্থা বা সিস্টেম্‌ গড়ে তুলতে যা গণিতের যেকোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রের (যেমন ধরুন, পাটিগণিতের) সমস্ত সত্যগুলিকেই ধারণ করবে। গ্যোয়েডেল্‌ উপপাদ্য ঠিক উল্টো কথা বলে! ১৯৩১ সালে মাত্র পঁচিশ বছরের তরুণ গ্যোয়েডেল্‌ এই উপপাদ্যটিতে প্রমাণ করেন যে, কোনো আকারাত্মক ব্যবস্থা বা সিস্টেম্‌ই সম্পূর্ণ হতে পারে না—এই অর্থে যে সিস্টেম্‌টির পরিধিভুক্ত সবকটি বাক্যের সত্যিমিথ্যে কখনোই সিস্টেম্‌টির অন্যান্য বাক্যগুলোর সাহায্যে পুরোপুরি নির্ণয় করা যায় না! অর্থাৎ কিছু বাক্য থেকেই যায় যেগুলির সত্যতা সিস্টেম্‌টির দ্বারা নির্ণেয় নয়। এই ধরনের বাক্যগুলিকে আমরা বলব গ্যোয়েডেল্‌ বচন। এককথায়, গ্যোয়েডেল্‌ প্রমাণ করেন যে যেকোনো আকারাত্মক গাণিতিক ব্যবস্থাতেই অন্তত একটি গ্যোয়েডেল্‌ বচন থাকবে। পেন্‌রোজের অনুসরণে আমরা এবার সাধারণ বীজগণিতের ক্ষেত্রেই উপপাদ্যটির আলোচনা করব। তবে তার আগে আর একটু প্রস্তুতির দরকার হবে আমাদের।

একটি আকারাত্মক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামুটি এরকম। প্রথমতঃ, ব্যবস্থাটিতে কিছু সুসংজ্ঞাত অক্ষর, রাশি, ক্রিয়াসূচক ও অন্যান্য সাংকেতিক চিহ্ন প্রভৃতির একটি নির্দিষ্ট বর্ণমালা থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবস্থাটিতে থাকতে হবে কিছু স্বতঃসিদ্ধ এবং কিছু প্রাথমিক সূত্র ও নিয়মাবলী। তৃতীয়তঃ, ব্যবস্থাটিতে থাকবে কিছু বচন ও উপপাদ্য—যেগুলি স্বতসিদ্ধ ও সূত্রগুলি থেকে সত্য অনুমান হিসেবে প্রমাণযোগ্য হবে। লক্ষ্য করুন যে এখানে একটি বচনের সত্যতা বলতে তার এই প্রমাণযোগ্যতাকেই ধরা হয়।

এখানেও কিছু প্রতীক ব্যবহার করব আমরা। যেমন, স্বরবর্ণ দিয়ে আমরা বোঝাব

বচনগুলোকে, আর ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে বিভিন্ন সংখ্যাকে। কোনো বচনের সংজ্ঞা বিস্তারিতভাবে লেখার সময় আমরা লিখব এইভাবে : অ → "..."। এখানে সংজ্ঞাটি লেখা হবে তীর চিহ্নটির ডানদিকে, উদ্ধরণ চিহ্নের ভেতর। অনেক সময় একটি বচন এক বা একাধিক রাশির মানের ওপর নির্ভর করে। যেমন, এই বচনটি :

অ → "ক+খ=ফ"

এখানে 'ফ'-এর মান ০ হলে আমরা বুঝব 'ক' ও 'খ'-এর যোগফল ০ ; আবার ফ=৫ হলে বুঝব যোগফলটা হল ৫, ইত্যাদি। অর্থাৎ এখানে 'অ'-বচনটি 'ফ'-এর মানের ওপর নির্ভর করে, বা, পরিভাষায় বললে, ফ-এর অপেক্ষক। এটা বোঝানো হবে অ (ফ) প্রতীকটির সাহায্যে। সবশেষে, ট্যুরিং যন্ত্রের গল্পের ঐ তালিকাটার মতো এখানেও দরকার হবে প্রাসংগিক আকারাত্মক ব্যবস্থাটির সবকটি বচনের একটা কাজ-চলা তালিকার ধারণা। এরকম একটা তালিকার কথা মনে রেখে আমরা অ (ফ) ল প্রতীকটি দিয়ে বোঝাব আমাদের ব্যবস্থার ল-তম বচনটিকে, যেটি কিনা ফ-এর অপেক্ষক।

ব্যস্ ! আমাদের প্রস্তুতির এখানেই ইতি ! এবার সরাসরি উপপাদ্যটির ভেতরে যাওয়া যেতে পারে।

লক্ষ্য করুন এই বচনটি : "অ (র) র বচনটি প্রমাণহীন"। বচনটিতে বলা হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেমের র-তম বচনটি— যেটি আবার 'র'-এর অপেক্ষক— এমন একটি বচন যার কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্যই এটি একটি যথার্থ বচন। মানে, আকারাত্মক ভাবে, গঠনরীতির দিক থেকে। (পেনরোজ দেখিয়েছেন, গাণিতিকভাবে গ্রাহ্য এরকম অনেক বচন তৈরী করা যায়।) ধরা যাক এটি আমাদের ব্যবস্থাটির ব-তম বচন। আবার বচনটি র-এর অপেক্ষকও বটে। তাই আমরা লিখতে পারি :

অ (র) ব → "অ (র) র বচনটি প্রমাণহীন"

যেহেতু বচনটি 'র'-এর অপেক্ষক অতএব এখানে 'র'-এর জায়গায় 'ব' বসালেও একটি যথার্থ বচন পাওয়া যাবে। তখন আমরা পাবো :

অ (ব) ব → "অ (ব) ব বচনটি প্রমাণহীন"

আলোচনার সুবিধের জন্যে আমরা এই শেষ বচনটির নাম দিলাম ঐ। মজাটা এই ঐ

বচনটি নিয়েই ! সেটা ধরা পড়বে যদি আমরা ঐ বচনটির সত্যতা আমাদের ব্যবস্থাটির অন্যান্য বচনের সাহায্যে নির্ণয় করতে চেষ্টা করি !

ধরা যাক ঐ বচনটি সত্য। অতএব আমাদের ব্যবস্থাটির কোনো-না-কোনো বচনগুচ্ছ ঐ বচনটিকে সত্য বলে প্রমাণ করবে। কিন্তু বচনটির সংজ্ঞাতেই বলা হচ্ছে যে তেমন কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং বচনটি আসলে অসত্য ! (আমাদের 'স্ববিরোধহীন' ব্যবস্থা তাহলে অন্তত একটি অসত্য বচনকে সত্য বলে প্রমাণ করে !) কিন্তু তা তো মেনে নেওয়া যায় না ! বরং, ধরা যাক ঐ অসত্য। তাহলে বচনটির অস্বীকৃতি অবশ্যই সত্য। অর্থাৎ, "ঐ বচনটি প্রমাণহীন" একথা সত্য হতে পারে না। অতএব বচনটির অবশ্যই কোনো প্রমাণ আছে। অতএব ঐ আসলে সত্য ! আবার গণ্ডগোল ! এই গোলমেলে স্ববিরোধ থেকে বোঝা যায় যে আগাদের পূর্বানুমানটিই ভুল। অর্থাৎ ঐ বচনটির সত্যতা আমাদের ব্যবস্থাটির দ্বারা নির্ণেয় নয়। এভাবেই মোটামুটি প্রমাণিত হয় গ্যোয়েডেলের উপপাদ্যটি।

লক্ষ্য করুন, এখানে এই ঐ বচনটি হল একটি গ্যোয়েডেল্ বচন— যার কথা আমরা একটু আগেই বলেছি। গ্যোয়েডেলের মতে, যতো নিখুঁতভাবেই একটি আকারাত্মক গাণিতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হোক না কেন, সর্বদাই ব্যবস্থাটির মধ্যে অন্ততঃ একটি গ্যোয়েডেল্ বচন থাকবে। যেমন, ঐ বচনটিকে আমাদের ব্যবস্থাটির স্বতঃসিদ্ধগুলির সংগে জুড়ে দিয়ে আমরা যদি নতুন একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, তাহলে সেই নতুন ব্যবস্থাটিতেও অন্ততঃ একটি গ্যোয়েডেল্ বচন পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ একটি আকারাত্মক ব্যবস্থার তত্ত্বগতভাবে (এবং গণনীয়ভাবে) অসীমসংখ্যক পুনর্নির্মাণের পরেও আমরা দেখা পেতে থাকব এই গ্যোয়েডেল্ বচনগুলির। ফলে, গ্যোয়েডেলের উপপাদ্যটির যাথার্থ্য সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পারি।

... এবং যুক্তিবিদ্যার স্বপ্নভঙ্গ

'সত্যতা' আর 'প্রমাণ্যতা'— এই দুটিকে সমার্থক না ভাবলে কিন্তু কোনো স্ববিরোধের মধ্যে পড়তে হয় না আমাদের। গ্যোয়েডেল্ উপপাদ্যের গল্পটা নিয়ে একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে এই ঐ বচনটি সত্য। যদিও তার প্রমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাটিতে নেই। কিন্তু বচনটিতেও ঠিক এ-কথাই বলা হচ্ছে। তাই এখানে কোনো স্ববিরোধ নেই। এভাবে বোঝা যায় যে গাণিতিকভাবে সত্য একটি বচনও কোনো কার্যক্রমের নাগালের বাইরে থাকতে পারে। গণিতের এমন অনেক প্রশ্ন নিয়ে পেন্‌রোজ আলোচনা করেছেন যাদের উত্তর কোনো কার্যক্রমের নাগালের বাইরে। ঐ আলোচনায় আমরা আর যাচ্ছি না।

এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে পেন্‌রোজের মতে গণিতের "খুব সংকীর্ণ ও সীমিত" একটা অংশই কার্যক্রমদের দখলে রয়েছে !

অতএব আকারাত্মক গণিতের (এবং তুলনীয় মতবাদগুলির) প্রবক্তাদের দেওয়া সত্যের সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ । আর, সত্যের অন্বেষণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক অ্যাল্‌গরিদ্‌ম্‌ নয়, কোনো সিস্টেমের বাঁধাধরা ছকের অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং সমস্যাবিশেষের তাৎপর্যের অনুধাবনই বেশি জরুরী সহায়ক । এই অনুধাবনের জন্যে দরকার অন্তর্দৃষ্টির । কিন্তু, পেন্‌রোজ দেখিয়েছেন, কোনো অ্যাল্‌গরিদ্‌মের পক্ষেই সম্ভব নয় এই অন্তর্দৃষ্টির নাগাল পাওয়া !

উঠে আসে আরও একটা কথা। আমাদের মধ্যে যারা কোনো তাত্ত্বিক ব্যবস্থার ধ্রুব সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী, অথবা মনে করি যে আমাদের সমর্থন পাওয়া অমন কোনো একটি ব্যবস্থা সব সময়েই এমনভাবে সত্যের পথনির্দেশ দিয়ে যেতে থাকবে যে কখনোই সত্যের কোনো অংশ ব্যবস্থাটির গন্ডীর বাইরে থাকতে পারবে না— তাদের কাছে গ্যোয়েডেলের উপপাদ্যটি নিয়ে আসে তাদের ধারণা আমূল পাল্টানোর জন্যে এক জোরালো আহ্বান। একথাটা অন্ততঃ সোজা যে গণিত বা যুক্তিতত্ত্বের জায়গাটা জীবনের অন্যান্য অনেক জায়গার তুলনায় অনেক বেশি সংহত। সত্যের অন্বেষণ এখানেই যদি গ্যোয়েডেল্‌-বর্ণিত সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে, তাহলে অবশ্যই অন্যান্য জায়গায় (— তথাকথিত 'সমাজ-বিজ্ঞান', নীতিশাস্ত্র, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতির জায়গায়—) ঐ অন্বেষণকে অনেক বেশি ঝামেলা পোয়াতে হবে !

পেন্‌রোজের মতে গাণিতিক সত্য— এবং সাধারণভাবে সত্য— এক অর্থে দেশ-কালাতীত। একজন সক্রিয় বৈজ্ঞানিক ও গণিতবিদ্‌ হিসেবে তিনি মনে করেন যে মানুষের যাবতীয় চিন্তা ও এষণা যেন কোনো এক "চরম, বহিঃস্থ ও শাশ্বত" সত্যের দিকে "চালিত হয়ে চলেছে"— যে সত্য শুধু মানবনিরপেক্ষই নয়, বরং স্বয়ম্ভূ। আমাদের চেতনা কখনো কখনো পারে সত্যের এই উৎসের সংগে যোগাযোগস্থাপন করতে। আর, তখনই খুলে যায় আমাদের অন্তর্দৃষ্টি— যা আমাদের চেতনাকে দেখিয়ে দেয় সত্যের নতুন কোনো অংশ। সংগীত, ভাস্কর্য, চিত্র, কাব্য এসবের মহৎ শিল্পকর্মেও কালাতীত এক সত্যের খোঁজ পেয়েছেন পেন্‌রোজ ! সত্যের এই ধারণাকে গ্রীক মনীষী প্লাতো-র মত বলে বর্ণনা করেছেন তিনি। তবে বর্তমান প্রতিবেদকের মনে হয়েছে যে সাম্প্রতিক ও প্রাচীন আরো অনেক ভাবুকের ভাবনার আদল আসে এখানে। জিড্ডু কৃষ্ণমূর্তির কথাই ধরুন !

যাই হোক, কোনো কম্পিউটারের পক্ষেই কিন্তু এভাবে সত্যের 'আবিষ্কার' সম্ভব নয়।

কারণ কম্পিউটারের কাজ সব সময়েই বন্দী কোনো কার্যক্রমের খাঁচায়। প্রশ্ন হল : কালবন্ধ হয়েও চেতনা কীভাবে পারে কালাতীত এই সত্যগুলিকে ছুঁতে? পেনরোজ এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন পদার্থবিজ্ঞানে।

পদার্থ, চেতনা ও এক অজানা যোগসূত্র

বর্তমান প্রতিবেদক অবশ্য বিজ্ঞানে অশিক্ষিত। তাই বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রসংগে শুধু পেনরোজের মতকেই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে চেষ্টা করা হয়েছে মূল আলোচনার জন্যে জরুরী বিষয়গুলি অল্প কথায় বলার।

একটু আগেই বলা কথাটার খেই ধরে প্রথমেই বলা যায় যে পদার্থবিজ্ঞান এ তাবৎ মহাবিশ্বের যে গাণিতিক কাঠামোর খোঁজ পেয়েছে—তার সব সত্যই ঐ দেশকালাতীত প্লাতো-বিশ্বের অধিবাসী! উল্টো দিক থেকে হয়তো এ-ও ভাবা যায় যে প্লাতো-বিশ্বের সত্যগুলি সত্তারূপ পায় আমাদের এই অস্তিত্বশীল মহাবিশ্বে। আর গাণিতিক সত্যের পরিধির বেশির ভাগটাই কার্যক্রমের নাগালের বাইরে থাকায় জড়প্রকৃতিতেও অ-কার্যক্রম-ভিত্তিক বা অ-গণনীয় কিছু উপাদানের সম্ভাবনা দেখা দেয়। পেনরোজের মতে, মহাবিশ্বে চেতনার অস্তিত্বের সংগে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো এই সম্ভাবনাটি। কারণ, তাঁর মতে, চেতনা নিজেই এক ধরনের অগণনীয় সত্তা—যা নিজে দেশকালবন্ধ হয়েও দেশকালের বাইরের ঐ সত্যগুলিকে জানতে পারে। পেনরোজ চেতনাকে জড়বিশ্ব ও ঐ সত্যলোকের মধ্যে যোগাযোগের সেতু হিসেবে বর্ণনা করেন। আর, চেতনার মধ্যে দেশকালাতীত কিছু উপাদানের সম্ভাবনাটাও ধরা পড়ে এই ভাবনায়।

এখন, পদার্থবিজ্ঞান মহাবিশ্ব সম্পর্কে এ-অবধি যা-কিছু সত্যের খোঁজ দিয়েছে তাদের মধ্যে চেতনা বিস্ময়করভাবে অনুপস্থিত। কেন? সম্ভবতঃ এ-কারণে যে জড়বিশ্বে চেতনার মতো একই সংগে দেশকালবন্ধ ও দেশকালাতীত কোনো সত্তার উপস্থিতির জন্যে দেশ-কালের যে ধারণার দরকার তার খোঁজ এখনো মেলেনি! বিশেষ করে ঝামেলা হয়েছে এই কাল বা সময়ের রহস্যটা নিয়ে। সচেতন অভিজ্ঞতায় আমরা সময়কে এক ধরনের অ-বিপরীতায়নীয় (ir-reversible) প্রবাহ হিসেবে দেখি। অথচ, আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরেকার ব্রহ্মাণ্ডবিজ্ঞানে মহাবিশ্বে অমন কোনো সময়-প্রবাহের সামগ্রিক অস্তিত্ব মানা হয় না! তাছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের বেশির ভাগ গাণিতিক সূত্রের মধ্যেই এক ধরনের সময়-প্রতিসাম্য (time symmetry) দেখা যায়। তাপ-গতিবিদ্যায় অবশ্য প্রকৃতির সময় অ-প্রতিসাম্যের এক ধরনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাতে কিছুটা বোঝা যায় কেন আমরা বাচ্চা থেকে বুড়ো হই, এবং উল্টোটা কখনোই হই না; অথবা, কেন কাঁচের গেলাস পড়ে

ভেঙে যায়, এবং কখনোই ভাঙা গেলাস নিজে থেকে আবার জুড়ে যায় না। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দরকার হয় এই ব্যাখ্যাটারও একটা ব্যাখ্যা। এদিকে মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ধ্বংসের ঐকান্তিক (singular) দশাগুলির তুলনামূলক আলোচনায় আবার এই সময়-অ-প্রতিসাম্যের ব্যাপারটা অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। যাতে বোঝা যায় যে একটি দশা 'আদিম' ও অপরটি 'অন্তিম'! কিন্তু এই ঐকান্তিক দশাগুলোয় পুরো দেশ-কালই হারায় তার অস্তিত্ব! ফলে নতুন কোনো তত্ত্বের কথা ভাবতেই হয়—যে তত্ত্ব দেশকালের এমন ধারণা নিয়ে আসবে যাতে সময়ের এই রহস্যের ব্যাখ্যাটা পাওয়া যায়। পেনরোজ এখনো না-পাওয়া এই তত্ত্বটির নাম দিয়েছেন 'Correct Quantum Gravity Theory'— যাকে বাংলায় বলা যায় 'যথার্থ তন্মাত্র মহাকর্ষ তত্ত্ব', সংক্ষেপে 'যতমত'।

পেনরোজের অনুমান, নতুন এই তত্ত্ব সময়ের সমস্যার সংগে আরো কিছু মৌলিক সমস্যার সমাধান দিতে পারবে—আর এই সমাধানগুলি থেকেই পাওয়া যাবে চেতনার রহস্যের কিছু প্রাথমিক ব্যাখ্যা। তাঁর মতে এই সমাধানগুলি প্রধানতঃ উঠে আসবে অধিপারমাণবিক পদার্থের তত্ত্ব বা তন্মাত্র তত্ত্বের (Quantum Theory) কিছু মৌলিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে। (এখানে 'তন্মাত্র' শব্দটি ঠিক কণাদপ্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এখানে 'তন্মাত্র' মানে 'তৎ মাত্র'— যেখানে 'মাত্র' শব্দটিতে পদার্থের **অধিপারমাণবিক** অবস্থার অতিক্ষুদ্রতাকে বোঝানো হয়েছে। প্রসংগতঃ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু একবার 'কোয়ান্টাম্ থিওরি'-র বাংলা করেছিলেন 'মাত্রাবাদ'!)

এদিকে তন্মাত্র তত্ত্বের নিজের ঘরেই ঝামেলা কম নয়! এই তত্ত্বে পদার্থের তান্মাত্রিক সত্তাকে মূলতঃ দু-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একটি ব্যাখ্যায় এই সত্তা এক ধরনের তরঙ্গের মতো, আর অপর ব্যাখ্যাটিতে কিছু ছাড়া-ছাড়া তান্মাত্রিক কণার মতো। প্রথম ব্যাখ্যাটার পদ্ধতিটিকে বলা যাক তরংগ-বাচক বা ত পদ্ধতি, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা যাক কণা-বাচক বা ক পদ্ধতি। যাইহোক, পদার্থের এই দুরকম ব্যবহারের ব্যাপারটা সত্যিই অস্বস্তিকর। পেনরোজের মতে, যতমত-ই পারবে অস্বস্তিটা কাটাতে। তখন এই পদ্ধতি দুটি মিলিত হবে নতুন একটা পদ্ধতির ভেতর।

খুব সংক্ষেপে ও সহজ করে বললে, ত পদ্ধতিতে আমরা পাই কোনো তন্মাত্রকণার সম্পূর্ণ গতিবৃত্তির, অর্থাৎ তার বিবিধ অবস্থান ও ভরবেগসমূহের বিবর্তনের, একটা সারাংশধর্মী ছবি— যাতে এই বিবিধ সম্ভাব্য অবস্থানের (বা ভরবেগের) প্রতিটিকে অন্যান্য সম্ভাব্য অবস্থানগুলির (বা ভরবেগগুলির) সংগে এক ধরনের উপর্যুপরি-অবস্থানের (superposition) মধ্যে বিধৃত হিসেবে ভাবা যায়। এখন,

যখনই অমন একটি কণার অবস্থান বা ভরবেগ জানার জন্যে কণাটির ওপর কোনো পর্যবেক্ষণ করা হয়— তখনই নায়কের ভূমিকা নেয় ক পদ্ধতিটি ! তখন দেখা যায় যে কণাটি তার বিবিধ সম্ভাব্য অবস্থানের (বা ভরবেগের) যে-কোনো একটিতে বিদ্যমান ! মজা এই যে, কোন্ বিশেষ অবস্থানটি (বা ভরবেগটি) এভাবে নির্বাচিত হয়, সেটা কিন্তু গণনা করে বার করা সম্ভব নয় ! আর, কখনোই নিখুঁতভাবে কণাটির অবস্থান ও ভরবেগ দুটিকেই একই সংগে জানা সম্ভব নয় ! আরো মজার এই যে এমনকি ক পদ্ধতিটি নিজেই ভ পদ্ধতিটি থেকে গণনীয়ভাবে নির্ণেয় নয় । আর এখানেই পেন্‌রোজ খুঁজে পান জড় প্রকৃতির মধ্যে অ-গণনীয়তার কিছু দৃষ্টান্ত ! আমরা আগেই দেখেছি যে চেতনা নিয়ে আলোচনায় এসব দৃষ্টান্ত কাজে লাগাতে চান তিনি ।

এছাড়াও, কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে পদার্থের তান্মাত্রিক ব্যবহার কল্পনাতীত-ভাবে বিস্ময়কর ! যেমন, কোনো তন্মাত্র-কণাকে (যেমন একটি ফোটন বা আলোক-কণাকে—) দেখা গেছে **একই সময়ে** দুটি জায়গায় উপস্থিত থাকতে— যে দুটি জায়গার ব্যবধানের একক মিলিমিটারের কয়েক শতাংশের মতো খুব কমও হতে পারে, আবার আলোকবর্ষের মতো ভয়াবহরকমের বিশালও হতে পারে ! (মনে রাখবেন, প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,২৮২ মাইল গতিবেগ নিয়ে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব পেরোতে পারে— সেই ছোট্ট (!) দূরত্বটাকেই বলা হয় এক আলোকবর্ষ !) আবার, জানা গেছে, **একই সময়ে** একটি তন্মাত্র কণার ওপর পর্যবেক্ষণের ফলে প্রভাবিত হতে পারে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের আরেকটি বিশেষ তন্মাত্র কণার ব্যবহার । এ অর্থে যে প্রথমটির ওপর পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিটা পাল্টে আবার পর্যবেক্ষণ করা হলে যদি তার ব্যবহারে কিছু হেরফের দেখা যায়, তাহলে দ্বিতীয়টির ব্যবহারও তৎক্ষণাৎ অনুরূপভাবে পাল্টে যায়— কণাদুটির মধ্যে কোনো বাহ্যিক তথ্য লেনদেনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে ! ব্যাপারটি আইন্‌শ্‌টাইন্‌-পদোল্‌স্কি-রোজেন্‌-এর ধাঁধাঁ বা ই. পি আর. ধাঁধাঁ (E. P. R. Paradox) নামে বিখ্যাত । আর এই ধাঁধাঁটি থেকে ধরা পড়ে অন্ততঃ তান্মাত্রিক অবস্থায় পদার্থের এক অস্থানিক নিয়ন্ত্রিতার (non-local determinacy) কথা । এই ব্যাপারটাকেও চেতনা-সংক্রান্ত আলোচনায় দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন পেন্‌রোজ !

তন্মাত্র তত্ত্বের এই ভূতুড়ে (!) ঘটনাগুলো আমরা যে বৃহৎ বস্তুর বেলায় (—যেমন, ক্রিকেট বল বা হাতি বা মানবদেহের বেলায়—) দেখতে পাই না— এটাও অবশ্যই বিরাট এক রহস্য ! পেন্‌রোজের মতে, এই রহস্যেরও সমাধান দেবে **মতমত**— যা থেকে পাওয়া যাবে পদার্থ বিজ্ঞানের এই বড়ো-র তত্ত্ব আর ছোট-র তত্ত্বের মিলনের এখনো না-পাওয়া পথটা । যাইহোক, ওপরের এই ভূতুড়ে উদাহরণগুলোতেও লুকিয়ে

রয়েছে "একই সময়ে" কথাটি। সময়ের সমস্যাটাই এভাবে ফিরে আসছে আবার। পেনরোজ দেখিয়েছেন যে তন্মাত্র তত্ত্বের ক পদ্ধতিতেও এক ধরনের সময় অ-প্রতিসাম্যের খোঁজ মিলেছে। যতন্তমত্ত অবশ্যই এরও একটা ব্যাখ্যা দেবে। আর চেতনা কেন সময়কে সাধারণতঃ একমুখী প্রবাহ হিসেবে দ্যাখে, হয়তো তারও একটা হদিশ মিলবে এখানেই!

মস্তিষ্ক, কম্পিউটার ও চেতনার তন্মাত্র তত্ত্ব

জোরুধীবাদী ও তুলনীয় ভাবুকদের মতে আমাদের মস্তিষ্ক অতিজটিল এক প্রাকৃতিক কম্পিউটার! মস্তিষ্কের শরীরতাত্ত্বিক বিবরণ থেকে কথাটা অবশ্য খাঁটি বলেই মনে হয়। কিন্তু পেনরোজ এখানেও খুঁজে পেয়েছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ অ-কার্যক্রমভিত্তিক ক্রিয়া!

স্নায়ুকোষদের (neurons) গল্পটা এখানে একটু বলতে হবে। এদের সাহায্যেই মস্তিষ্ক চালায় তার যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ। প্রতিটি স্নায়ুকোষের কেন্দ্রের সংগে জোড়া থাকে অনেকগুলো কেন্দ্রমুখী বা অন্তর্গ স্নায়ুতন্তু, আর অনেকগুলো কেন্দ্রবিমুখী বা বহির্গ স্নায়ুতন্তু। প্রতিটি বহির্গ তন্তুর শেষাংশ আবার অন্যান্য স্নায়ুকোষের কেন্দ্র বা অন্তর্গ তন্তুদের প্রায় ছুঁয়ে থাকে— 'প্রায়' মানে, এক মিলিমিটারের চল্লিশ সহস্রাংশের মতো ফাঁক রেখে! অতিসূক্ষ্ম এই ফাঁকগুলিতেই ঘটে স্নায়ুকোষ থেকে স্নায়ুকোষে মস্তিষ্কের যাবতীয় খবর দেয়া-নেয়া। ফাঁকটা বাড়লে বা কমলে বন্ধ হয় এই যোগাযোগ। আর, খবর দেয়া-নেয়ার কাজটা চলে এক ধরনের তড়িৎ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াকে আবার বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে বহির্গ তন্তুদের শেষাংশ থেকে নিঃসৃত কিছু বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ, যাদের বলা হয় স্নায়ব-প্রেরক (neuro-transmitter)। উত্তেজক স্নায়ব-প্রেরক উদ্দিষ্ট স্নায়ুকোষকে উত্তেজিত করে, প্রশমক স্নায়ব-প্রেরক প্রশমিত করে ইত্যাদি।···

দেখা গেছে যে বহির্গ তন্তুগুলো অনেক সময়ে অন্তর্গ তন্তুদের গায়ে গজিয়ে ওঠা কিছু অতিসূক্ষ্ম কাঁটা বা শোঁয়ার (spines) সংগে যোগাযোগ স্থাপন করে (—অবশ্যই, ঐ সঠিক ফাঁকটা বজায় রেখে)! এই শোঁয়াগুলো ভারি মজার! প্রথম কথা, এরা হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠে! আবার হঠাৎ হঠাৎ লম্বায় বেড়ে যায় বা কমে যায়! আর এর ফলে, মস্তিষ্কের ভেতরে আন্তর্কোষ যোগাযোগের গোটা ব্যবস্থাটাই হঠাৎ হঠাৎ পাল্টে যায়! অবশ্যই, এভাবে নিজে থেকেই 'পাল্টে যাওয়া' যে-কোনো কম্পিউটারের পক্ষেই অসম্ভব! এদিকে, ব্যাপারটা কিন্তু প্রকৃতির একটা নিছক খেয়াল নয়! অনেকের মতে এই ব্যাপারটাই স্মৃতির, বিশেষতঃ দীর্ঘকালীন স্মৃতির, উন্মেষের জন্যে দায়ী। চেতনার

কাজকর্মের জন্যে ব্যাপারটা তাই খুবই জরুরী। আর, পেন্‌রোজের মতে, ব্যাপারটা সম্ভবতঃ অ-কার্যক্রমভিত্তিক !

পাশাপাশি আরো একটা ব্যাপারের কথা বলেছেন পেন্‌রোজ। দেখা গেছে যে অনেক সময়ে স্নায়ব-প্রেরকেরা সরাসরি কোনো স্নায়ুকোষের প্রতি উদ্দিষ্ট না হয়ে আন্তর্কোষ তরলের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে প্রভাব ফেলে একসংগে অনেকগুলো স্নায়ুকোষের ওপর—যাদের একটা থেকে আরেকটার দূরত্ব কোষগত মাপকাঠিতে বেশ খানিকটা হতে পারে। পেন্‌রোজ ব্যাপারটাকে অনেক সংখ্যক স্নায়ুকোষের অধিপারমাণবিক দশাগুলির মধ্যে এক ধরণের সামগ্রিক সামবায়িক প্রয়াস (global cooperative effort) বলে বর্ণনা করেছেন। আর, একে তুলনা করেছেন আধা-স্ফটিকের (quasi-crystal) গঠন প্রক্রিয়ার সংগে। তাঁর মতে, এক ধরনের অ-স্থানিক প্রভাব (non-local effect) এ-ধরনের সামবায়িক ক্রিয়াতেও কাজ করে।

আধা-স্ফটিক ? ১৯৮৪-র ডিসেম্বরে আবিষ্কৃত হয় এই অদ্ভুত জিনিসটি। পেন্‌রোজের মতে, এগুলি একটি একটি করে পরমাণু নিয়ে গণনীয়ভাবে দানা বাঁধে না, বরং দানা বাঁধে একই সংগে অনেকগুলি পরমাণুর মধ্যে এক ধরনের সামগ্রিক সামবায়িক ক্রিয়ার মাধ্যমে ! ক্রিয়াটি প্রথমতঃ পরিচালিত হয় তন্মাত্র তত্ত্বের ত পদ্ধতিতে। তখন পরস্পর সম্পর্কিত অনেকগুলি পরমাণুর অনেক ধরনের সম্ভাব্য বিন্যাস পরস্পরের এক উপর্যুপরি-অবস্থানের মধ্যে বিধৃত হিসেবে কাজ করে। এ-অবস্থায় প্রতিটি সম্ভাব্য বিন্যাসই আধা-স্ফটিকটির গঠনসমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধান। শেষে নায়কের ভূমিকা নেয় ক পদ্ধতিটি— যখন এই অনেকগুলি সম্ভাব্য বিন্যাসের মধ্যে যেকোনো একটি বিন্যাস, অথবা, আগের চেয়ে কম সংখ্যক বিন্যাসের একটি উপর্যুপরি-অবস্থান, নির্বাচিত হয়— দানা বাঁধতে থাকা আধা-স্ফটিকটির উপযুক্ত বিন্যাস হিসেবে। আর, এই শেষের নির্বাচনটি যে অ-গণনীয় তা আগেই বলা হয়েছে !

পেন্‌রোজের অনুমান, বিভিন্ন আবেগ ইত্যাদির ফলে মস্তিষ্কের আন্তর্কোষ তরলের মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া স্নায়ব-প্রেরকদের ঘনত্বের তারতম্যে অ-স্থানিকভাবে প্রভাবিত হতে পারে মস্তিষ্কের একাধিক স্নায়ুকোষের অন্তর্গ তন্তু ও তাদের গায়ে গজিয়ে ওঠা ঐ শোঁয়াগুলোর বাড়া-কমা। এখানেও পুরো ব্যাপারটা প্রথমে ঘটে চলে ঐ ত পদ্ধতিতে—বহু সংখ্যক কোষের অধিপারমাণবিক দশাগুলোর মধ্যে এক ধরনের সামগ্রিক সামবায়িক প্রক্রিয়ায়। এখন, আধা-স্ফটিকটি শেষবেশ গঠিত হয় কোনো বস্তুগত লক্ষ্যের (—যেমন শক্তির অবমীকরণের—) সিদ্ধি হিসেবে। মস্তিষ্কের বেলায় এই লক্ষ্যগুলি অনেক বেশি জটিল এবং বিবিধ অভিপ্রায় ও কামনার সংগে সম্পর্কিত হতে পারে। এসব অভিপ্রায়গুলি নিজেরাই আবার একই ধরনের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে উঠে এসে থাকতে

পারে। এভাবে আসলে পুরো ব্যাপারটার অ-গণনীয়তা আরো বেড়ে যায়। আর শেষে, মস্তিষ্কের ভেতরে তড়িৎ-রাসায়নিক আন্দোলন যথেষ্ট পরিমাণ (—মানে, তান্মাত্রিক মাপকাঠিতে যথেষ্ট পরিমাণ !—) হলে সক্রিয় হয় ঐ ক পদ্ধতি। তখন আবার প্রাসংগিক সমস্যাটির অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে থেকে অ-গণনীয়ভাবে উঠে আসে একটিমাত্র সমাধান। (পুরো ব্যাপারটা ঘটে সম্ভবত এক সেকেন্ডেরও কম সময়ে !) ঐ সমাধানটা আবার নতুন সংকেত পাঠিয়ে পুরো নাটকটা আবার শুরু করতে পারে। এভাবেই হয়তো উঠে আসে একের পর এক চিন্তা !··· অবশ্যই, এ-সবই অনুমান। তবু মস্তিষ্কের অ-গণনীয়তার একটা পরিষ্কার ছবি হয়তো পাওয়া যায় এখানে।

'ন মেধয়া' ?

চেতনা দিয়েই আমরা টের পাই যে আমরা আছি, জগৎ আছে ! চেতনা দিয়েই আমরা জানতে পারি যতো তথ্য ও তত্ত্বের ভেতরের সত্যকে ! বুঝতে পারি কোনো কার্যক্রমের কার্যকারিতা ! এ-থেকেও বোঝা যায় যে চেতনা নিজে সব কার্যক্রমের বাইরে। তাই যেসব মতবাদ একে প্রকৃতির অতিজটিল কোনো কার্যক্রমের একটা হঠাৎ-পাওয়া ও অদরকারী ফল বলে মনে করে সেগুলিকে ভুলই বলতে হয়। এ-ধরনের যান্ত্রিক ব্যবহারবাদের বিরুদ্ধে দার্শনিক আপত্তি আগেও অনেকে তুলেছেন (—যেমন জঁ পল্ সার্ত্র্)। পেন্‌রোজ আরো একটু এগিয়ে খোদ আধুনিক বিজ্ঞানের এলাকা থেকেই দেখিয়ে দেন কেন ও কীভাবে চেতনা এক অ-কার্যক্রমভিত্তিক সত্তা— এবং ফলে কখনোই কোনো যান্ত্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে বোধ্য বা অনুকরণীয় নয়।

অন্তর্দৃষ্টি, উৎসাহ, নান্দনিক বিচার, চেতনার সামগ্রিকতা ও একত্ব, চিন্তার ভাষা-নিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ের অভিজ্ঞতার প্রসংগে এসে এই কথাটিই আরো সরাসরি তুলে ধরেন তিনি। কীভাবে মোৎসার্ট্ এক লহমায় প্রত্যক্ষ করতে পারেন একটা গোটা সিম্‌ফনিকে ? কীভাবেই বা একটি বাসে ওঠার মুহূর্তে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ও অপ্রত্যাশিতভাবে পোঅ্যাঁকারে পেয়ে যান দুরূহ এক গাণিতিক প্রশ্নের উত্তর— যা তিনি ঐ ঘটনার অনেক আগে অনেক দিনের একাগ্র চিন্তাতেও খুঁজে পাননি ? পেন্‌রোজের জীবনেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। অনেকের জীবনেই !

কিন্তু, চেতনা কী ? এ-প্রশ্নের দিকে যাননি পেন্‌রোজ ! তার কারণ বোধহয় এই যে চেতনা কোনো বস্তু নয়, তড়িৎ বা মহাকর্ষের মতো কোনো জড়শক্তি নয়, তার কোনো দৈশিক (spatial) অবস্থান বা ভরবেগ নেই— এবং ফলে নেই কোনো কালগত অবস্থানও ! মস্তিষ্ক চেতনার আধার অনেকটা যেমন একটি ডিস্‌প্লে বোর্ডে লেখা কোনো

বিজ্ঞাপনের আধার হল বোর্ডটির সাথে লাগানো কোনো বিশেষ বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপনটার অর্থ (— আর সেটাই তো বিজ্ঞাপন !—) বোর্ডটির কোথাও কিন্তু দৈশিকভাবে অবস্থিত নয় !

চেতনা যে এক অর্থে কালাতীত, তা পেন্‌রোজ-ও জানেন। চেতনাই ঐ প্লাতো-বিশ্বের সংগে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয় ! আর, চেতনার প্রধানতম কাজ সম্ভবতঃ তাৎপর্যের অনুধাবন। কিন্তু তাৎপর্য-ও কি কালাতীত নয় ? (এ-নিয়ে গভীর ভাবনা-চিন্তা করেছেন পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড্ বম্। তাৎপর্যের তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে তিনিও ফিরে তাকিয়েছিলেন মহাবিশ্বের এমন এক অসীম উৎসের দিকে— যা দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে যায় !) তাছাড়া চেতনার মধ্যে সময়ের প্রত্যক্ষণের নানা বৈশিষ্ট্য থেকেও ফিরে আসে এই কালাতীত বিষয়ের প্রসংগ। কীভাবে আমরা মুহূর্তের স্মৃতিচারণায় জীবনের অনেকটা অংশের, বা পুরোটার, গোটা ছবিটা দেখতে পাই ? এমনকি, পেন্‌রোজের মতে, চেতনার মধ্যে কোনো 'ভবিষ্যৎ' অনুভবের পক্ষে কোনো 'অতীত' চিন্তাকে প্রভাবিত করাও সম্ভব ! কারণ, চেতনা এক অর্থে কালাতীত ! পেন্‌রোজের অকপট বক্তব্য এই যে দেশকালের বর্তমান ধারণার মধ্যে চেতনাকে বোঝা সম্ভব নয়। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি আশা করেন যে যন্ত্রমত-ই এ-বিষয়ে নতুন পথ দেখাবে। অবশ্যই, অমূলক নয় এই আশা !

কিন্তু এখানেও প্রশ্ন ! লক্ষ্য করুন, এখানে চেতনাই জ্ঞাতা আর চেতনাই জ্ঞেয়। তাই এখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যখন আলাদা তখন জ্ঞান অবশ্যই অসম্পূর্ণ ! কিন্তু তাহলে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হবে তখন এই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-র মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকবে কী করে ? কী করেই বা তখন থাকবে কোনো জ্ঞাতা ? (নাকি এ-প্রশ্নও দেশকালের চলতি ধারণা থেকেই উঠে এসেছে ?) □

□

With Lots of
Good Wishes
&
Happy New Years Greetings

From :

Amit Das

Phone : 35-4312

□

Space donated by :

A WELL WISHER

□

□

With best compliments from :

RONALD ELECTRONICS

6/1A KAMARDANGA ROAD
CALCUTTA 700 046

□

BEST WISHES FROM :

A WELL WISHER

□

□

With best Compliments from :

KOTHARI PLANTATIONS & INDUSTRIES LIMITED

8 INDIA EXCHANGE PLACE
CALCUTTA 700 001

Telephone : 22-9141 / 42
22-5799 / 9383
22-4663

Telex : ACME IN 7577
Telegram : Kofind, Calcutta

Producers and Exporters of Quality Teas,
Manufacturers of Phytochemicals and
Refined Edible Oil

Owners of :

BORKATONEE TE
GORUNGA TE
DOORIA TE
ARUN TE
DHERAI TE
DULLABCHERRA TE

□

SPACE DONATED BY :

AJOY W. CHATTERJEE
KRISNA W. CHATTERJEE
and
ARPAN W. CHATTERJEE

□

□

With best compliments from :

SWIL LIMITED

27A CAMAC STREET
CALCUTTA 700 016

Phone : 47-3375 (4 Lines)
Telex : 021-3103
Cable : PAPERWIRES

Factories :

UTTARPARA (West Bengal) & NASIK (Maharastra)

Branches :

BOMBAY, DELHI, AHMEDABAD, MADRAS & BANGALORE

(Leading Manufacturers of Fourdrinier Wire Cloth-Metal & Synthetic, Dandy Rolls with or without Brackets / Water Marks & Copper Alloy Wires & Strips.)

□

With best compliments from :

IMAZO

Indian Maize & Chemicals Ltd.

EVEREST HOUSE, 17TH FLOOR
46/C, CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA 700 071

Telephone : 22-9398, 22-1220, 22-2620
Telex : 021-7873, 4038
Fax : 91-33-449855

Please Contact for :

MALTO DEXTRIN, LIQUID GLUCOSE, DEXTROSE ANHYDROUS, MODIFIED STARCHES, DEXTROSE MONOHYDRATE, POULTRY & CATTLE FEED, CORN. OIL

□

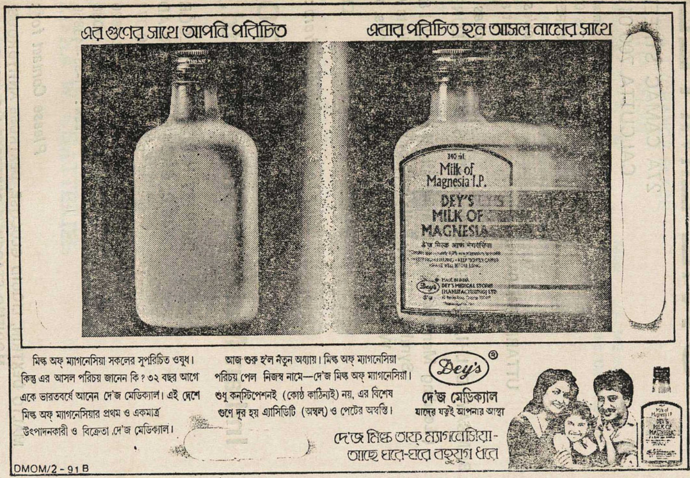
এর গুণের সাথে আপনি পরিচিত
এবার পরিচিত হ'ন আসল নামের সাথে
340 ml.
Milk of Magnesia I.P.
DEY'S MILK OF MAGNESIA
মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়া সকলের সুপরিচিত ওষুধ। কিন্তু এর আসল পরিচয় জানেন কি? ৩২ বছর আগে একে ভারতবর্ষে আনেন দে'জ মেডিক্যাল। এই দেশে মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়ার প্রথম ও একমাত্র উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা দে'জ মেডিক্যাল।
আজ শুরু হ'ল নতুন অধ্যায়। মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়া পরিচয় পেল নিজস্ব নামে—দে'জ মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়া। শুধু কনস্টিপেশনই (কোষ্ঠ কাঠিন্যই) নয়, এর বিশেষ গুণে দূর হয় এ্যাসিডিটি (অম্বল) ও পেটের অস্বস্তি।
Dey's®
দে'জ মেডিক্যাল
যাদের যত্নই আপনার আস্থা
দে'জ মিল্ক অফ্ ম্যাগনেসিয়া-
আছে ঘরে-ঘরে বহুযুগ ধরে
DMOM/2 - 91 B

যেখানেই খেলা
সেখানেই
খেলা

যেখানেই টেলিভিশন
সেখানেই
টেলিভিশন

এবং আজকাল যেখানেই খবর
সেখানেই
আজকাল

এমনকি যেখানেই সান্ধ্য জমায়েত
সেখানেই
সান্ধ্য আজকাল

জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯২ যোগসূত্র বারো টাকা

With best compliments from :

Central Concrete
&
Allied Products Ltd.

8 CAMAC STREET
3rd Floor, Space - I
CALCUTTA-700017

Phone : 22-0090 / 22-1521
22-1553 / 22-4272
Telex : CA 021-2331 CENTIN
Cable : CENTPILES
Fax : 91-33224330

কুন্তল রায় কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত এবং টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।